প্রকাশক :
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
79, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-700 009

প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, 1960

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রসজ্জা : চক্রবর্তী ও ঘোষ

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত
মডার্ন প্রিণ্টার্স
12, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড
কলকাতা-700 067

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
আর্বাগদেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥

—ঋগ্বেদ

পিতৃদেব ৺কিশোরীরঞ্জন করমহাপাত্রের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

যাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম সাহিত্যচর্চার প্রথম পাঠ

ভূমিকা

এই শতকের গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের রাজ্যে এসেছে দ্রুত বিপ্লব। এই বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান। হাতে-কলমে পরীক্ষায় ও গাণিতিক তত্ত্বে পদার্থ বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা থেকে জন্ম হয়েছে এক নতুন দর্শনের—যার প্রভাব পড়েছে দূরমহাকাশের চেহারায়, অণুপরমাণুর অন্তর্লোকে, জীবনের সৃষ্টি ও স্থিতির প্রকরণে। পদার্থ জগতের গোড়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিকাশের এই বিপুল উত্তরণের ইতিকথা স্বল্প পরিসরে শুধু ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তবু পদার্থ, বিকিরণ, বিশ্বজগৎ ও জীবন নিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানীর চিন্তাভাবনার একটি বাস্তব রূপরেখা সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের কাছে তা আদৃত হ'বে বলেই এই বইয়ের রচনা। এবিষয়ে আমার লেখা কিছু প্রবন্ধ 'দেশ', 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কোন কোন অনুরাগী পাঠক সেই সব প্রবন্ধের সংকলন পুস্তকাকারে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাতে সাড়া দিতে পারিনি, কারণ এরকম সংকলনে বিষয়ের পারম্পর্য থাকত না, বার বার দ্বিরুক্তি ঘটত ও আধুনিক তথ্যগুলি সংযোজন করা যেত না। তাই নতুন পাণ্ডুলিপি লিখতে হয়েছে, প্রকাশিত প্রবন্ধের কোন অংশ যুক্ত হয়ে থাকলে, তাতে বিষয়ের সৌকর্য যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তা দেখতে হয়েছে।

পরিশেষে সহায়ক রচনাপঞ্জী, প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যাখ্যা, মাপজোখের ও এককের মান ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। গত ৩০/৩৫ বৎসর যাবৎ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার অভিজ্ঞতায় দেখেছি সঠিক সর্বসম্মত অনেক পরিভাষা এখনও দুর্লভ। 1948 থেকে প্রয়োজনমত কিছু পরিভাষা তৈরি করেছি, তার অদলবদলও করতে হয়েছে। সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাই ব্যবহৃত পরিভাষার তালিকা পরিশেষে দেওয়া হয়েছে।

মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় আমার প্রেরণার উৎস হলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, তাঁর সাহচর্য ও আশীর্বাদ আমাকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রেরণা দিয়েছে—এই রচনা উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন ৺গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের আগ্রহে আমার অনেকগুলি প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। এই সব রচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক প্রভৃতি নিয়ে আলোচনায় তিনি নিয়তই আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এই সুযোগে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত কয়েকটি আলোকচিত্র প্লেটে আলাদা মুদ্রিত হ'য়েছে। এদেশের গবেষণাগার থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে এরকম কিছু চিত্র এতে রয়েছে। তাতে ভারতীয় গবেষণার কিছু তথ্য পাঠকেরা পেতে পারেন। বাকী চিত্রগুলি বিদেশের গবেষণাগার-প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

সাহা ইন্স্টিটুটের চিত্রগুলি অধ্যাপক এ. পি. পাত্রের সৌজন্যে, বিধাননগরস্থিত সাইক্লোট্রনের চিত্র ডক্টর শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ও ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে অধ্যাপক

স্মৃতিনারায়ণ চ্যাটার্জীর গৃহীত চিত্র তাঁর সৌজন্যে পেয়েছি। সেজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার স্ত্রী শান্তির কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে সাংসারিক আমার অনেক দায়দায়িত্ব নিজে বহন করে এই পাণ্ডুলিপি রচনায় সাহায্য করেছেন। শ্রীমান ফাল্গুনী, শান্তনু ও শ্রীমতী শ্রীরূপা নানা-ভাবে সাহায্য করে আমাকে উৎসাহিত করেছে—তাদের জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। আর ধন্যবাদ জানাই শ্রীভূমির শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ মশাইকে, প্রস্তুতির শেষ পর্বে তিনি আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশনার কাজ ত্বরান্বিত করেছেন।

পরিশেষে নিবেদন, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সীমিত রূপরেখায় পৃথিবী, জীবন ও বিশ্ব-প্রকৃতির এই আলেখ্য যদি সাধারণ পাঠকের মনে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারে তবেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

আর্টপ্লেট চিত্রপরিচিতি

1. সাহা ইনস্টিট্যুটের এই সাইক্লোট্রন পঞ্চাশের দশকে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে স্থাপিত হয়। এর ডানদিকের অংশ চুম্বক প্রায় 60 টন ওজন। বাঁয়ে প্রোটন কণা বাইরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। এখন নিউক্লীয় গবেষণায় এই যন্ত্র বব্যহৃত হয়।

2. বিধাননগরের এই সাইক্লোট্রনে 24-120 Mev আলফা ত্বরণ করা যাবে। এর চুম্বক প্রায় 260 টনের বেশী ওজন। চুম্বকের মেরুপৃষ্ঠ সমতল নয়। তিনটি করে কুণ্ডলিত আকার বাহুর মত পর্যায়ক্রমিক হিল্ ও ভ্যালি আকারের। এরকম চুম্বকে ফোকাসন তীব্র হয়। তীব্র কণাস্রোত পাওয়া যায়। ত্বরণ পরিবর্তনশীলও হ'তে পারে।

3. 1950 খ্রীষ্টাব্দে মাদাম কুরী জোলিও সাহা ইন্‌স্টিট্যুটের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। চিত্রটি ঐ সময়ে গৃহীত। সঙ্গে অধ্যাপক নীরজনাথ দাশগুপ্ত।

4. সাহা ইন্‌স্টিট্যুটের এই কণাত্বরকে ডয়েটরন ত্বরণ হয় ও ট্রিটিয়াম লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে 14·8 Mev নিউট্রন উৎপাদন করা হয়। তাই যন্ত্রটি নিউট্রন উৎপাদক নামেও অভিহিত হয়।

5. অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে এদেশে প্রথম গাইগার কণাসন্ধানী যন্ত্র তৈরি হয়। সঙ্গে বিবর্ধক, স্কেলার প্রভৃতি ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রপাতিও তখন তৈরি করা হয়। 1950এ গৃহীত এই পরীক্ষাগারের চিত্রে বাঁয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষক ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গে ডঃ সুনীল সেন।

6. লেসার রশ্মি সুসঙ্গত বলে প্রিজমে প্রতিসরণের পরেও তার তীব্র ফোকাসিত বিকিরণ পাওয়া যায়। সরু রশ্মির আকার থেকে তা দেখা যাবে।

7. অধুনা কত ছোট লেসার উৎপাদক তৈরি হয়, একটি হাতের চেটোর সঙ্গে তার তুলনা দেখানো হয়েছে।

8. সাহা ইনস্টিট্যুটের এই ম্যাস্‌স্পেক্ট্রোমিটার বা ভরবর্ণালী যন্ত্র 1960 খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়। এর দু'টন ওজনের চুম্বকের মেরুদুটির তল সমান্তরাল নয়—সিন্‌ক্রোট্রনের মত নতি আছে। আয়নের গতির দুই লম্বদিকের অক্ষে ফোকাসন হয়। এই ধরনের চুম্বক-ক্ষেত্র এই যন্ত্রে প্রথম ব্যবহৃত হয়।

9. মাথা ও লেজওয়ালা কলেরা ভাইরাস। কলেরা ব্যাক্টিরিয়াকে আক্রমণ করে। অধ্যাপক স্মৃতিনারায়ণ চ্যাটার্জী কর্তৃক × 165000 বিবর্ধন সহ ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপে এই চিত্র গৃহীত।

10. বিভিন্ন শ্রেণীর কুণ্ডলিত ছায়াপথ। সাধারণ কুণ্ডলী, বাধিত কুণ্ডলী প্রভৃতির চিত্র।

11. 1900 খ্রীষ্টাব্দে 28 মে গৃহীত পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়কার কোরোনার এই চিত্র থেকে দেখা যাবে তার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর পালকের মত চূড়া থেকে সূর্য যে বৃহৎ চুম্বক তা প্রমাণিত হয়।

12. বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবরেটরীতে সাধারণ মেঘকক্ষে রেডিয়ামনির্গত আলফাকণার গতিপথের এই চিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

13. ইমাল্‌সন্‌ বা অবদ্রবে $K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^-$ বিক্রিয়ায় এই আলোকচিত্রে দেখা যাচ্ছে $K^+(k)$, $\pi^-(AB)$, দুটি $\pi^+(Aa, Ab)$ এর গতিপথ।

14. হাইপেরন Λ^0 যখন প্রথম ধরা পড়ল, ব্যাপন মেঘকক্ষে তখন এই চিত্র তোলা হয়—এতে হাইপেরনের ক্ষয়ে (তীর চিহ্নের নীচের বিন্দুতে) π^- ও প্রোটনের গতিপথ ফুটে উঠেছে।

15. স্ফুলিঙ্গ কক্ষে যে $\pi^+ + p \rightarrow \Lambda^0 + K^0$ বিক্রিয়ায় Λ^0 ভেঙে $\pi^- + p$ এ রূপান্তরিত হয় (নীচের দুটি পথ) এবং K^0 ভেঙে তৈরি হয় π^+ ও π^- (উপরে দুটি পথ) তার চিত্র ফুটে উঠেছে।

16. তরল হাইড্রোজেন বুদ্‌বুদকক্ষে প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন অবলোপের বিক্রিয়ায় উৎপাদিত V কণা, ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতির গতিপথ।

17. সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় এই শক্তিশালী বেতার দূরবীণ তৈরি হয়েছে ও গবেষণার কাজে লাগছে।

18. ক্র্যাব্‌ নীহারিকা। অতি নবতারার এই অবশেষ 10^{34} হাইড্রোজেন বোমার সমতুল বিস্ফোরণ থেকে জাত। এখন এর ব্যাস প্রায় 30×10^{12} মাইল।

পদার্থ ও জড়জগৎ

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণু পরমাণুদের নিত্য কলরোল—

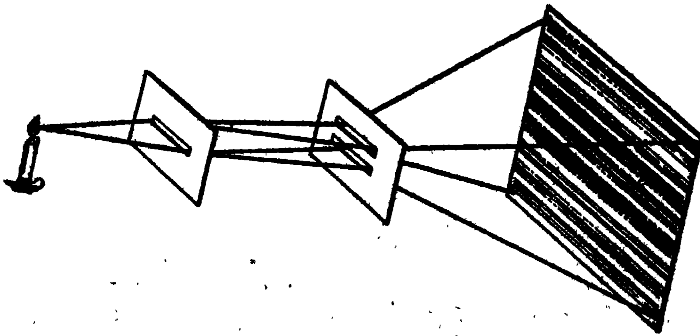
—নৈবেদ্য : রবীন্দ্রনাথ

পদার্থ ও বিকিরণ

জড়পদার্থ ও শক্তি নিয়ে জগৎ। এদের পার্থক্য হল আপাতদৃষ্টিতে জড়ের মত শক্তির ভর নেই, শক্তি জড়কে দেয় গতি। জড়ের বিনাশে অনুরূপ ভরের জড় পদার্থ ও শক্তির বিনাশে অনুরূপ শক্তির আবির্ভাব ঘটে। জড় ও শক্তি সম্পর্কীয় এই ধারণা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে তাদের অভিন্নতা। জগৎ নিয়ে ধ্যানধারণার এই ক্রমিক বিবর্তন থেকে পদার্থবিজ্ঞানের অভিব্যাক্তি সম্ভব হয়েছে।

স্বভাবজ বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে আমাদের জগৎ। কৃত্রিম উপায়ে অবশ্য এখন আরও কয়েকটি পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই জগতের মূলে যে বৈচিত্র্য তার কর্তা হল শক্তি। শক্তির বিকিরণ তাপ, আলো, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে দৃশ্য অথবা অদৃশ্য রূপে বাইরের জগতে প্রকাশ পায়। শক্তির বিকিরণের কর্তৃত্বে পদার্থজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একটা চিরন্তন আবর্তন যাত্রা শুরু করেছে অনাদি কাল থেকে, আয়ুও তার অনন্ত।

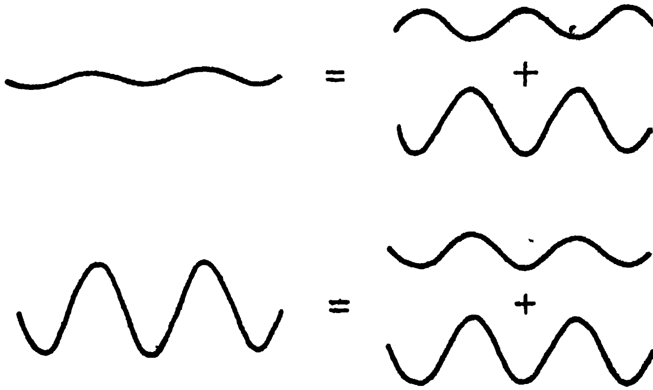
পদার্থের ছোট কণা হল অণু—যা আরো ভেঙে পাওয়া যায় পরমাণু। মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলিই পদার্থজগতের স্বরূপ। শক্তি বিকিরণের বেলায়ও একদা বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল আলোও বুঝি কণিকার সমষ্টি। বিকিরণের এই কণিকাবাদের প্রবক্তা ছিলেন স্বয়ং নিউটন। তাঁর সমসাময়িক হয়গেন্‌স্‌ বিকিরণের তরঙ্গবাদ খাড়া করেন। ইয়ং ও ফ্রেজনেল-এর বিখ্যাত পরীক্ষায় আলোর ব্যতিচার



চিত্র 1.1 : ইয়ং ও ফ্রেজনেল-এর পরীক্ষায় আলোর ব্যতিচার।

বা interference তরঙ্গবাদকে প্রতিষ্ঠা এনে দিল। এই পরীক্ষায় আলোর দুটি তরঙ্গ বিশেষ অবস্থায় জুড়ে গিয়ে আলো ও অন্ধকার পটির সৃষ্টি করে। আলো

যদি কণাধর্মী, তবে দুটি আলোর কণা তো আর অন্ধকারের সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তরঙ্গবাদের সাহায্যে বলা যায় যে দুটি তরঙ্গের শীর্ষ বা পাদ একত্র হ'য়ে

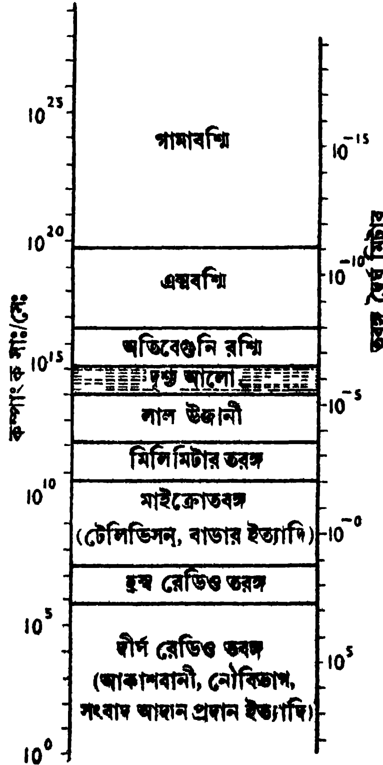


চিত্র 1.2 : দুটি তরঙ্গ শীর্ষ একই দশায় (phase) মিলিত হলে আলোর পটি ও পাদ এবং শীর্ষ একত্র হলে সৃষ্টি হয় আঁধারের।

আলোর পটি ও অন্যত্র একটির শীর্ষ ও অপরটির পাদ মিলে অন্ধকার পটির সৃষ্টি করে। ছোট ছিদ্রে বেঁকে গিয়ে আলো ও অন্ধকারের যে সমকেন্দ্রিক বৃত্ত সৃষ্টি হয়, সেই অববর্তন বা diffraction-ও তরঙ্গবাদ ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

আলো, তাপ, বিদ্যুৎ শক্তির সব বিকিরণই তরঙ্গধর্মী—আর সেই তরঙ্গ হল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়। বিদ্যুৎ আধানের পরিবর্তনে তার চারপাশে চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, আবার ঐ ক্ষেত্রের বলরেখার পরিবর্তনে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে এর স্বরূপ জানা গিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষে হার্জ হাতেকলমে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। এর গতিবেগ C হল সেকেণ্ডে প্রায় একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। আলোর গতিবেগও তাই। ক্রমশঃ প্রমাণ হল দৃশ্য-অদৃশ্য সব বিকিরণই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ ও তাদের গতিবেগ সমান অর্থাৎ C। একই গোষ্ঠীর হয়ে এদের আকৃতি-প্রকৃতিতে পার্থক্যের কারণ হল যে তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ, সেকেণ্ডে সেই তরঙ্গ যতবার কাঁপে অর্থাৎ সেই কাঁপনসংখ্যা বা কম্পাংক ν এসব সমান নয়। $C=\lambda\nu$ সূত্র থেকে দেখা যায় যে C একটি নিত্যসংখ্যা বলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে কাঁপনসংখ্যা কমে। বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী, তাই কাঁপনসংখ্যা সবচেয়ে কম। $\frac{1}{2}$ মিলিমিটার থেকে 50 হাজার মিটার দৈর্ঘ্যের পাল্লায় বেতার তরঙ্গ পড়ে—তাপ, আলো, রঞ্জন, গামা প্রভৃতি বিকিরণের বেলায় ঐ দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে, কাঁপনসংখ্যাও বাড়তে থাকে।

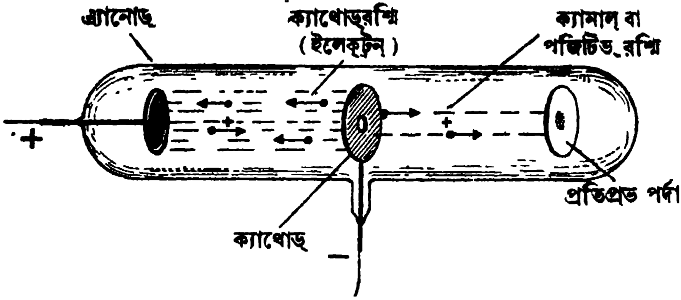
রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের অনেক সমস্যারই যখন পরমাণুবাদের সাহায্যে সমাধান হচ্ছিল, তখন ক্রুক্স ক্যাথোড রশ্মিতে পরমাণুর ভেতরের একটি ছোট কণার সন্ধান পেলেন। এই কণাতে দেখা গেল পদার্থ ও বিদ্যুতের মিশ্রণ। মিলিকান এর ভর ও আধান মাপলেন—এর নাম হল ইলেকট্রন, ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর $\frac{1}{1836}$ ভাগ, বৈদ্যুতিক প্রকৃতিতে নেগেটিভ। ইলেক্ট্রন নিঃসন্দেহে পরমাণুর একটি উপাদান। পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হতে হলে তাতে পজিটিভ বিদ্যুৎ



চিত্র 1.3 : বিভিন্ন বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার) ও কম্পাংক বা কাঁপনসংখ্যার (সাইক্লস্ / সেকেণ্ড অর্থাৎ সেকেণ্ডে কতবার কাঁপে) সম্পর্ক।

কণাও থাকা উচিত। ক্যাথোড রশ্মির নল থেকেই এইরকম কণার সন্ধান পাওয়া গেল। ক্যাথোড-এর বিপরীতে ক্যানেল রশ্মিতে পরমাণুর মতই ভর এবং পজিটিভ আয়ন কণার সন্ধান মিলল। দেখা গেল ইলেক্ট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমাণু পরিণত হয় আয়নে। পরীক্ষায় নিয়োজিত বিদ্যুৎ শক্তির প্রভাবে এই আয়নন ক্রিয়া ঘটে।

সবচেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুর আয়ন হল প্রোটন, যার ভর ইলেকট্রনের চেয়ে 1836 গুণ বেশী। ভারী পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে ইলেকট্রনের সংখ্যাও বাড়ে। কোন পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যা থেকে ইলেকট্রন সংখ্যা কম হলেই তা আয়নে পরিণত হয়।



চিত্র 1.4 : ক্যাথোড নলেব পবীক্ষায় ক্যাথোড থেকে নির্গত ইলেক্ট্রন পজিটিভ উচ্চ বিভবের অ্যানোডেব মধ্যে গ্যাসেব আয়ন বা ক্যানাল রশ্মিব জন্ম দেয়। প্রতিপ্রভ পর্দায় সেই বশ্মি আলোব স্ফুবণ উৎপাদন কবে তাদের অস্তিত্ব জানিযে দেয।

ক্যাথোড নলের পরীক্ষায় রঞ্জেন এক নতুন অদৃশ্য রশ্মির সন্ধান পেলেন। কাচনলের দেয়ালে প্রতিপ্রভতা থেকে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ল। অতি-বেগুনি রশ্মির চাইতেও এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম—এই বিকিরণ অনায়াসে কঠিন পদার্থ ভেদ করতে পারে। তাই মানুষের শরীরের অভ্যন্তরের খোঁজখবর নিতে এর প্রয়োগ করা হয়। পরমাণুর বাইরের কক্ষের ইলেকট্রন আন্দোলিত হলে যেমন তাপ বা আলোর জন্ম দেয়, রঞ্জেন বিকিরণের উৎস হল ভারী পরমাণুর ভেতরের কক্ষের ইলেকট্রন। এইসব ইলেকট্রনের বন্ধনশক্তি বেশী, তাই রঞ্জেন রশ্মিও অধিক শক্তিশালী। এই আবিষ্কারের সঠিক উৎস নিয়ে যখন অনুসন্ধান চলছিল, তখন বেকেরেল ভেবেছিলেন কাচের প্রতিপ্রভতা থেকেই বুঝি রঞ্জেন রশ্মির জন্ম। এই ভেবে বেকেরেল অন্য প্রতিপ্রভ পদার্থ থেকে এই রশ্মি পাওয়া যায় কিনা তা দেখার চেষ্টা করলেন। দেখা গেছে সূর্যের আলোতে ইউরেনিয়ামের প্রতিপ্রভতা অসামান্য। ইউরেনিয়ামের যৌগের একটি টুকরো ফটোগ্রাফিক প্লেটের কালো ঢাকনার উপর রেখে বেকেরেল দেখতে চাইলেন, সূর্যালোকে ইউরেনিয়াম প্রতিপ্রভতা উৎপন্ন করলে, তাতে যদি রঞ্জেন রশ্মি থাকে তবে কালো ঢাকা ভেদ করে তা নিশ্চয়ই প্লেটে কালো দাগের সৃষ্টি করবে। সাধারণ আলো-নিরোধী কালো কাগজের ঢাকনা ভেদ করে রঞ্জেন রশ্মিই প্লেট বিকৃত করতে পারে। দেখা গেল বেকেরেলের ধারণা বুঝি ঠিক। প্লেট সত্যই বিকৃত হয়েছে। বেকেরেলের ভাবনা কিন্তু বাড়লো, কারণ পরীক্ষায়

সময়টুকুতে আকাশ মেঘলা ছিল। সূর্যালোক ছাড়া যখন ইউরেনিয়াম প্রতিপ্রভতা উৎপাদন করে না, তাহলে প্রতিপ্রভতা ছাড়াই প্লেটের বিকৃতি ঘটল কেন? বেকেরেল এবার তাঁর পরীক্ষাটি করলেন অন্ধকার বন্ধ ড্রয়ারের মধ্যে—এবারও সেই একই ফল। এমনকি প্লেট ও ইউরেনিয়ামের মধ্যে তিনি যে মুদ্রাটি রেখে দিয়েছিলেন, তার অবিকল চিত্রও প্লেটটি ধরে রেখেছে।

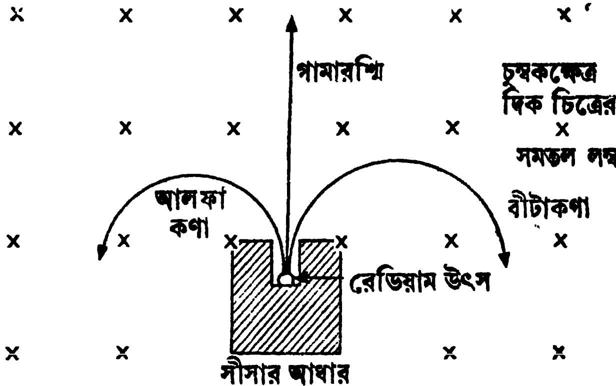
তাহলে, প্রতিপ্রভতা নয়, রঞ্জেন রশ্মিও নয়, ইউরেনিয়ামের কি নিজস্ব কোন বিকিরণ আছে? হ্যাঁ, এই বিকিরণই হল তেজস্ক্রিয়া এবং এই আবিষ্কারই বিজ্ঞানের নবযুগের সূচনা করল। নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব, নিউক্লীয় বোমা, রিয়্যাক্টর এসবই এই আবিষ্কারের অবদান। তাই অনেককে বলতে শুনি, ভাগ্যিস বেকেরেলের প্রথম পরীক্ষার দিন আবহাওয়া খারাপ ছিল, নয়ত বুঝি আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বেশ বিলম্ব ঘটে যেত।

তেজস্ক্রিয়ার স্বরূপ

ইউরেনিয়ামের এই বিকিরণের তেজস্ক্রিয়া বা radio-activity নামকরণ করেন মেরী কুরী। তেজস্ক্রিয়া সংক্রান্ত পরবর্তী আবিষ্কারগুলোর সঙ্গে কুরী দম্পতির নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। পিচ্ব্লেণ্ডী থেকে তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়ম ও রেডিয়াম-এঃ আবিষ্কার, থোরিয়ামের তেজস্ক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়—এ সবই তাঁদের বিজ্ঞানপ্রতিভার নিদর্শন। 1903 খ্রীষ্টাব্দে কুরী দম্পতি ও বেকেরেল পদার্থ বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়ার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। 1906 খ্রীষ্টাব্দে পিয়েরে কুরী মারা যান, 1911 খ্রীষ্টাব্দে মাদাম কুরী এককভাবে রসায়নের নোবেল পুরস্কার পান পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য। এক্ষেত্রে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অবদানও কিছু কম ছিল না।

এই তেজস্ক্রিয়ার স্বরূপ কি? তা তরঙ্গধর্মী বিকিরণ অথবা আহিত কণার বিচ্ছুরণ—তা জানতে এই রশ্মিকে শক্তিশালী চুম্বকের ক্ষেত্রে রাখা হল। দেখা গেল, এই রশ্মির এক অংশ সামান্য বেঁকে যায়, তা আল্‌ফা কণা বা সম্পূর্ণ আয়নিত হিলিয়াম। ঠিক উল্টোদিকে আর কিছু রশ্মি সামান্য বাঁক নেয়, এরা বিটা কণা বা ইলেকট্রন। বাকী অংশটুকু হল গামা বিকিরণ যা সোজাসুজি বেরিয়ে আসে। রঞ্জেন রশ্মি থেকেও এই বিকিরণ বেশী শক্তিশালী। বেকেরেলের পরীক্ষায় এই বিকিরণই প্লেটে ধরা পড়েছিল। চুম্বক ক্ষেত্রে আহিত কণার গতির বক্রতা থেকে তার ভর জানা। এভাবে বিটা ও আল্‌ফার অস্তিত্ব তেজস্ক্রিয়ায় ধরা পড়েছিল। রাদারফোর্ড ও সোডি নানা পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয়ার স্বরূপ ধরে ফেলেন। পদার্থের পরমাণু যে অবিভাজ্য নয় এসব পরীক্ষায় তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল।

রাদারফোর্ড পরমাণুর প্রতিরূপ কী হবে তা প্রথম প্রচার করেন। পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে পজিটিভ আহিত নিউক্লিয়াস ; তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের ব্যাস প্রায় 10^{-18} সেণ্টিমিটার, পরমাণুর চেয়ে প্রায় 100000 গুণ কম,



চিত্র 1.5 : সীসার আধারে সুরক্ষিত রেডিয়াম আলফা (α), বিটা (β) ও গামার (γ) উৎস। চুম্বক ক্ষেত্রে বেঁকে যায় দেখে জানা গেল আলফা ও বিটা কণা আহিত ও তাদের বিপরীত গতিপথ থেকে জানা যায় আলফা কণা পজিটিভ ও বীটা কণা নেগেটিভ। গামা বিকিরণের গতিপথ চুম্বকক্ষেত্রে সোজা থাকে।

অথচ নিউক্লিয়াসই পরমাণুর প্রায় সবটা ভরের সমান। পরমাণুর আয়তনের কত সামান্য অংশ নিউক্লিয়াসের দখলে থাকে তা একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায়। ধরা যাক্, পরমাণুর আয়তন যদি পৃথিবীর সমকক্ষ হয়, তবে তার নিউক্লিয়াস হ'বে কোন শহরের একটি পার্কের মত। এক ঘন সেণ্টিমিটার নিউক্লীয় পদার্থের ওজন হবে প্রায় 1140 লক্ষ টন।

পরমাণুর নিউক্লিয়াস

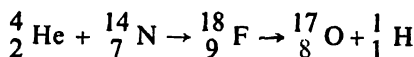
রাদারফোর্ডের ছাত্র নীল্‌স্‌বোর রাদারফোর্ডের পরমাণুর প্রতিরূপের যে চূড়ান্ত রূপ দেন তা আধুনিক কালেও অভ্রান্ত বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই প্রতিরূপে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস একটি প্রোটন, তার ইলেকট্রন সংখ্যাও একটি। ক্রমশঃ পরমাণুর ভর পদার্থ অনুযায়ী বাড়ে। যেমন হিলিয়াম হাইড্রোজেনের চেয়ে চারগুণ ভারী আর ইউরেনিয়াম 238 গুণ।

তেজস্ক্রিয়ার পরীক্ষায় দেখা গেল যে, আল্‌ফা কণা ও হিলিয়াম নিউক্লিয়াস অভিন্ন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আল্‌ফা বেরোলে তা একটি নতুন মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই নতুন পদার্থের ভর 4 একক ও আধান 2 একক কম।

আধানের একক ইলেকট্রন, ভরের একক হল প্রোটন। বিটা কণা বেরোলেও নতুন যে মৌলিক পদার্থ তৈরি হয় তাতে একটি পজিটিভ আধান যুক্ত হয়ে যায়। সাধারণ উদাসীন পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান—এই সংখ্যাই হল তার পারমাণবিক সংখ্যা। পরমাণুর ইলেকট্রন রাসায়নিক ক্রিয়ার যোগসেতু, আর বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্মও পৃথক্। তাই পারমাণবিক সংখ্যা (Z) থেকে মৌলিক পদার্থ চেনা যায়। হাইড্রোজেনের এই সংখ্যা এক, ইউরেনিয়ামের 92। বীটা কণা বেরোলে মৌলিক পদার্থটির পরবর্তী সংখ্যার পদার্থে রূপান্তর হয়। ভরসংখ্যা (A) হল হাইড্রোজেনের তুলনায় কোন্ পরমাণু কতগুণ ভারী। বিভিন্ন পরমাণুর Z ও A এই সংখ্যা দুটির কোন সম্পর্ক আছে কি ? রসায়নবিদ্‌রা হাইড্রোজেন পরমাণুকে একক ধরে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের ভর নির্ণয় করতেন। 1816 খ্রীষ্টাব্দে প্রাউট সন্দেহ করেছিলেন যে, হাইড্রোজেনই যদি পদার্থ জগতের মৌলিক পরমাণু হয়, তবে 7 পারমাণবিক সংখ্যার নাইট্রোজেনের ভর হাইড্রোজেনের 14 গুণ আর 8 সংখ্যার অক্সিজেনের ভর 16 গুণ কেন ? ক্রমশঃ যখন দেখা গেল ভারী পরমাণুগুলির সব কয়টিই হাইড্রোজেন পরমাণুর ঠিক পূর্ণসংখ্যক গুণিতক হচ্ছে না তখন প্রাউটের সিদ্ধান্ত চাপা পড়ে গেল। নয়ত একশো বছর আগেই প্রাউটের সন্দেহ থেকে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব জানার সম্ভাবনা অমূলক ছিল না।

বিজ্ঞানের ভাষায় Z ও A দিয়ে পরমাণুর সাঙ্কেতিক চিহ্নে মৌলিক পদার্থটিকে প্রকাশ করা হয় ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$; হিলিয়াম ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$, ইউরেনিয়াম ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ ইত্যাদি। প্রাউটের প্রাচীন সিদ্ধান্ত ও তেজস্ক্রিয়ার নিয়ম মিলিয়ে একটি ভ্রান্ত মতবাদ চালু হয়ে গেল যে, ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াসের Z সংখ্যার বাড়তি প্রোটন কিছু থাকতে পারে, ঐ সঙ্গে সমান সংখ্যার ইলেকট্রন—ফলে নিউক্লিয়াসটি আধানরহিত হয়ে দাঁড়ায়। তেজস্ক্রিয়ায় বীটা কণার আকারে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসার ঘটনা এই মতবাদ দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আইসোটোপ আবিষ্কারের ঘটনাও এই মতবাদকে সমর্থন করে। অ্যাস্টন আবিষ্কার করেন, প্রায় অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন ভরের ঐ পরমাণুর মিশ্রণ। একই পরমাণুর আইসোটোপের রাসায়নিক ধর্মও অভিন্ন। আইসোটোপের ওজন দেখা গেল প্রায় হাইড্রোজেনের পূর্ণসংখ্যার গুণিতক। যেমন ক্লোরিনের দুটি আইসোটোপের ওজন 34·978 ও 36·977 ; আইসোটোপ আবিষ্কারের আগে ক্লোরিনের ওজন ধরা হত 35·457। 'প্রায়' কথাটি বাদ দিলে এই সব পরীক্ষা প্রাউটের মতবাদই সমর্থন করে। সব পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন আছে—এই সিদ্ধান্তটি ধরা পড়ল 1919 খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ডের

পরীক্ষায়। আল্‌ফা কণা নাইট্রোজেনের উপর আঘাত করে পাওয়া গেল হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস প্রোটন। সাংকেতিক সূত্রে তা প্রকাশ করা যায়



$$^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{14}_{7}\mathrm{N} \rightarrow ^{18}_{9}\mathrm{F} \rightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{1}\mathrm{H}$$

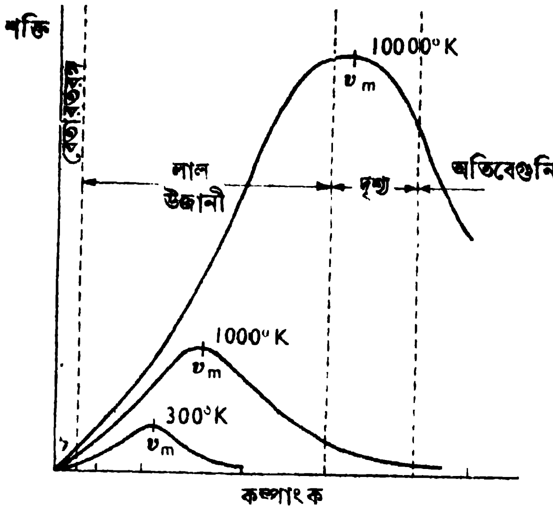
N, F, O যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফ্লোরিন ও অক্সিজেন। $^{19}_{8}$F একটি অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ।

বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব

1900 খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বিকিরণের কোয়াণ্টামতত্ত্ব আবিষ্কার করে বিকিরণ যে অবিরাম তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ নয় তা প্রমাণ করেন। পদার্থ বিজ্ঞানে এই আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সময় প্রাচীনপন্থী ও নবীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে কী রকম অবিশ্বাসের লড়াই চলছিল তার কয়েকটি কৌতুকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। মিউনিক থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর প্ল্যাঙ্ক যখন অধ্যাপক জোলির কাছে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন জোলি তাঁকে উৎসাহ দেননি, বরং বলেছিলেন, "ওহে ছোক্‌রা, ওসব তাত্ত্বিক গবেষণা করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কোরো না। তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কারের কিছু অবশিষ্ট নেই। ডিফারেন্সিয়াল সব সমীকরণেরই প্রায় সমাধান হয়ে গেছে, কিছু বাকী থাকলেও সে সব তুচ্ছ ব্যাপারে লেগে থাকা কি কাজের কথা?" অবশ্য এই ধরনের নৈরাশ্যবাদ তখন বিজ্ঞানীদের পেয়ে বসেছিল। এত নতুন সব অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক আবিষ্কার ঘটছিল যে প্রাচীনপন্থীরা সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠছিলেন। নবীন বিজ্ঞানীদের এই সব কাজকর্ম তাঁরা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারতেন না। 1912 খ্রীষ্টাব্দেও এমন ঘটনা ঘটেছে যে, ফ্রাঙ্ক্ যখন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ নিতে যান, ডীন্ তাঁকে ডেকে বলেন, "দেখুন, যা কিছু আপনার কাছে আমরা আশা করি, তা হল স্বাভাবিক আচরণ।" বিস্মিত ফ্রাঙ্ক তার উত্তরে বলেন, "কেন, স্বাভাবিকতা কি পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে দুর্লভ?" ডীনের সুস্পষ্ট উত্তর "আপনার আগের অধ্যাপক কি স্বাভাবিক ছিলেন বলে মনে করেন?" আগের এই অধ্যাপক ছিলেন অবশ্য আইনস্টাইন। উনিশ শতকের চিরাচরিত বিজ্ঞান চিন্তার মূলে যাঁরা আঘাত হেনেছিলেন বিজ্ঞানী সমাজে তার প্রতিক্রিয়া—এইসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। অথচ এইসব অস্বাভাবিক আচরণসম্পন্ন বিজ্ঞানীরাই পদার্থবিজ্ঞানে নবযুগের সূচনা করেছেন।

প্ল্যাঙ্ক তাঁর শিক্ষক জোলির পরামর্শ নেননি। পদার্থতত্ত্বের প্রাচীন ধ্যান-ধারণায় লালিত হয়েও তিনি এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার করেছিলেন। তপ্ত পদার্থ

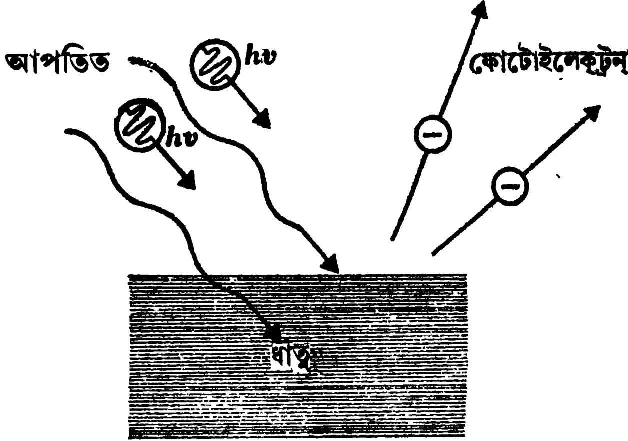
ও তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে শক্তি বিনিময় সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে, প্রক্রিয়াটি অবিরাম নয়। শক্তি বিকিরণের একটি ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা ধরে নিলে এই প্রক্রিয়ার সার্থক ব্যাখ্যা করা যায়। গতানুগতিক পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে এই ধারণার গরমিল দেখে তিনি কিছুদিন এই আবিষ্কার প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন। তাঁর সহযোগীদের বলতেন, আমার এই আবিষ্কার হয় সম্পূর্ণ অর্থহীন, নয়ত নিউটনের সূত্রগুলির মত চমকপ্রদ। আবিষ্কারটি যে সম্পূর্ণ অর্থবহ ও চমকপ্রদ তার প্রমাণ পাওয়া গেল রুবেনের কৃষ্ণদেহ পদার্থের বর্ণালীর সূক্ষ্ম পরিমাপে। কৃষ্ণদেহ পদার্থের সুবিধা হল তা সব রকমের শক্তি যেমন শোষণ করে রাখে আবার তপ্ত হলে সবটাই বিকিরণ করতে পারে। 1.6 নং চিত্রে বিভিন্ন



চিত্র 1.6 : বিভিন্ন তাপমাত্রায় কৃষ্ণদেহ বিকিরণের বর্ণালী। তাপমাত্রা বাড়লে ঐ বস্তুর বিকিরণের উচ্চতম কম্পাংক ν_m ক্রমশঃ বাড়ে। 1000°k তাপমাত্রায় এমন কি তা দৃশ্য আলোর পর্যায়ে পড়ে।

তাপমাত্রায় কৃষ্ণদেহ বিকিরণের বর্ণালীবিন্যাস দেখানো হল। এই বিকিরণের বর্ণালী থেকে দেখা যায় যে, শক্তির পরিমাণ কাঁপনসংখ্যা ν এর নির্দিষ্ট গুণিতকে বাড়ে বা কমে। প্ল্যাঙ্ক তো এই তত্ত্ব সূত্রাকারে খাড়া করেছিলেন—$E=h\nu$, E=শক্তির পরিমাণ, h একটি নিত্যসংখ্যা যা এখন প্ল্যাঙ্কের নামে পরিচিত। $h\nu$ যেন শক্তির একটি কোয়াণ্টাম বা কণা। 1905 খ্রীষ্টাব্দে এই কোয়াণ্টাম তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন আইনস্টাইন তাঁর আলোক তড়িৎ পরীক্ষায়। এই পরীক্ষাটি এখন সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

কোন কোন ধাতুর পরমাণুতে আলো পড়লে তার কক্ষ থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়। আলোর তীব্রতা বাড়ালে এইসব ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে কিন্তু গতিবেগ বাড়ে না। সবুজ আলোর পরিবর্তে লাল আলো ব্যবহার করলে তার তীব্রতা অনুযায়ী ইলেকট্রন সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঠিকই হয় কিন্তু তাদের গতিবেগ কমে যায়।

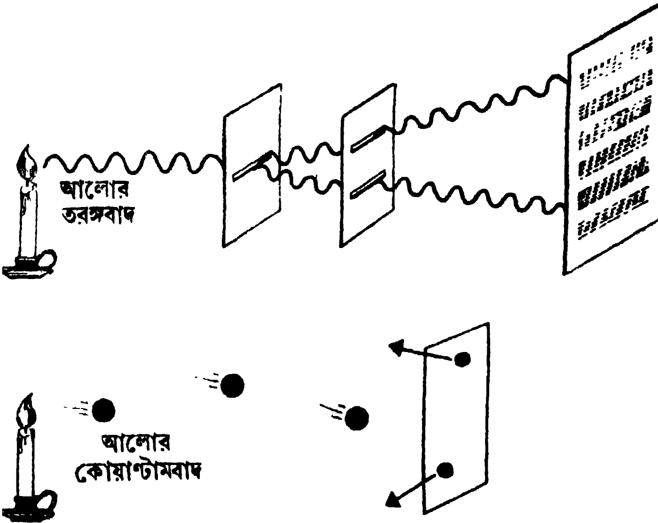


চিত্র 1.7: আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার পরীক্ষা। ধাতুর উপর $h\nu$ শক্তির ফোটন পড়ে ইলেক্ট্রনের মুক্তি দেয়।

আলোর তীব্রতার সঙ্গে ইলেকট্রনের গতিবেগ বাড়ে না কেন এবং কাঁপন সংখ্যার ভিন্নতায় লাল ও সবুজ আলোয় গতিবেগের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কেন—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব সাহায্য করে। শক্তির কোয়াণ্টাম বা ক্ষুদ্রতম কণায় কাঁপন সংখ্যা অনুযায়ী শক্তির পরিমাণ ভিন্ন। আলোর এই কোয়াণ্টাকে বলা হয় ফোটন। আলোর তীব্রতা বাড়লে ফোটনের সংখ্যা বাড়ে। ফোটনের সংঘাতে ইলেকট্রন ধাতু থেকে মুক্তি পায়, তাই ফোটনের সংখ্যার সঙ্গে ইলেকট্রন স্বভাবতঃই বেড়ে যাবে। কিন্তু লাল আলোর কাঁপনসংখ্যা সবুজ থেকে কম বলে ঐ ফোটনের শক্তিও কম। ইলেকট্রনের গতিবেগ ফোটনের শক্তির উপর নির্ভর করে, তাই লাল আলোর বেলায় ইলেকট্রনের গতিবেগ সবুজ থেকে হ্রাস পায়। $h=6{\cdot}63\times10^{-34}$ জুল সেকেণ্ড থেকেও কাঁপনসংখ্যা ও শক্তিমাত্রার সম্পর্কনির্ণয় করে যায়। 1923 খ্রীষ্টাব্দে কম্পটন অ্যাফেক্টে রঞ্জেন রশ্মির বেলায় বিকিরণের কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

জড়ের মত শক্তির কোয়াণ্টার ও ভরবেগ আছে, তা হল $E/C\nu$, C শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে 186000 মাইল বা 3×10^{10} সেণ্টিমিটার। কোয়াণ্টাম

তত্ত্বের আবিষ্কারে কিন্তু শক্তির তরঙ্গবাদ বাতিল হল না। ব্যতিচার, অববর্তন প্রভৃতি ধর্ম তরঙ্গবাদ ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তরঙ্গবাদের ভিত্তিতে বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ ও কাঁপনসংখ্যা ν ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বেলায় পৃথক্। কিন্তু তাদের গতিবেগ C একটি নিত্যসংখ্যা অর্থাৎ $\lambda \times \nu = C$। আবার কোয়াণ্টাম তত্ত্বের $E = h \times \nu$ এই দুটি সমীকরণ মিলে দাঁড়ায় $E = \frac{hC}{\lambda}$ এখন কোয়াণ্টামের ভরবেগ $= \frac{E}{C} = \frac{h}{\lambda}$ অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানে ভরবেগ পাওয়া যায়।



চিত্র 1.8 : আলোর তরঙ্গ ও কোয়াণ্টামবাদ থেকে ব্যতিচার ও আলোকীয় ইলেক্‌ট্রনের তুলনা।

C একটি নিত্যসংখ্যা বলে কাঁপনসংখ্যা ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গুণফল ঐ সংখ্যা হবে—ফলে কোন বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি বাড়ে তবে কাঁপনসংখ্যা ঐ অনুপাতে কমবে।

জড়পদার্থের তরঙ্গধর্ম

বিকিরণের ব্যতিচার ও অববর্তন তরঙ্গবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। আলোর বেলায় সূক্ষ্ম সমান্তরাল দাগ কাটা ধাতু ফলক দিয়ে তৈরি ঝিল্লী (grating)-র সাহায্যে অববর্তন পরীক্ষা করা হয়। রঞ্জেনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট বলে এই গ্রেটিং দিয়ে তার অববর্তন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ক্রিস্ট্যালের সাহায্য নিতে হয়। দানাবাঁধা পদার্থ ক্রিস্ট্যালে পরমাণুগুলি গ্রেটিং-এর মতই সাজান কিন্তু অন্তর্বর্তী দূরত্ব কম। তাই

ছোট দৈর্ঘ্যের রঞ্জেনরশ্মির তরঙ্গ কৃস্ট্যালে অববর্তিত হয় সহজে। এই অববর্তনের ছবি থেকে কৃস্ট্যালের গঠনবিন্যাসও ধরা পড়ে। এ অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।

বিকিরণে তরঙ্গ ও কোয়াণ্টাম তত্ত্বের দ্বৈতরূপ থেকে ডিব্রগ্‌লী অনুরূপভাবে পদার্থের তরঙ্গধর্ম আবিষ্কার করলেন। 1924 খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রমাণ করলেন তরঙ্গ-ধর্মী পদার্থের ভরবেগও h/λ অর্থাৎ বিকিরণের কোয়াণ্টার অনুরূপ সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যাবে। 1927 খ্রীষ্টাব্দে ডেভিসন্‌ ও জারমার কৃস্ট্যালের মধ্যে গতিশীল ইলেক্‌ট্রনের অববর্তন ঘটান। রঞ্জেন বিকিরণের মত ইলেক্‌ট্রনের এই অববর্তন জড় পদার্থের তরঙ্গধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

এই আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার—যা দিয়ে খুব ছোট পদার্থেরও পরিমাপ করা যায়। আলোর চেয়ে বেগবান্‌ ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যথেষ্ট বেশী। তাই সাধারণ মাইক্রোস্কোপের তুলনায় ইলেক্‌ট্রন মাই-স্ক্রোস্কোপে খুব ছোট কণা অনেক গুণ বড় হয়ে ধরা পড়ে। 1932 খ্রীষ্টাব্দে রুস্‌কা ও নল্‌ জার্মানিতে 400 গুণ বিবর্ধনকারী ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেন। 1937 খ্রীষ্টাব্দে টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে হিলিয়ার ও প্রেবাস্‌ 7000 গুণ বিবর্ধনের ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ্‌ তৈরি করে আলোকীয় মাইক্রোস্কোপের 2000 বিবর্ধন সীমা অতিক্রম করেন। পরবর্তীকালে 2000000 গুণ বিবর্ধনের ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক যুগে এক মিলিয়ন ভোল্ট ইলেক্‌ট্রন দিয়ে যে মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা যায় তাতে একটি বড় অণুর ব্যাসও মাপা সম্ভব। কারণ ইলেক্‌ট্রনের গতি (v) যত বাড়ে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যও তত ছোট হতে থাকে, ফলে বিবর্ধন ক্ষমতাও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। পদার্থের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে তার ভরের অনুপাত হল এইরকম $\lambda = h/mv$। তা হলে ইলেক্‌ট্রনের তুলনায় প্রোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হয়—তাই প্রোটন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আরো বেশী বিবর্ধন ক্ষমতা পাওয়া যাবে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রোটন সিন্‌ক্রোটন-এর মত কণা ত্বরণ যন্ত্রকে প্রোটন মাইক্রোস্কোপ বলা যায়। কারণ প্রোটনকে এই যন্ত্রে গতিশীল করে ভারী নিউ-ক্লিয়াস পর্যবেক্ষণ করা যায়, আরো বেশী গতিশীল প্রোটন নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরীণ খোঁজখবরও দিতে পারে।

1927 খ্রীষ্টাব্দে হাইসেনবার্গ অনিশ্চয়তাবাদ আবিষ্কার করেন। এই মতবাদ প্রমাণ করে যে কোন কণার অবস্থান ও ভরবেগ দুটিই একসঙ্গে নিশ্চিতভাবে পরিমাপ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্‌, একটি কাল্পনিক মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমরা একটি ইলেক্‌ট্রনের অবস্থান দেখতে চাই—তা দেখতে হলে আলো বা কোন বিকিরণ দিয়ে দেখতে হবে। ইলেক্‌ট্রন এত ছোট যে, বিকিরণের ধাক্কাতে তা আসল অবস্থান থেকে সরে যাবে। নিত্যনৈমিত্তিক কাজেও এরকম উদাহরণ পাওয়া যায়।

ধরা যাক্, একটি পাত্রের জলের তাপমাত্রা মাপতে একটি থার্মোমিটার ঐ পাত্রে রাখা হল—থার্মোমিটার ঐ জলের কিছুটা তাপ নিজেই শোষণ করে নেবে। তা হলে জলের আসল্ তাপমাত্রা তো পাওয়া যাবে না। একটি টায়ারের বাতাসের চাপ মাপতে যদি একটি পরিমাপী যন্ত্র ব্যবহার করি তবে কিছুটা বাতাস বেরিয়ে গিয়ে টায়ারে চাপ হ্রাস পাবে। বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপতে যে মিটার ব্যবহার করা হয়, মিটারের কাঁটা নড়তে তা নিজেই কিছুটা বিদ্যুৎ টেনে নেয়। তখন মিটারে প্রবাহের খাঁটি মান ধরা পড়ে না। সব পরিমাপের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে। কিন্তু সেই হ্রাসের পরিমাণ এত কম যে আমরা তা ধর্তব্য মনে করি না। কিন্তু ইলেকট্রনের বেলায় তার আয়তন ও পরিমাপী কণার আয়তন সমকক্ষ বলেই এই ত্রুটি এড়ান যায় না এবং তা নগণ্য হয় না। এখন আমরা ইলেকট্রনের গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে তার অবস্থান নির্ণয় করলে তা আর নড়াচড়া করতে পারছে না বলে সঠিক অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যাবে। কিন্তু তখন তো ওই নিশ্চল কণার ভরবেগ পাওয়া যাবে না। একই মুহূর্তে ইলেকট্রন বা কোন কণার গতিবেগ ও সঠিক অবস্থান নির্দেশ করা অসম্ভব।

তা হলে পরমশূন্য তাপমাত্রায় তো পদার্থের পুরোপুরি শক্তিহীন অবস্থা আসতে পারে না। তা যদি আসতো তবে গতিবেগ শূন্য ধরে নিয়ে তার অবস্থান নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা সম্ভব হ'ত। তাই ঐ তাপমাত্রায়ও কিছু গতিবেগ থাকে। তা থাকে বলেই পরমশূন্য তাপমাত্রায় হিলিয়াম তরল অবস্থায় থাকতে পারে।

1930 খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন দেখালেন যে শক্তির পরিমাপ নিখুঁত পেতে হলে যে সময়টুকুর মধ্যে পরিমাপ করা হচ্ছে তাতে অনিশ্চয়তা থাকবে। অর্থাৎ শক্তি ও সময় দুটি একসঙ্গে নিশ্চিতভাবে মাপা যাবে না। এই অনিশ্চয়তা কতটুকু ? তা নীচের সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যায়—

অবস্থানের ও ভরবেগের অনিশ্চয়তা যথাক্রমে Δx ও Δp হলে $\Delta x \times \Delta p = h$। আবার সময় ও শক্তির অনিশ্চয়তা যথাক্রমে Δt ও ΔE হলে $\Delta E \times \Delta t = h$। এই অনিশ্চয়তাবাদের ফলে আলো বা বিকিরণ যতই একবর্ণী হোক্ না কেন তার বর্ণালী রেখায় বেধ থাকবে।

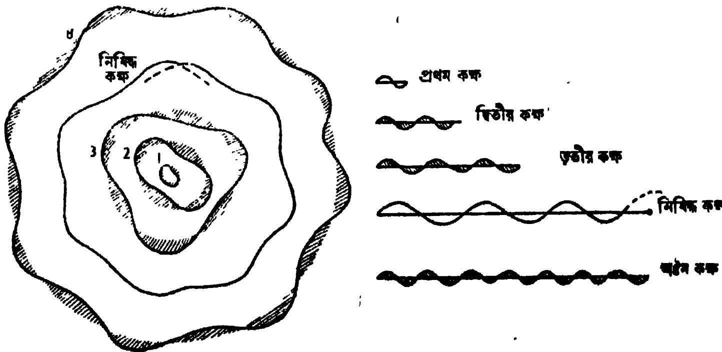
অনিশ্চয়তাবাদ পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের চিন্তাধারায় বিপ্লব নিয়ে এল। অনির্দেশ্যবাদের মত দার্শনিক সমস্যা বুঝি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল। তা বলে কেউ যদি মনে করেন অনিশ্চয়তাবাদ থেকে স্বাভাবিক সব নিশ্চয়তার বিলুপ্তি ঘটল, বা বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না ও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, প্রকৃতির খামখেয়ালীতে সব কিছু চলে, কার্যকারণ মেনে চলে না ; তবে তা নিশ্চয়ই ভুল হবে। দার্শনিকেরা যাই ভাবুন না কেন বিজ্ঞানীদের কতায়

অনিশ্চয়তাবাদ পরবর্তীকালে কোন দার্শনিক বিবর্তন নিয়ে আসেনি। উদাহরণস্বরূপ গ্যাস অণুগুলির কথা ধরা যাক্, তাদের প্রত্যেকটির আচরণ সম্পর্কে হয়ত ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, কিন্তু তাদের সমষ্টিগত আচরণ সংখ্যাতত্ত্ব বা statistics দিয়ে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা যায়।

বিজ্ঞানের বহু পর্যবেক্ষণেই অনিশ্চয়তাবাদ নগণ্য হয়ে পড়ে। মহাকাশে নক্ষত্রের ও গ্রহের কিংবা মাঠে একটি ফুটবলের এমন কি একটি ধূলিকণার পর্যন্ত অবস্থান ও গতি যথেষ্ট নিখুঁতভাবে একই সঙ্গে পরিমাপ করা যায়। তা ছাড়া অনিশ্চয়তাবাদ নিউক্লিয়াস সম্পর্কীয় গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্যই করে। অনিশ্চয়তাবাদ শুধু এই প্রমাণই করে যে যা ভাবা হ'ত তার চেয়েও জগৎ জটিল কিন্তু খামখেয়ালী নয়।

বিকিরণ ও জড়তরঙ্গের বিস্তার ও ধর্মে কিন্তু পার্থক্য আছে। জড়তরঙ্গের বিস্তার নিয়ে শ্রোডিংগার বিশদ গবেষণা করেন। ত্রিমাত্রিক দেশের স্থানাংক (co-ordinates) ও সময়ের ভিত্তিতে শক্তিসম্পন্ন কণাতরঙ্গের বিস্তার সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। জড়ের বিভিন্ন অবস্থায় এ সব সমীকরণ ও তাদের সমাধান নিয়ে তরঙ্গ বলবিদ্যা বা Wave mechanics নামে এক নতুন গণিতশাস্ত্র গড়ে উঠেছে—যা পদার্থবিজ্ঞানে নবযুগের সূচনা করেছে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও তরঙ্গ বলবিদ্যার ভিত্তিতে পরমাণুর গঠনবিন্যাস সম্পর্কীয় ধারণা এক নতুন রূপ পেয়েছে। এই মডেলে পরমাণুতে ইলেক্ট্রনের কক্ষগুলি বৃত্ত



চিত্র 1.9 : ডিব্রগলী জড়তরঙ্গ মডেলের পরমাণু
প্রথম কক্ষ শক্তিস্তর সংখ্যা $n=1$, দ্বিতীয় কক্ষ $n=2$, তৃতীয় কক্ষ $n=3$—এভাবে অষ্টম কক্ষ $n=8$-এ ইলেক্ট্রনের তরঙ্গ যে রকম থাকবে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পূর্ণসংখ্যার দৈর্ঘ্য কক্ষের পরিধির সমান নয় এমন একটি নিষিদ্ধ কক্ষও দেখান হয়েছে।

ও উপবৃত্তাকার হতে পারে—এইসব কক্ষে ইলেক্ট্রন তরঙ্গ কীভাবে বাঁধা পড়ে তার চিত্রও পাওয়া যায়। পাউলির বর্জন নীতি অনুযায়ী কোন্ কক্ষে কয়টি ইলেক্ট্রন

থাকবে তাও নির্দিষ্ট। বাইরের শক্তির প্রয়োগে বস্তুর ইলেকট্রন নীচের শক্তিস্তর থেকে ওপরের শক্তিস্তরে উঠে যায়। এই শক্তি তুলে নিলে তা থেকে শক্তির যখন বিকিরণ হয় আবার ইলেকট্রন নীচের স্তরে নেমে আসে। দুটি স্তরের শক্তি E_1 ও E_2 হলে তাদের পার্থক্য $E_1 - E_2 = h\nu$, যা হল প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম।

সোজাপথে চলতে পদার্থের যেমন রেখাকার ভরবেগ থাকে, বৃত্ত বা উপবৃত্তপথে থাকে কৌণিক ভরবেগ। পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য কৌণিক ভরবেগের সঙ্গে পরমাণু ইলেকট্রনের এই কৌণিক ভরবেগ তুলনা করা যায়।

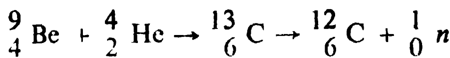
তাছাড়া পৃথিবী যেমন তার অক্ষের চারদিকে দৈনিক গতিতে আবর্তন করে পরমাণু কক্ষে ইলেকট্রনেরও এরকম আবর্তন থাকে। মুক্ত ইলেকট্রনেও এরকম আবর্তন আছে। লাট্টুর মত এই চক্রনকে বলা হয় স্পিন (Spin)। এর একক হল $h/2\pi$। এই এককে ইলেকট্রনের স্পিন $+\frac{1}{2}$ অথবা $-\frac{1}{2}$, তা আবর্তনের দিক অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়। ফোটনের বেলায় এর মান 1 আর প্রোটন কণার স্পিন $\frac{1}{2}$। একাধিক এরকম কণা যুক্ত হলে 0 $(\frac{1}{2}-\frac{1}{2})$, $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{4}{2}$ ইত্যাদি স্পিন সংখ্যা হতে পারে।

নিউক্লিয়াসের স্বরূপ

পদার্থের কণার স্পিন বিবেচনা করে পরীক্ষায় নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসের স্পিন দেখা গেল 1; অথচ তার নিউক্লিয়াসে যদি 14টি প্রোটন ও 7টি ইলেকট্রন আছে এই ধারণা অভ্রান্ত ধরা হয় তবে 21টি কণার জন্য স্পিন তো পূর্ণসংখ্যা হবে না। স্পিন নিয়ে এই সমস্যা থেকে নিউক্লিয়াসের স্বরূপ নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। অনিশ্চয়তাবাদের ভিত্তিতে নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকতে পারে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ দেখা যায়। নিউক্লিয়াসের ব্যাস $\sim 10^{-13}$ সেণ্টিমিটারের বেশী হলে, তাতে ইলেকট্রনের অবস্থানের অনিশ্চয়তা Δx এর জন্য অনিশ্চয়তাবাদের নিয়মে ভরবেগের যে অনিশ্চয়তার প্রয়োজন তাতে ইলেকট্রনের শক্তি দশ কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট বা তার বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু এত শক্তিমান ইলেকট্রন তো পরমাণুতে পাওয়া যায় না।

1913 খ্রীষ্টাব্দে সোডি প্রমাণ করেন যে একই পারমাণবিক সংখ্যার পরমাণুর ভরসংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। তিনি এদের নামকরণ করেন আইসোটোপ। তেজস্ক্রিয় ও স্থায়ী উভয় ক্ষেত্রেই আইসোটোপ থাকতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ও অ্যাক্টিনিয়াম—এই তিনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থশ্রেণী একাধিক তেজস্ক্রিয়ায় ক্ষয় পেয়ে যথাক্রমে 206, 208 ও 207 ভরসংখ্যার স্থায়ী পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই তিনটি ভরসংখ্যার পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু অভিন্ন; আসলে তা হল সীসা বা

lead। 1919 খ্রীষ্টাব্দে অ্যাস্টন ম্যাসস্পেক্ট্রোগ্রাফের সাহায্যে দেখালেন যে 20 ছাড়াও 22 ভরসংখ্যার নিওন পরমাণু আছে, তার পরিমাণ 20 সংখ্যার পরমাণুর প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। পরবর্তীকালে 21 ভরসংখ্যার নিওন পরমাণুও পাওয়া গেছে—যার পরিমাণ প্রায় $\frac{1}{400}$ ভাগ। রসায়নবিদ্‌রা নিওনের যে পারমাণবিক ওজন 20·183 ধরে নিতেন, তা দেখা গেল প্রাকৃতিক এইসব আইসোটোপের স্বাভাবিক প্রাচুর্যের গড়। আলাদাভাবে আইসোটোপের ওজন পূর্ণসংখ্যক—গড় নিলেই ভগ্নাংশ এসে পড়ে। 1922 খ্রীষ্টাব্দে অ্যাস্টন নোবেল পুরস্কার পান। তিনি তাঁর নোবেল বক্তৃতায় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে শক্তি আহরণ করার সম্ভাবনার কথা স্পষ্টতঃই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রাউটের ধারণা যে একেবারে নস্যাৎ হল তা নয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াস যে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস দিয়ে গড়া তাঁর এই ধারণা অভ্রান্ত না হলেও প্রমাণ হল যে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ভরের এককে নিউক্লিয়াস গড়ে উঠেছে। আইসোটোপ আবিষ্কারে জানা গেল পরমাণুর ওজন যা ভগ্নাংশে পাওয়া যায় তা তার আইসোটোপের বিভিন্ন প্রাচুর্যের সংমিশ্রণে সম্ভব হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন ছাড়া ভারী নিউক্লিয়াসে তার সমান ভরের আর কোন্ কণিকা থাকতে পারে? Z ও A সামঞ্জস্য রাখতে এমন একটি কণার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যার ভর প্রোটনের সমতুল অথচ আধানহীন। 1920 খ্রীষ্টাব্দে এই কল্পিত কণার নামকরণ করা হয় নিউট্রন। কিন্তু তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল প্রায় বারো বছর পরে—যখন স্যাডউইক বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াসে আল্‌ফা কণা আঘাত করে মুক্ত নিউট্রন আবিষ্কার করলেন। ঐ নিউক্লীয় ক্রিয়া হল—



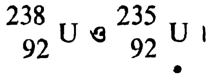
$$^{9}_{4}\text{Be} + ^{4}_{2}\text{He} \rightarrow ^{13}_{6}\text{C} \rightarrow ^{12}_{6}\text{C} + ^{1}_{0}n$$

(কোন পরমাণু বোঝাতে $^{A}_{Z}X_{N}$ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় N নিউট্রন সংখ্যা, n মুক্ত নিউট্রন)

নিউট্রন আধানহীন বলে তার ভেদশক্তি এমন কি গামারশ্মির চাইতেও বেশী। স্যাডউইকের পরীক্ষায় নিউট্রন মুক্ত হওয়ার পর পরীক্ষা নলের কাচের দেওয়ালে যে আহত নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে, তা বায়বের আয়নন প্রক্রিয়ায় বিশেষ যন্ত্রে নিউট্রনের অস্তিত্ব জানায়। নিউট্রনের আবিষ্কারের ফলে নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসে কণিকার সংখ্যা দাঁড়াল 21 নয় 14 তার 7টি প্রোটন ও 7টি নিউট্রন। যুগ্মসংখ্যক কণায় একক স্পিন থাকার সমস্যা নিয়ে যে সংকট চলছিল, তার অবসান ঘটল।

নিউক্লিয়াসের এই নতুন মডেলে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস হল 1টি প্রোটন, ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়েটরনে 1টি প্রোটন ও 1টি নিউট্রন, হিলিয়ামে 2টি প্রোটন

ও 2টি নিউট্রন—এভাবে মৌলিক পদার্থ ও আইসোটোপগুলির নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তার দুটি আইসোটোপ


$^{238}_{92}U$ ও $^{235}_{92}U$ ।

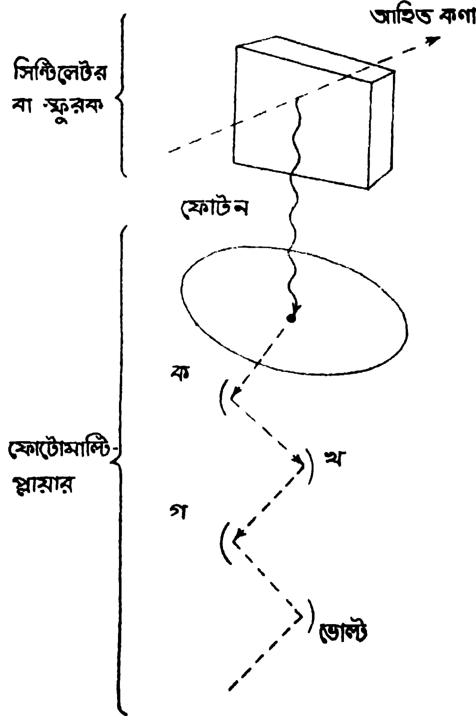
বেরিলিয়াম, ফ্লোরিন, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থের পরমাণুর আইসোটোপ নেই। তাছাড়া প্রায় সব পরমাণুর এক বা একাধিক স্বভাবজ স্থায়ী আইসোটোপ আছে। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থেরও বহু অস্থায়ী আইসোটোপ রয়েছে। তাছাড়া আধুনিক কণাত্বরণ যন্ত্রে ও নিউক্লীয় রিয়্যাক্টরে অসংখ্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

কণা সন্ধানী যন্ত্র

রাদারফোর্ড আল্‌ফা কণার সন্ধান পাওয়ার পর পদার্থ বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়াসের স্বরূপ জানতে, একটি নিউক্লিয়াস থেকে অন্য নিউক্লিয়াসের পরিবর্তনে কণা সন্ধানী যন্ত্রের ব্যবহার করেন। রাদারফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা আল্‌ফা কণা সন্ধানী হিসেবে অবিশুদ্ধ জিঙ্ক সালফাইড মাখানো পর্দা ব্যবহার করেন। আল্‌ফা কণার আঘাতে এই পর্দায় যে স্ফুরণ (scintillation) পাওয়া যায় তা খালি চোখে দেখা যায়। এখন জিঙ্ক সালফাইডের পর্দাটি একটি ধাতুর চাক্‌তি দিয়ে ঢেকে দিলে আলফা কণার জন্য স্ফুরণ পাওয়া যাবে না। এই যন্ত্রে হাইড্রোজেন গ্যাস ঢুকিয়ে দেখা গেল ধাতুর চাক্‌তি ভেদ করেও স্ফুরণ পাওয়া যাচ্ছে। আলফা কণা এখন হাইড্রোজেন-এর প্রোটনকে আঘাত করে এত বেগবান করে যে তা ধাতু ভেদ করে স্ফুরণ ঘটায়। আল্‌ফা কণা থেকে এই প্রোটনের স্ফুরণের প্রকৃতিও আলাদা দেখা যায়। পরে এই সব স্ফুরণ বিদ্যুৎ ঝলকে রূপান্তরিত করে বিদ্যুৎ বর্তনীর সাহায্যে কণাসন্ধানী হিসেবে সহজে ব্যবহার করা হয়। 1931 খ্রীষ্টাব্দে ওয়াইন উইলিয়ামস্ একাধিক দুই, চার বা ততোধিক ঝলকের একটি রেকর্ড করার 'স্কেলার' বৈদ্যুতিক বর্তনী আবিষ্কার করেন। তাতে কণাসন্ধান আরও সুগম হয়। জিঙ্ক সালফাইড-এর পরিবর্তে জৈব পদার্থ ব্যবহার করে কণাসন্ধান আজকাল অনেক সহজ হয়েছে।

এই সব পদার্থের মধ্যে ন্যাপথালিন্, অ্যান্থ্রাসিন প্রভৃতি জিঙ্ক সালফাইড থেকেও ভাল স্ফুরণের উৎস। স্ফুরণের আলোর ঝলক রূপান্তরিত করা হয় বৈদ্যুতিক ঝলকে—ফোটোমাল্টিপ্লায়ারের সাহায্যে। (চিত্র 1.10)।

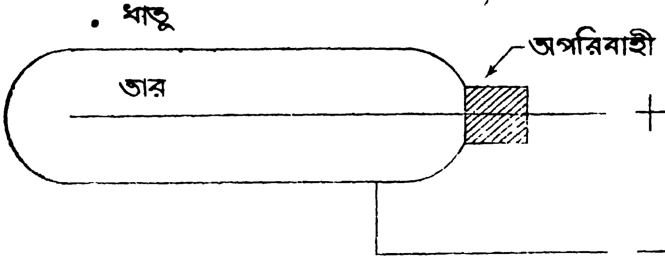
উচ্চশক্তির কণা ও বিকিরণ বিশেষ গ্যাসে আয়নন ক্রিয়া ঘটাতে পারে। এই পদ্ধতির কণাসন্ধানী যন্ত্রের মধ্যে গাইগার কাউন্টার (চিত্র 1.11) উল্লেখযোগ্য।



চিত্র 1.10 : স্ফুরণ কাউন্টার। আহিত কণা বা উচ্চ শক্তির গামা বিকিরণে সোডিয়াম আয়োডাইড বা প্ল্যাস্টিক ইত্যাদিতে আলোর স্ফুরণ বা সিন্টিলেশন হয়। স্ফুরণের ফোটন ফোটোমাল্টিপ্লায়ারের ফোটো ক্যাথোডে পড়ে ইলেক্ট্রন উৎপাদন করে। এই সব ইলেক্ট্রন ক, খ, গ প্রভৃতি ক্রমশঃ উচ্চতর বিভবের ইলেক্ট্রোড বা ডাইনোডে (dynode) চালিত হয়ে প্রতি ডাইনোডে ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যার ইলেক্ট্রন সৃষ্টি করে। অবশেষে অ্যানোডে বিবর্ধিত ইলেক্ট্রনের যে স্রোত ধরা পড়ে, তা দিয়ে আহিত কণা বা বিকিরণের পরিমাপ পাওয়া যায়।

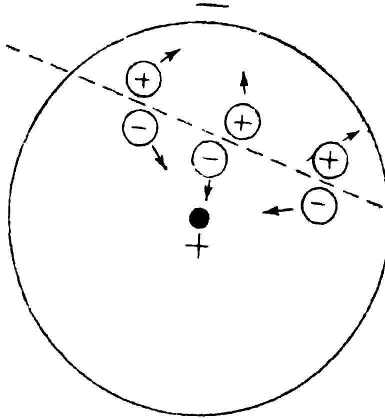
এই কাউন্টারে একটি ধাতব টিউবের মধ্যে থাকে আর্গন ও অ্যালকোহল বাষ্প। এই টিউবের কেন্দ্রে থাকে উচ্চ বৈদ্যুতিক বিভবযুক্ত তার অ্যানোড। কোন উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা অথবা বিকিরণ এই টিউবে গ্যাস পরমাণু আয়নিত করে (চিত্র 1.12) ও ইলেক্ট্রনের মুক্তি দেয়। এই ইলেক্ট্রন আবার অন্য পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রনের পর পর মুক্তি দিয়ে ক্ষরণ সৃষ্টি করে। তখন এই ক্ষরণ থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ বিবর্ধিত করে কণার সন্ধান ধরা যায়।

1895 খ্রীষ্টাব্দে উইলসন্ নূতন কণাসন্ধানী মেঘকক্ষের আবিষ্কার করেন। এতে একটি কাচের পাত্রের বাতাস জলীয় বাষ্প সংপৃক্ত করে রাখা হয় ও একটি পিস্টন



চিত্র 1.11 : গাইগার কাউন্টার। ধাতুর ক্যাথোড ও অ্যানোড তারের মধ্যবর্তী বায়বে আয়নন ঘটিয়ে আহিত কণা বা বিকিরণ তার আবির্ভাব জানিয়ে দেয়। ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যবর্তী উচ্চ বিভব এই আয়নন বিবর্ধিত করে।

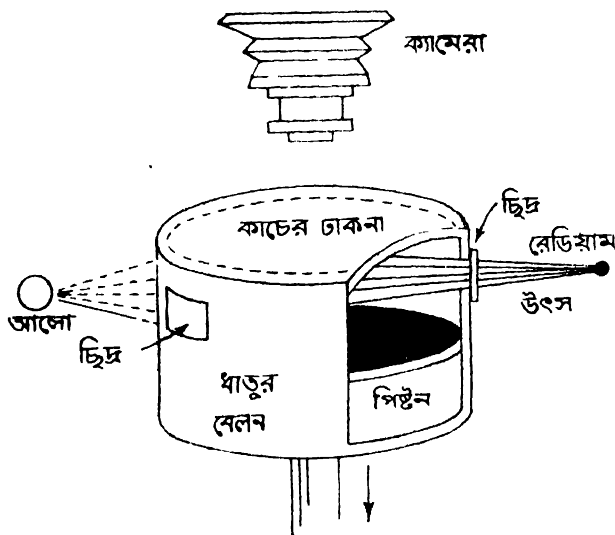
থাকে। পিস্টনটি বাইরের দিকে টানলে, ভেতরের বাতাস হঠাৎ সম্প্রসারিত হয়ে ঠাণ্ডা হয়। এই নীচু তাপমাত্রায় মেঘকক্ষের বাতাস অতিসংপৃক্ত হয়। আহিত কণা এই



চিত্র 1.12 : গাইগার কাউন্টারে কণার গতিপথে যেভাবে আয়নন ঘটে।

কক্ষে তখন জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করে ও চলার পথে যে আয়ন তৈরি করা যায়, তাতে মেঘ জমে কণার পথ ফুটিয়ে তোলে। এই অবস্থায় ছবি নিয়ে দেখা যায় বীটা-কণার পথ ক্ষীণ ও আঁকাবাঁকা, আল্‌ফার গতিপথ মোটা ও সোজা। কোনও এরকম কণা যদি একটি নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে প্রতিহত হয় তবে তার বাঁক

ছবিতে ফুটে ওঠে। আল্‌ফা কণা দুটি ইলেকট্রন টেনে নিয়ে যদি উদাসীন হয়ে পড়ে তবে তার পথের শেষ বিন্দুটিও সহজে দেখা যায়। মেঘকক্ষ চুম্বক ক্ষেত্রে রাখলে



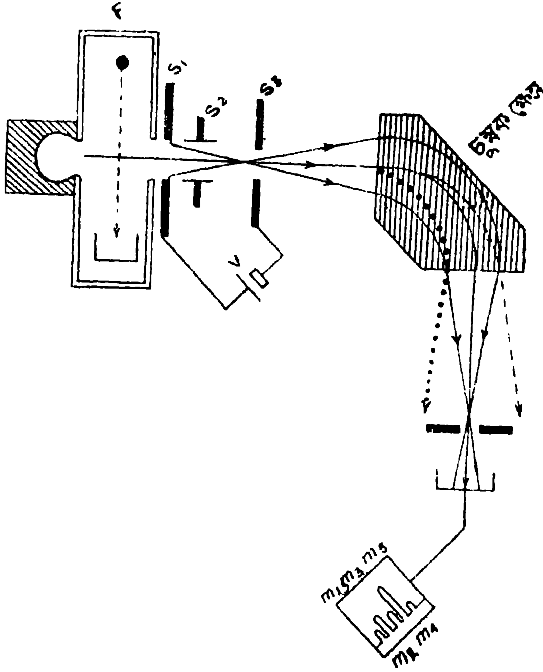
চিত্র 1.13 : মেঘকক্ষ। পিষ্টন বাইরের দিকে টানলে শীতলতর বায়ু অতিসংপৃক্ত হয় ও কণার গতিপথে যে আয়ন সৃষ্টি হয় তাতে মেঘ জমে কণার পথ ক্যামেরায় ধরে রাখে।

আহিত কণা পজিটিভ না নেগেটিভ, বিপরীত দিকে তাদের বক্রতা দেখে বোঝা যায়। বক্রতার পরিমাপ থেকে তাদের ভর ও শক্তির পরিমাণও পাওয়া যায়। এরকম মেঘ-কক্ষে একবার সম্প্রসারণের পর আবার পিস্টন দিয়ে সঙ্কুচিত না করলে পুনরায় ব্যবহার করা যায় না। 1939 খ্রীষ্টাব্দে ল্যাংস্‌ডর্ফ যে ব্যাপন মেঘকক্ষের আবিষ্কার করেন, তাতে অ্যালকোহল শীতলতর অংশে ব্যাপনের ফলে সব সময়ই অতিসংপৃক্ত বায়ুর সৃষ্টি হয় ; ফলে এই যন্ত্রে অবিরাম কণার গতিপথ ধরা সম্ভব হয়।

1953 খ্রীষ্টাব্দে গ্লেসার বুদ্‌বুদ্‌ কক্ষ আবিষ্কার করেন। এতে অতিসংপৃক্ত বায়ুর পরিবর্তে বেশী চাপে তরল পদার্থ থাকে। আহিত কণা এই তরলে তার গতিপথে বাষ্পের বুদ্‌বুদ্‌ ফুটিয়ে তোলে। বীয়ারের বোতলে অনুরূপ ক্রিয়া থেকে গ্লেসার এই কণাসন্ধানী যন্ত্রের ধারণা পান। বুদ্‌বুদ্‌ কক্ষে অবিরাম চিত্র পাওয়া যায়। অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ও খুব ক্ষণস্থায়ী কণাও এতে ধরা পড়ে। বুদ্‌বুদ্‌ কক্ষ এমন কি 12 ফুট চওড়া ও 7 ফুট উঁচু হয়, যাতে 6400 গ্যালন পর্যন্ত তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করা যায়। 200 লিটার তরল হিলিয়াম বুদ্‌বুদ্‌ কক্ষ যুক্তরাজ্যে কণাসন্ধানের জন্য চালু

আছে। মেঘকক্ষের চেয়ে বুদ্‌বুদ্‌কক্ষ যথেষ্ট সুবেদী কিন্তু শুধু ঈপ্সিত কণার সন্ধানে মেঘকক্ষের মত বুদ্‌বুদ্‌ কক্ষ ব্যবহার করা যায় না। এতে সব ঘটনাই ধরা পড়ে। পরে তা বেছে নিতে হয় প্রয়োজন মত।

1959 খ্রীষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী ফুকুই ও মিয়ামোটো যে কণাসন্ধানী স্ফুলিঙ্গ কক্ষ (spark chamber) আবিষ্কার করেন, তাতে অনেকগুলি ধাতুর প্লেটের মাঝে



চিত্র 1.14 : ম্যাস্‌স্পেক্টোমিটার বা ভরবর্ণালীমাপী যন্ত্র
S—কঠিন পদার্থ বাষ্পীভবনের ফার্নেস *F*—ইলেক্‌ট্রন উৎপাদনকারী ফিলামেণ্ট; ইলেক্‌ট্রন অ্যানোডের দিকে প্রবাহিত হ'য়ে বাষ্পীয় পরমাণুব সঙ্গে সংঘাতে আয়ন উৎপন্ন করে S_1, S_2 ছিদ্রযুক্ত ইলেক্‌ট্রোড-এর মধ্যবর্তীস্থলে আয়ন *V* বিভবে ত্বরিত হয়। S_3—ফাকাসকারী ছিদ্রযুক্ত ইলেক্‌ট্রোড *B*—চুম্বকক্ষেত্র, m_1, m_2 ইত্যাদি বিভিন্ন ভারের আয়ন এই চুম্বকক্ষেত্রে বৃত্তাংশপথে বিভিন্ন ব্যাসার্ধে চালিত হয়। সাধারণতঃ একই বিভবে চুম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তনে বিভিন্ন ভরের m_1, m_2 আইসোটোপ কী আনুপাতিক পরিমাণে আছে, তা ভরবর্ণালীর (mass spectrum) প্রাচুর্যের অনুপাত থেকে নির্ধারিত করা হয়।

নিওন গ্যাস আহিত কণার আঘাতে আয়নিত হয়ে বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কণার পথ ফুটিয়ে তোলে। ঈপ্সিত কণার জন্য এই যন্ত্র ইচ্ছামত প্রস্তুত রাখা যায়। সোভিয়েট

বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রের আরো উন্নতি সাধন করেন যাতে বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গের পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন আলোর রেখা পাওয়া যায়।

এই সব কণাসন্ধানী যন্ত্রের সাহায্যে নিউক্লিয়াস ও তার আভ্যন্তরীণ কণার সন্ধান ছাড়াও বহু অস্থায়ী কণার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, অ্যাস্টনের ম্যাসস্পেক্ট্রোগ্রাফে যাতে আইসোটোপের অস্তিত্ব ধরা পড়ে তাও নিউক্লিয়াসের স্বরূপ জানতে বিশেষ সাহায্য করে। পরবর্তী কালে ডেম্পস্টার ও নীয়ের এই যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এতে মৌলিক পদার্থ আয়নিত করে চুম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে তার ভর নির্ণয় করা যায়। 1.14 চিত্রে নীয়েরের একটি ম্যাস্‌স্পেক্ট্রোমিটারের কার্যপ্রণালী দেখান হল।

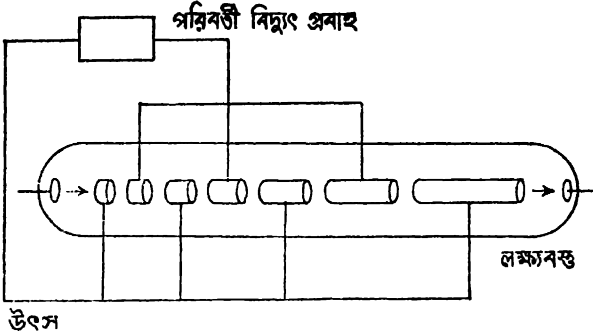
কণাত্বরকের ক্রমবিকাশ

রাদারফোর্ড যখন মেঘকক্ষে নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসে আল্‌ফা কণার আঘাতে প্রোটন পান, তখন দেখা যায় ফর্কের আকারে দুটি রেখা। একটি সরু প্রোটনের জন্য ও অন্যটি নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসের জন্য মোটা আকারের। কিন্তু আল্‌ফা কণার কোন চিহ্ন সেখানে দেখা যায় না। ব্ল্যাকেট অশেষ ধৈর্য ও পরিশ্রমে এই ঘটনার প্রায় 20000 চিত্র নেন, তাতে আটটি এরকম সংঘাত ধরা পড়ে। 1948 খ্রীষ্টাব্দে ব্ল্যাকেট এজন্য নোবেল পুরস্কার পান। এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসে আল্‌ফা শোষিত হয়ে ভরসংখ্যা 18 (14+4) ও পারমাণবিক সংখ্যা 9 (7+2)-তে বেড়ে যায়। আবার প্রোটন বেরিয়ে যাওয়ায়, ভরসংখ্যা 17 ও পারমাণবিক সংখ্যা 8-এ নেমে যায়। এই মৌলিক পদার্থ হল অক্সিজেনের একটি আইসোটোপ। আসলে 1919 খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড এই আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে মৌলিক পদার্থের রূপান্তরে সমর্থ হন। ইতিহাসে এই পরীক্ষা মনুষ্যকৃত মৌলিক পদার্থের প্রথম রূপান্তর বলে অভিহিত হয়।

কিন্তু স্বভাবজ আল্‌ফা কণার শক্তি এত বেশী নয় যে, তার পজিটিভ আধান ভারী নিউক্লিয়াসে রূপান্তর ঘটাতে পারে। তাই প্রোটন ইত্যাদি কণাকে কৃত্রিম উপায়ে শক্তিসম্পন্ন করার প্রয়োজন, যাতে এই সব কণা নিউক্লিয়াসের ভাঙন ঘটাতে পারে। এই ধারণা থেকে কণাত্বরণ যন্ত্রের আবিষ্কার আরম্ভ হয়। 1928 খ্রীষ্টাব্দে ককৃফ্‌ট ও ওয়াল্‌টন 'ভোল্টেজ মাল্টিপ্লায়ার' দিয়ে প্রোটনকে 400 কিলো ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট শক্তি দিতে সমর্থ হন। এক ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট হল একটি ইলেক্‌ট্রন এক ভোল্ট বৈদ্যুতিক বিভবে যতটা শক্তি পায়, তার পরিমাণ। এই শক্তির প্রোটন দিয়ে তাঁরা লিথিয়াম নিউক্লিয়াস ভাঙতে সক্ষম হন। এজন্য 1951 খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান।

ভ্যান্ ডি গ্রাফ্ আর এক ধরনের কণাত্বরক আবিষ্কার করেন, যাতে নেগেটিভ ও পজিটিভ আধান যন্ত্রের দুটি বিপরীত দিকে জমা হয়ে বিপুল বিভবের সৃষ্টি করে। ভ্যানডিগ্রাফ এই পদ্ধতিতে আট মিলিয়ন ইঃ ভোঃ (Mev) শক্তিতে কণা ত্বরণে সক্ষম হন। অধুনা 24 থেকে 30 Mev শক্তির ভ্যানডিগ্রাফ্ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এসব যন্ত্রে বাস্তবে বিভবের একটা সীমার উপরে ওঠা যায় না। এই অসুবিধা এড়াতে 1931 খ্রীষ্টাব্দে রেখাকার ত্বরক (linear accelerator) আবিষ্কার হল। এই যন্ত্রে একটি নলে প্রোটন অংশে অংশে ইলেক্‌ট্রোডের সাহায্যে ত্বরান্বিত হয়। এখানে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ চালক বল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একটি খণ্ডে প্রোটন যে ত্বরণ পায় তার পরবর্তী খণ্ড একই সময়ে পেরোতে তা একটু বড় রাখা হয়। এভাবে

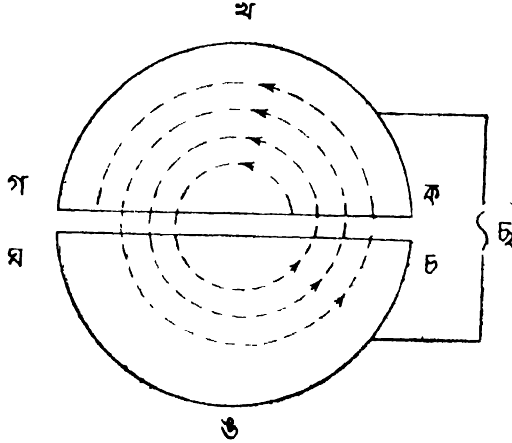


চিত্র 1.15 : রেখাকার ত্বরণ যন্ত্র। আয়ন উৎস, বিপরীত দিকে লক্ষ্যবস্তু। পরিবর্তী বিদ্যুৎ বিভবে ত্বরণ লাভের পর সময়ের ব্যবধান সমান রাখতে পর পর নলের দৈর্ঘ্যের ক্রমশঃ বর্ধিত আকার দিতে হয়।

ত্বরণের জন্য সময় সমান রাখতে কণাগুলি যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহের একই দশায় (phase) প্রত্যেক অংশ পেরোতে পারে তাই প্রত্যেক অংশই পূর্ববর্তী অংশের চেয়ে আকারে বড় থাকে। এই ব্যবস্থায়ও ত্বরণের একটা সীমার ওপরে পৌঁছান যায় না।

1930 খ্রীষ্টাব্দে লরেন্স প্রথম বৃত্তাকার ত্বরক সাইক্লোট্রন তৈরি করেন। এই যন্ত্রে প্রোটন যখন চুম্বকক্ষেত্রে অর্ধবৃত্ত পূর্ণ করে, তখন পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহে তাকে ত্বরণ দেওয়া হয়। ত্বরণ বাড়ার সঙ্গে তার বৃত্তাকার পথ বেড়ে চলে ও ক্রমশঃ তার ত্বরণও প্রতিবার বৃত্তপথে বাড়তে থাকে। সাইক্লোট্রনের কক্ষে অর্ধবৃত্ত ইংরাজী D অক্ষরের দুটি Dee থাকে। Dee দুটির মধ্যবর্তী অংশেই ত্বরণ ঘটে। 1939 খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রনে 20 Mev শক্তির কণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই শক্তি স্বভাবজ তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন আল্‌ফা কণার সর্বোচ্চ শক্তির প্রায় দ্বিগুণ।

এই শক্তির বেশী পেতে হলে সাইক্লোট্রনের অসুবিধা হল, আপেক্ষিকতাবাদের নিয়ম অনুযায়ী তখন গতিবেগের সঙ্গে কণার ভরও বাড়তে থাকে। ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহের যে দশায় (phase) ত্বরণ হয় পরবর্তী বৃত্তপথে কণা সেই দশা থেকে পেছিয়ে



চিত্র 1.16 : বৃত্তাকার ত্বরণ যন্ত্র—সাইক্লোট্রোন

তীর চিহ্ন পথে আয়নের ত্বরণ ঘটে। চুম্বকক্ষেত্র (চিত্রে দেখানো নাই) চিত্রের সমতলের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত। কেন্দ্রে থাকে আয়ন উৎস। ছ—বেতার বিভব উৎপাদনকারী আন্দোলক (oscillator)। কখগ ও ঘঙচ অংশ দুটি ডি (Dee)। এই দুই অংশের মধ্যবর্তী ফাঁকে আয়ন ত্বরণ লাভ করে। ঐ ফাঁকে বেতার বিভবের দিক্ উল্টে যায় ও দুটি 'ডি'তে আয়নের গতিপথ ত্বরিত অবস্থায় একই চুম্বকক্ষেত্রে বিপরীতমুখী হয়।

পড়তে থাকে। ফলে ত্বরণ সম্ভব হয় না। ভেক্সলার ও ম্যাক্মিলান এই অসুবিধা দূর করতে সিনক্রোসাইক্লোট্রনের আবিষ্কার করেন। এতে বিদ্যুৎ প্রবাহের কাঁপন সংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে বাড়তি ভরের কণাটিকে ঠিক দশায় এগিয়ে আনা হয়। এই উপায়ে 1946 খ্রীষ্টাব্দে 200-400 Mev শক্তির কণা সাইক্লোট্রনে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। অধুনা 700-800 Mev শক্তির সিন্ক্রো সাইক্লোট্রন আমেরিকা ও রাশিয়াতে চালু আছে।

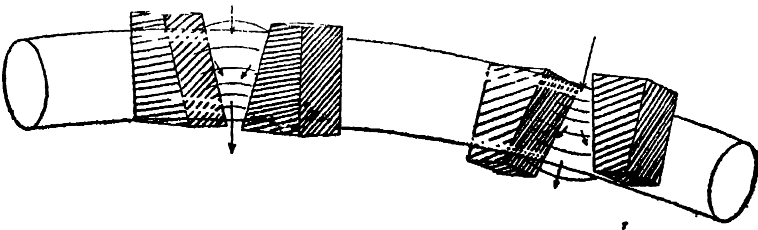
ইলেক্ট্রন ত্বরণের সমস্যা কিছুটা ভিন্ন। ইলেক্ট্রন হাল্কা বলে তার ত্বরণ বেশী হলে তবেই কাজে লাগান যায়। গতিবেগ বাড়লে ইলেক্ট্রনের ভর এত বেশী বাড়ে যে, সাইক্লোট্রন পদ্ধতিতে তার ত্বরণ সম্ভব নয়। তাই 1940 খ্রীষ্টাব্দে কার্স্ট বীটাট্রন নামে যে ত্বরণ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন, তাতে ত্বরান্বিত ইলেক্ট্রনের ভরের সঙ্গে সমতা রাখতে বিদ্যুৎপ্রবাহের তীব্রতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রে একই বৃত্তপথে বার বার

ইলেকট্রন্ আবর্তিত হয় ও ত্বরান্বিত হতে থাকে। এই শ্রেণীর যন্ত্রে 340 Mev পর্যন্ত ইলেকট্রনের শক্তি পাওয়া যায়।

1946 খ্রীষ্টাব্দে বৃত্তাকার ইলেকট্রন্ সিন্‌ক্রোট্রন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়—বীটাট্রন থেকে তা আর একটু উন্নত। এতে প্রায় 1000 Mev শক্তির ইলেকট্রন পাওয়া যায়। তার বেশী পাওয়ার অসুবিধা হল, ত্বরণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তীয় পথে চলার জন্য ইলেকট্রন থেকে শক্তির বিকিরণ ঘটে, ফলে ত্বরণ বাড়ান যায় না।

1947 খ্রীষ্টাব্দে প্রোটন সিন্‌ক্রোটন আবিষ্কৃত হয়। এই যন্ত্রে প্রোটন একই বৃত্তে বার বার আবর্তিত হয় ও তার শক্তি বাড়তে থাকে। একটি বৃত্তপথে চলতে পারে বলেই এতে ছোট আয়তনের চুম্বক ক্ষেত্র হলেই চলে। ব্রুকহ্যাভেনে 2 থেকে 3 Gev ($1G=1000$ Mev) প্রোটন সিন্‌ক্রোট্রন তৈরি হয়—তার নাম দেওয়া হয় কসমোট্রন। দু'বছর পরে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও 5-6 Gev-র বিভাট্রন চালু হয়। 1957 খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতে তৈরি 10 Gev শক্তির 'ফেজট্রন্' যন্ত্র তৈরির কথা ঘোষণা করেন।

প্রোটন সিনক্রোট্রনে ত্বরণ বাড়াতে গিয়ে দেখা যায় যে, কণাগুলির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। আলোর যেমন লেন্সে ফোকাসন (focussing) সম্ভব হয়, প্রোটন বা আহিত কণারও চুম্বক ক্ষেত্রে ফোকাসন হয়। বৃত্তপথে বক্র হওয়ার সঙ্গে এই ফোকাসন সম্ভব না হলে বৃত্তাকার কোন কণাত্বরণ যন্ত্রই শক্তিশালী কণা উৎপন্ন করতে সক্ষম হত না। কারণ ত্বরণের সঙ্গে সঙ্গে তা কক্ষের দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যেত। প্রোটন সিন্‌ক্রোট্রনের উচ্চশক্তি কণার বেলায় এই ফোকাসন ক্রিয়া দুর্বল হতে থাকে।

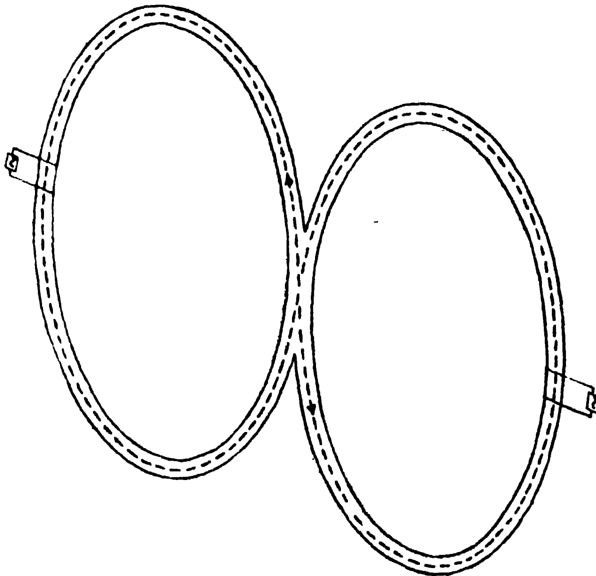


চিত্র 1.17 : তীব্র ফোকাসন ক্রিয়ার জন্য ফোকাসিং চুম্বকের মেরুদ্বয় সমান্তরাল না হয়ে নতিযুক্ত হয়। ঐজন্য এরকম দুটি চুম্বক পর পর থাকা আবশ্যক, যার একটির মেরুদ্বয়ের নতি অন্যটির বিপরীত; সোজা ও তেরছা তীর চিহ্নগুলি যথাক্রমে অনুভূমিক ও উল্লম্ব চুম্বকীয় বল বোঝায়। সাধারণ সমান্তরাল মেরুর চুম্বক থেকে এর লেন্স বা ফোকাসন ক্রিয়া অনেক তীব্র।

তাই ক্রিস্টোফিলস্ চুম্বকের তীব্র ফোকাসন (Strong focussing) ক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে সমান্তরালের পরিবর্তে চুম্বকের মেরু দুটিতে নতি থাকে। বিপরীত নতির

পরপর দুটি চুম্বকক্ষেত্র দিয়ে আহিত কণার তীব্র ফোকাসন সম্ভব হয়। জেনেভাতে CERN (European Committee for Nuclear Research) 24 Gev শক্তির এরকম একটি তীব্র ফোকাসন সিনক্রোট্রন তৈরি করেছেন যা তিন সেকেণ্ড অন্তর প্রোটনের এই শক্তির বিচ্ছিন্ন ঝলক উৎপন্ন করে। প্রতিটি ঝলকে প্রায় 10^{10} প্রোটন থাকে। এর বৃত্তপথ প্রায় $\frac{1}{8}$ মাইল। প্রতি তিন সেকেণ্ডে এই ঝলক তৈরি হতে প্রোটন এই দীর্ঘপথ প্রায় 5×10^5 বার অতিক্রম করে। এতে ব্যবহৃত চুম্বকের লোহার ওজন প্রায় 3500 টন। ব্রুকহ্যাভেনে 30 Gev ও রাশিয়ায় 70 Gev শক্তির এরকম যন্ত্র নির্মিত হয়েছে। আমেরিকাতে 300 Gev এরকম যন্ত্র তৈরি হচ্ছে।

রেখাকার ত্বরণ যন্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বৃত্তাকার পথে চলতে ইলেকট্রনের ত্বরণে যে শক্তির বিকিরণে নাশ হয়, রেখাকার ত্বরণ যন্ত্রে তা হয় না। তাছাড়া ঐ যন্ত্রে ইলেকট্রন তীক্ষ্ণতর ফোকাসনের দ্বারা লক্ষ্যভেদ করতে পারে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'মাইল লম্বা এরকম একটি যন্ত্রে প্রায় 45 Gev শক্তির ইলেকট্রন পাওয়া যাচ্ছে।



চিত্র 1.18 : ত্বরণ যন্ত্রে উৎপাদিত দ্রুতগামী আয়ন স্থির লক্ষ্যবস্তুতে কিছু শক্তি হারিয়ে ফেলে। লক্ষ্যবস্তুর (Target) আয়ন দ্রুতগামী অবস্থায় উৎক্ষেপিত (Projectile) আয়নের সঙ্গে বিপরীতমুখী সংঘাতে শক্তি গুণিত হয়।

এখন আবার এরকম কণাত্বরণ যন্ত্রের ধারণা করা হচ্ছে, যাতে দুটি কণাত্বরক মুখোমুখি রেখে দুই বিপরীত দিকের শক্তিসম্পন্ন কণিকার সংঘাত ঘটিয়ে শক্তি প্রায়

চারগুণ বাড়ান যায়। ফলে স্থির লক্ষ্য বস্তুতে পড়ে কণার শক্তি যে অনেকটা হ্রাস পেয়ে যেত, তা এড়ান যায়। তাই এরকম যুগল কণাত্বরকই বোধ হয় হবে কণাত্বরণ যন্ত্রের ক্রমবিকাশে পরবর্তী পদক্ষেপ।

জড় ও শক্তির তুল্যমূল্যতা

তেজস্ক্রিয়ার আবিষ্কারে শক্তি সম্পর্কীয় গতানুগতিক ধারণাতে পরিবর্তন দেখা গেল। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে শক্তির স্বতঃ বিকিরণ, নিউক্লিয়াসের স্বরূপ ও তার রূপান্তর থেকে দেখা গেল যে, রসায়নবিদ্‌গণ শক্তির যে সংজ্ঞা দেন, শক্তির স্বরূপ তা থেকে পৃথক্। রেডিয়াম্ থেকে ঘণ্টায় প্রায় 4000 ক্যালরি তাপ পাওয়া যায়, আর তা বছরের পর বছর পাওয়া যেতে পারে। রাসায়নিক ক্রিয়ার মত তাপমাত্রার উপর এই তাপ উৎপাদন নির্ভর করে না। সাধারণ তাপমাত্রা এমন কি তরল হাইড্রোজেনের তাপমাত্রায়ও এই ক্রিয়া চলতে থাকবে।

শক্তির এই নূতন রূপ থেকে পদার্থবিজ্ঞানীরা ভিত্তিভূমি খুঁজে পেলেন আইন-স্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ থেকে। সেখানে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণে দেখিয়েছিলেন $E = MC^2$

E=শক্তি (আর্গ), M=ভর (গ্র্যাম্), C=আলোর গতিবেগ (সেঃমিঃ/সেকেণ্ড)

আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে 3×10^{10} সেণ্টিমিটার হলে $C^2 = 9 \times 10^{20}$ আর্গ। সংখ্যাটি বিপুল হলেও এক আর্গ শক্তির পরিমাণ সামান্যই। শক্তি ও জড় তুল্যমূল্য হলে এক গ্র্যাম্ জড় বলতে 9×10^{20} আর্গ যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। এই ধারণা স্পষ্ট হয় যদি বলি এই পরিমাণ শক্তিতে 1000 ওয়াটের একটি বাল্ব 2850 বছর জ্বালিয়ে রাখা যায় অথবা বলা যায় এক গ্র্যাম্ ভর শক্তিতে পরিণত হলে 2000 টন পেট্রোল পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা পাওয়া সম্ভব হবে।

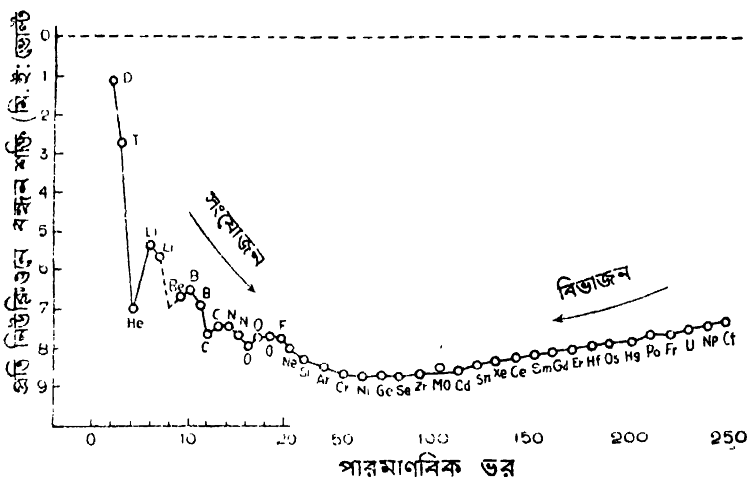
আইনস্টাইনের সমীকরণ ল্যাভোসিয়র-এর ভরের নিত্যতাবাদ নিয়ম নস্যাৎ করল। বস্তুর সৃষ্টি বা বিলোপ হয় না—এই মতবাদ বদলে ভর ও শক্তির নিত্যতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। বস্তুতঃ প্রত্যেক রাসায়নিক ক্রিয়ায়ও কিছুটা ভর শক্তিতে পরিণত হয়। ভরের সেই ক্ষয় এত কম যে তা উনিশ শতকে রসায়নবিদ্‌দের কাছে ধরা পড়ার মত কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু কয়লার দহনের চাইতে তেজস্ক্রিয়ার শক্তি এত বেশী যে, এই শক্তির তুল্যমূল্য ভর পরিমাপ করা আর কঠিন হল না।

অ্যাস্টন ম্যাস্‌স্পেক্ট্রোগ্রাফের সাহায্যে ভর থেকে শক্তির রূপান্তর-এর প্রমাণ পেয়েছিলেন। পরমাণুর নিউক্লিয়াস তার প্রোটন ও নিউট্রনের যুক্ত সংখ্যার যে পূর্ণ গুণিতক নয় তা তিনি মাপতে পেরেছিলেন। এইসব নিউট্রন প্রোটনের ভর

সাধারণতঃ মাপা হয় অক্সিজেন 16 এর ভিত্তিতে। অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন 16 ধরা হয় বটে, কিন্তু তার 17 ও 18 সংখ্যার দুটি আইসোটোপ আছে—অক্সিজেনের ওজন এদের ভর সংখ্যার গড় ওজন। স্বভাবজ অক্সিজেনের 99·759 ভাগই $^{16}_{8}O$, তাই 17 ও 18 সংখ্যার আইসোটোপের আবিষ্কারের পরও রসায়নবিদ্‌রা O-16 এর মানে রাসায়নিক পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করতেন।

পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু অক্সিজেন নয় তার আইসোটোপ 16 সংখ্যাকে মান ধরে পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করেন। ফলে অক্সিজেনের অন্যান্য আইসোটোপ থাকার ফলে তার পারমাণবিক ওজন এই মানে হয় 16·0044। ফলে রাসায়নিক থেকে ভৌতিক পারমাণবিক ওজন সব মৌলিক পদার্থের বেলায় প্রায় শতকরা 0·027 ভাগ বেশী হয়।

এখন কার্বন 12 এর মান দিয়ে রাসায়নবিদ্ ও পদার্থবিদ্ উভয়েই পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করেন। এই মাপে অক্সিজেনের ওজন দাঁড়ায় 15·9994। কার্বনের নিউক্লিয়াসে থাকে ছয়টি প্রোটন ও ছয়টি নিউট্রন; কার্বন 12-এর মানে প্রোটনের



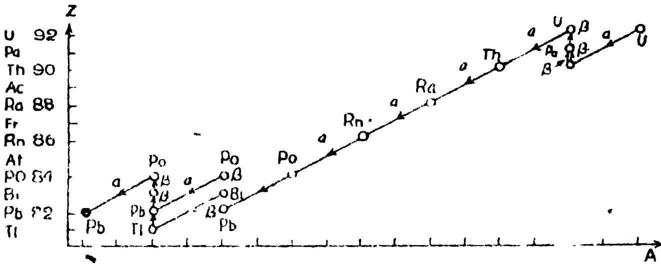
চিত্র 1.19 : প্রতি নিউক্লিওনে বন্ধনশক্তি হাল্কা ও ভারী নিউক্লিয়াসে বেশী। হাল্কা নিউক্লিয়াসগুলিতে সংযোজন (fusion) ও ভারী নিউক্লিয়াসে বিভাজন (fission) ক্রিয়ায় এই শক্তির মুক্তি ঘটে। B,N,Li ইত্যাদির আইসোটোপ ভেদে এই বন্ধনশক্তির পার্থক্য লক্ষণীয়। একই লেখচিত্রে দেখান সুবিধাজনক, তাই 20 পারমাণবিক ভর থেকে ডানদিকের স্কেল পরিবর্তিত দেখান হয়েছে।

ভর 1·007825 ও নিউট্রনের 1·0086651; প্রোটন ও নিউট্রন 12টির ভর দাঁড়ায় 12·104940 কিন্তু কার্বন 12-এর ভর 12 হলে বাকী 0·104940 ভর কোথায় লোপ পায়?

এই লুপ্ত ভরই হল ভরক্ষয় বা mass defect। ভরক্ষয়কে ভর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে প্রতি নিউক্লিয়নে (nucleon=প্রোটন অথবা নিউট্রন) যে ভরক্ষয় পাওয়া যায় তা হল সমাবেশ ভগ্নাংশ বা packing fraction। এই ভরক্ষয়ই হল লুপ্ত ভরের শক্তিতে রূপান্তর—আর এই শক্তিই হল নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি বা binding energy। নিউক্লিয়াস ভাঙতে গেলেও এই শক্তিই প্রয়োজন।

অ্যাস্টন বহু নিউক্লিয়াসের সমাবেশ ভগ্নাংশ মেপে দেখালেন যে এই সংখ্যা হাইড্রোজেন থেকে লোহা পর্যন্ত বাড়ে; লোহা থেকে ভারী নিউক্লিয়াসের দিকে ক্রমশঃ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অর্থাৎ পর্যায় সারণীর মাঝামাঝি নিউক্লিয়াসগুলির বেলায় নিউক্লিয়ন পিছু বন্ধন শক্তি যথেষ্ট বেশী। ফলে সারণীর দূর প্রান্তীয় নিউক্লিয়াসকে বিভাজনের দ্বারা মাঝামাঝি অবস্থানের নিউক্লিয়াসে রূপান্তর করে যথেষ্ট শক্তি উৎপাদন করা যায়।

U-238 এর কথা ধরা যাক্। তেজস্ক্রিয়ার ফলে তা' সীসা-206এ পরিণত হয়। এই ক্রিয়ায় আটটি আল্‌ফা বেরোয়, হাল্কা বীটা-কণাগুলির ভর নগণ্য ধরে নিয়ে, আল্‌ফাগুলির ভর হয় 32·0208। Pb-206 এর ভর 205·9745। এদের মিলিত ভর দাঁড়ায় 237·9953। U-238 এর ভর 238·0506। ফলে ভরের



চিত্র 1.20 : ইউরেনিয়াম 238 অর্ধজীবনকাল $4{\cdot}5 \times 10^{9}$ বৎসর আল্‌ফা (α) ও বীটা (β) নির্গমনে কী ভাবে স্থায়ী সীসায় রূপান্তরিত হয়।

Z—পরমাণু সংখ্যা, A—পারমাণবিক ভর সংখ্যা। Ra—রেডিয়াম, Rn—রেডন গ্যাস। α আলফা কণার শক্তি প্রায় 6 মিঃ ইঃ ভোঃ। পোলোনিয়াম থেকে 214 ভরের সীসা একটি বীটা নির্গমনে Bi বিসমাথ ও বিসমাথ থেকে α বেরোলে Tlএ রূপান্তরিত হয়। বিসমাথ থেকে আবার একটি বীটা বেরিয়ে অতি অস্থায়ী একটি পোলোনিয়াম আইসোটোপ উৎপন্ন হয়।

পার্থক্য হল ·0553। ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়ায় এই শক্তিই মুক্ত হয়। মৃদুগতি নিউট্রন আঘাতে U-235 এর বিভাজনে 56 ভর সংখ্যার বেরিয়াম ও 50 থেকে 57 সংখ্যার কয়েকটি মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এইসব পরমাণুর মিলিত ভর

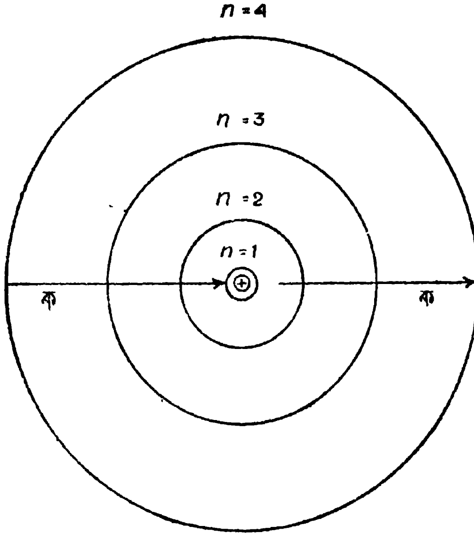
U-235 এর ভর থেকে যতটুকু কম, তা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। নিউক্লীয়,বোমা, রিয়্যাক্টর, বিভাজন পরীক্ষার বিস্ময়কর ফল। দুটনের *TNT* (ট্রাইনাইট্রোটুলিন) যেখানে 3×10^5 কিলোক্যালরি শক্তিতে 200 গজ ব্যবধানের মধ্যে বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে, দুটনের একটি ইউরেনিয়াম বোমা 10^7 গুণ বেশী শক্তিতে 20 মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে ধ্বংস ঘটাতে পারে। এই শক্তি কাজে লাগিয়ে রিয়্যাক্টরে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা যায়। 1000 টন কয়লা পুড়িয়ে আমরা যে বিদ্যুৎ পাই, এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম সে শক্তি দিতে পারে।

সমাবেশ ভগ্নাংশ চিত্রের অন্য প্রান্তে দুটি হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রের সংযোজনে ভরক্ষয় ঘটে ও শক্তির সৃষ্টি হয়। সূর্যে এই প্রক্রিয়া অফুরন্ত শক্তির যোগান দেয়। হাইড্রোজেন বোমা এই শক্তির উৎস। সংযোজন রিয়্যাক্টর-এর সাহায্যে এই শক্তি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা চলেছে—হয়ত ভবিষ্যতে তা সফল হ'বে।

কোনও কণার ভর স্থির অবস্থায় কী শক্তির সমতুল হবে তা আইনস্টাইনের সূত্র থেকে বলা যায়। ইলেক্ট্রনের এই শক্তি প্রায় 0·5 Mev। তার বিপরীত কণা পজিট্রন ইলেক্ট্রনের সঙ্গে মিলিত হলে 1 Mev গামা রশ্মি উৎপন্ন করে। প্রোটন ও তার বিপরীত কণা অ্যাণ্টিপ্রোটন মিলে প্রায় 1000 Mev গামারশ্মি সৃষ্টি করে। আবার উপযুক্ত শক্তির গামারশ্মি ও এরকম কণা বিপরীত কণার জুড়ি গঠন করতে পারে।

পদার্থ ও শক্তির এই পরস্পর রূপান্তর বিশ্বজগতকে যেন একটি অখণ্ড ও অদ্বয় সত্তায় মহিমান্বিত করেছে। ছোট থেকে ও ছোট কোন মৌলকণায় যদি এই সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়, তারই খোঁজে কোটি কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট শক্তির কণা সৃষ্টি করে তার সাহায্যে বহু মৌলিক কণার আবিষ্কার করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা—তার ফলে গড়ে উঠেছে উচ্চশক্তি পদার্থবিজ্ঞান। আবার অন্যদিকে পদার্থকে খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞান অনুসন্ধান করছে বিচিত্র বিশ্বরূপ। পদার্থ ও তার বিকিরণের মূলে যে চারটি বল—তাদের একই সূত্রে নিয়ে আসার চেষ্টা চলেছে। এই বলগুলি হল মহাকর্ষ বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, নিউক্লীয় জগতের তীব্র বল, তেজস্ক্রিয়ায় বীটা নির্গমনের মত ক্ষীণ বিক্রিয়াজনিত বল। অসংখ্য অণুপরমাণু, গ্রহনক্ষত্র এই স্বভাবজ বলের সাহায্যে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে—তার মূল অনুসন্ধান করাই আধুনিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

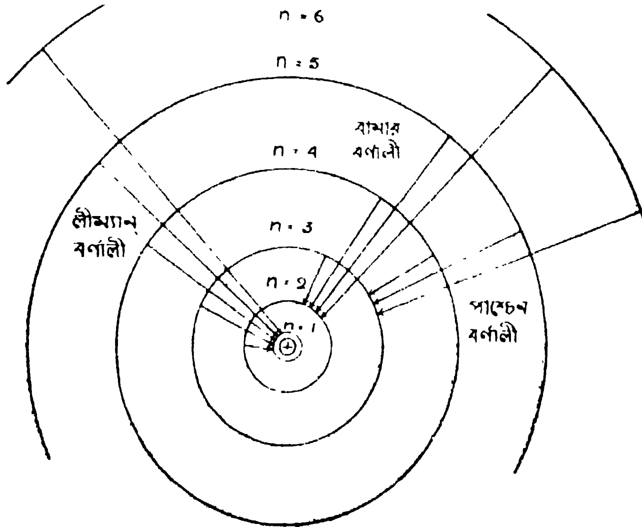
পরমাণুর, ইলেকট্রনের আধান আছে। ঐ আধানের স্পন্দনে পরিপার্শ্বের বিদ্যুৎক্ষেত্রের বলরেখার পরিবর্তনে পরমাণু থেকে শক্তির বিকিরণ তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে। পরমাণুর কক্ষে ইলেকট্রন যখন সর্বদাই গতিশীল, এই গতির ফলে শক্তি বিকিরণ করে তার কক্ষপথ ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে না কেন এবং নিউক্লিয়াসের উপর এসে পড়ে না কেন ? তা হয় না বলেই ইলেকট্রনের কক্ষপথ ও নিউক্লিয়াসের ব্যবধানের আয়তনটুকু নিয়ে পরমাণু টিকে থাকতে পারে। এই ব্যবধান না থাকলে



চিত্র 1.21 : পরমাণুতে শক্তির শোষণ ও বিকিরণ। $n = 1$ কক্ষে নিম্নতম শক্তিস্তর থেকে শক্তির শোষণে উত্তেজিত অবস্থায় $n = 4$ কক্ষে এবং বিকিরণে $n = 4$ থেকে $n = 1$ কক্ষে ইলেকট্রনের প্রত্যাবর্তনে পরমাণু নিম্নতম অর্থাৎ ভূমিস্তরে (ground state) ফিরে আসে।

ইলেকট্রন সব সময়ই শক্তি বিকিরণ করে নিউক্লিয়াসে অচিরেই প্রশমিত হয়ে যেত। বোর দেখালেন যে, পরমাণুজগতে পুরানো নিয়ম অচল। পরমাণু একটি নির্ধারিত শক্তিমাত্রা নিয়ে থাকতে পারে। তখন তার কক্ষের ইলেকট্রন গতি থাকলেও বিকিরণ করে না। বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্বের এ হল প্রথম সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল পরমাণু তার একটি নির্দিষ্ট

অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হলে তবেই শক্তির শোষণ বা বিকিরণ হয়। এই শক্তির কাঁপনসংখ্যাও নির্ধারিত। এই সংখ্যা ও প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা *h* এর গুণফল থেকে পরমাণুর দুই অবস্থার শক্তির মানের ব্যবধান পাওয়া যায়। পরমাণু-বাদের পটভূমিতে বিকিরণের বর্ণালী থেকে আমরা পরমাণুর শক্তিস্তরগুলির সন্ধান পাই। সাধারণতঃ বাইরের তাপ বা কোন শক্তি অণুপরমাণুতে শোষিত হলে তার ইলেকট্রনগুলি ভূমিস্তর থেকে ওপরের স্তরে উঠে। সেই স্তরে ইলেকট্রনের অবস্থান স্থায়ী নয়—তা নীচের স্তরে ফিরে এলে দুই স্তরের পার্থক্যজনিত শক্তির বিকিরণ হয় ও বর্ণালী পাওয়া যায়। কঠিন পদার্থের ইলেকট্রনবিন্যাস কিছুটা জটিল বলে—তার বর্ণালী হয় অবিরাম। অবিরাম বর্ণালীতে শক্তি বিশ্লিষ্ট হলেও তাদের সীমারেখায় কোন ফাঁক থাকে না। কিন্তু বায়ব পদার্থে বিকিরণের শক্তিসূচক কাঁপনসংখ্যার বর্ণালী রেখাকারে পাওয়া যায়। এই রেখার স্বাভাবিক বেধটুকু অনিশ্চয়তাবাদ-জনিত—তা ছাড়াও বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের ভুলত্রুটি থেকে এই বেধ কিছুটা বাড়াও অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও রেখাগুলির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে। প্রত্যেকটি রেখা থেকে



চিত্র 1.22 : হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী শ্রেণী।

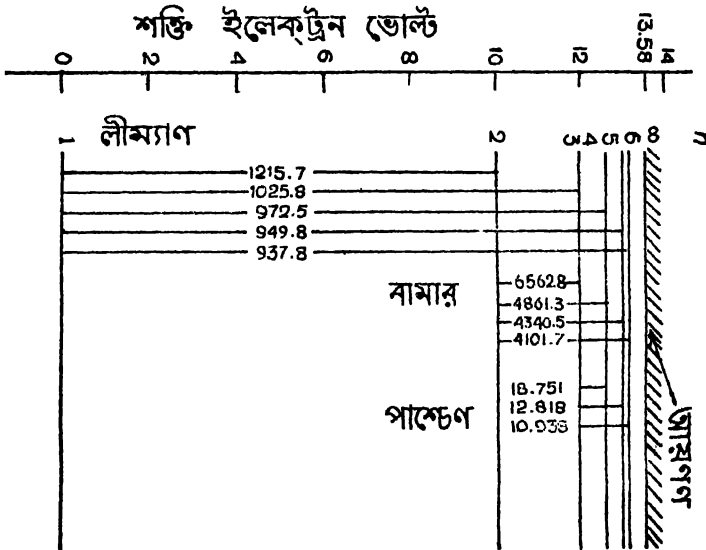
একটি শক্তির মান পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের এরকম বর্ণালী থেকে বামার তাদের কাঁপনসংখ্যার মান নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন। সূত্রটি হল—

$$\text{কাঁপন সংখ্যা} = \frac{3{\cdot}3 \times 10^{15}}{2^2} - \frac{3{\cdot}3 \times 10^{15}}{n^2}$$

এই সূত্রে n হল 3, 4, 5 ইত্যাদি প্রধান কক্ষসংখ্যা যা কোয়ান্টাম সংখ্যা নামে অভিহিত হয়। কাঁপন সংখ্যা হার্জ এককে অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে একটি কম্পন। এই কাঁপন সংখ্যাকে আলোর গতিবেগ দিয়ে ভাগ করলে রেখাজনিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। রিড্‌বার্গ অন্য পদার্থের বর্ণালীতে অনুরূপ সূত্র আবিষ্কার করেন। 3.3×10^{15} সংখ্যাটিকে রিডবার্গ নিত্যসংখ্যা বলা হয়। উপরের সূত্র থেকে একটি রেখার কাঁপন সংখ্যা নিয়ে তার সঙ্গে h গুণ করলে ঐ রেখার শক্তির মান পাওয়া যায়

$$\frac{3 \cdot 3 \times 10^{15}}{n^2} \times 4 \cdot 11 \times 10^{-15} = \frac{13 \cdot 58}{n^2}$$ ইলেকট্রন ভোল্ট।

$n=1$ ধরলে হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম স্তরে অর্থাৎ কক্ষে ইলেকট্রন্ যে শক্তিতে বাঁধা থাকে তা' 13·58 ইলেকট্রন্ ভোল্ট। এই কক্ষ থেকে তাকে অপসারিত করতে হলে ঐ পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে। ইলেকট্রন এইভাবে অপসারিত হলে তা পজিটিভ আয়নে পরিণত হ'বে—হাইড্রোজেনের বেলায় অবশ্য তা একটি প্রোটন। এই শক্তি মাত্রাকে আয়নন শক্তি বলে। বলবিদ্যার নিয়মে 13·58 ইঃ ভোঃ শক্তির কক্ষের ব্যাস হবে' 10^{-8} সেণ্টিমিটার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কক্ষ থেকে আয়নন শক্তি



চিত্র 1.23 : হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী রেখার শক্তির পরিমাণ; $n = \infty$ চিহ্নে পরমাণুর আয়নন অবস্থা বুঝায়। 13·58 ইঃ ভোঃ হাইড্রোজেন পরমাণুর আয়নন শক্তি)।

ক্রমশঃ কম—তাই তাদের ব্যাস যথাক্রমে $2^2 \times 10^{-8}$ ও $3^2 \times 10^{-8}$ সেঃমিঃ। বামার হাইড্রোজেনের $n=2$ থেকে পরবর্তী কক্ষগুলির বর্ণালীর পরিচয় দিয়েছিলেন।

লীমান্ প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোজেনের $n=2, 3, 4$ কক্ষগুলি থেকে $n=1$ কক্ষে বিকিরণে যে অদৃশ্য অতি-বেগুনি রশ্মির বর্ণালী পাওয়া যায় তাও একই নিয়ম মেনে চলে। প্যাসচেন্ও একই নিয়মে $n=4, 5, 6$ ইত্যাদি কক্ষ থেকে $n=3$ কক্ষে ইলেক্ট্রনের গতিবিধিতে হাইড্রোজেন যে লাল উজানী বর্ণালীরেখা পাওয়া যায় তা' আবিষ্কার করেন। ব্র্যাকেট্ প্রভৃতি বিজ্ঞানী $n=4$ ও পরবর্তী কক্ষগুলির মধ্যে হাইড্রোজেনের বর্ণালী আবিষ্কার করেছেন।

হিলিয়াম আয়নের বর্ণালী

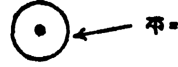
হাইড্রোজেন ছাড়া অন্যসব পরমাণুতে একের বেশীই ইলেক্ট্রন আছে। হিলিয়াম পরমাণুর একটি ইলেক্ট্রন অপসারিত হলে, যে হিলিয়াম আয়ন হয়, তার নিউ-ক্লিয়াসের আধান হাইড্রোজেনের দুগুণ। অবশ্য তখন হাইড্রোজেনের মতই তার বাইরের কক্ষে একটি ইলেক্ট্রন থাকে। দ্বিগুণ আধানের জন্য হিলিয়াম আয়নে রিডবার্গ নিত্যসংখ্যা চারগুণ বেড়ে যাবে। হিলিয়াম আয়নের $n=1$ কক্ষে অর্থাৎ ভূমিস্তরে ইলেক্ট্রনের শক্তি হবে $4 \times 13{\cdot}58$ ইঃ ভোঃ। ওপরের কক্ষগুলিতে যথাক্রমে শক্তি হবে

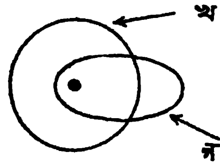
$$\frac{4\times 13{\cdot}58}{2^2} = 13{\cdot}58 \text{ ইঃ ভোঃ}, \quad \frac{4\times 13{\cdot}58}{3^2}, \quad \frac{4\times 13{\cdot}58}{4^2} \text{ ইত্যাদি।}$$

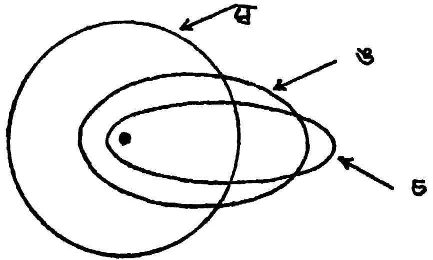
এই সংখ্যাগুলি থেকে দেখা যাবে যে, হিলিয়াম আয়ন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীর কয়েকটি রেখা একই রকম শক্তির। তাহলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণের বর্ণালী থেকে কয়েকটি রেখার বেলায় অন্ততঃ তাদের আলাদা করে চেনা যাবে না। কিন্তু পরীক্ষায় এরকম মিলে যায় না। তার কারণ নিউক্লিয়াসেরও গতি আছে। নিউক্লিয়াস যত ভারী হয় এই গতি তত কমে। হিলিয়াম নিউ-ক্লিয়াসের গতি হাইড্রোজেন থেকে কম। ফলে রিড্বার্গের নিত্যসংখ্যা 4 গুণের পরিবর্তে 4·016 গুণ বেশী হয় হিলিয়ামের বেলায়। এই সামান্য পার্থক্যেও দুয়ের বর্ণালীরেখায় পার্থক্য এসে পড়ে। আরো ভারী পরমাণুতে নিয়মকানুনের রকমফের আছে—এইসব নিয়ম এত নিখুঁতভাবে জানা গেছে যে বিকিরণের বর্ণালী পদার্থ চিনবার সঠিক উপায়। যেমন বুড়ো আঙুলের টিপ থেকে মানুষ চেনা যায়, বর্ণালী দেখে তা কোন্ মৌলিক পদার্থের পরমাণু থেকে আসছে তা বলে দেওয়া যায়। সূর্যের বর্ণালী থেকেই তার উপাদান জানা গেছে। বিভিন্ন পরমাণুর ভূমিস্তরের শক্তিমান্ অর্থাৎ তার আয়নন শক্তি পারমাণবিক সংখ্যার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

বর্ণালী ও শক্তির স্তর

শক্তিস্তরের এক একটি কক্ষ $n=1, 2, 3$ ইত্যাদি সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়, বোর এই সংখ্যাগুলিকে বলেন পরমাণুর কোয়াণ্টাম সংখ্যা ও কক্ষগুলি হল কোয়াণ্টাম কক্ষ। বোরের বৃত্তাকার কোয়াণ্টাম কক্ষের সঙ্গে উপবৃত্তাকার কক্ষের ধারণা দেন সোমারফিল্ড্। এই ধারণায় বোরের $n=1$ সংখ্যায় (1.24 চিত্র) প্রথম বৃত্তাকার কক্ষ (ক) অপরিবর্তিত থাকল, দ্বিতীয় কক্ষ একটি বৃত্তাকার কক্ষের (খ) সঙ্গে একটি উপবৃত্তাকার (গ) কক্ষ যুক্ত হল। $n=3$-তে বৃত্তাকারের (ঘ) সঙ্গে দুটি উপবৃত্তাকার (ঙ) ও (চ) কক্ষ যোগ হল। অবশ্য এই উপবৃত্তগুলির জ্যামিতি সমান নয়। $n=2$ এর দুটি কক্ষেই ইলেক্ট্রনের শক্তি প্রায় সমান, $n=3$-এর বেলায়ও তাই। ভারী পরমাণুতে একাধিক ইলেক্ট্রনের জটিল গতিবিধি সোমার-ফিল্ড্-এর এই মতবাদ দিয়ে সহজে ব্যাখ্যা করা গেল। যেমন, সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের বর্ণালী হাইড্রোজেনের মত হলেও তার প্রত্যেকটি রেখা কয়েকটি সূক্ষ্মতর রেখায় বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। সোমারফিল্ডের মতে অন্য ইলেক্ট্রন্‌গুলির প্রভাবে উপবৃত্তাকার কক্ষের শক্তি বৃত্তাকার থেকে কিছুটা ভিন্ন হয়—আর এই সব উপবৃত্তাকার কক্ষের ইলেক্ট্রনের গতিবিধি থেকে যে বিকিরণ ঘটে তার কাঁপন সংখ্যার পার্থক্যও সূক্ষ্মতর বর্ণালী রেখাগুলিতে ধরা পড়ে।







চিত্র 1.24 : পরমাণুতে ইলেক্ট্রনের বৃত্ত ও উপবৃত্তাকার পথ
$n=1$ কক্ষে ক বৃত্তাকার কক্ষ অপরিবর্তিত থাকে
$n=2$তে একটি বৃত্তাকার কক্ষ (খ)এর সঙ্গে একটি উপবৃত্তপথ (গ) কক্ষ যুক্ত হয়।
$n=3$তে বৃত্তাকার (ঘ) ও সঙ্গে দুটি উপবৃত্তাকার ঙ ও চ কক্ষ।

পরমাণু যত ভারী হয়, তাতে ইলেক্ট্রনসংখ্যাও বাড়ে। এখন এইসব ইলেক্ট্রন্ যদি বোর ব্যাসার্ধের একটি কক্ষে ভিড় করে, তাহলে তো এই কক্ষটি ক্রমশঃ ছোট হতে থাকবে। কারণ বাইরে ইলেক্ট্রন বাড়লে নিউক্লিয়াসের বৈদ্যুতিক

আকর্ষণও ঐ অনুপাতে বাড়বে। এরকম ঘটলে, সীসার পরমাণু অ্যালুমিনিয়াম থেকেও ছোট হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পরীক্ষার ফল অন্যরকম। পরমাণুর আয়তনের পর্যায়ক্রমিক সামান্য পরিবর্তন দেখা গেলেও, মৌলিক পদার্থগুলির পারমাণবিক আয়তন পর্যায় সারণী জুড়ে প্রায় একই রকম থাকে। এই সমস্যার সমাধানে পউলি বর্জন নিয়মের আবিষ্কার করলেন। ইলেকট্রনগুলি বৃত্ত বা উপবৃত্তাকার কক্ষে চলে কিন্তু তাদের নিজের অক্ষের চারদিকে লাট্টুর মত চক্রাকারে ঘোরে। এই চক্রনকে স্পিন বলে। পউলির নীতিতে কোন কক্ষে দুটি ইলেক্ট্রন এই শর্তে থাকতে পারে যে তাদের স্পিন বিপরীতমুখী হতে হ'বে।

এখন আমরা পরমাণুতে ইলেক্ট্রনের গতিবিধির যে চিত্র পাই, তাতে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেনের পর হিলিয়ামে $+\frac{1}{2}$ ও $-\frac{1}{2}$ স্পিনের দুটি ইলেক্ট্রন $n=1$ কক্ষে থাকতে পারে। পরবর্তী মৌলিক পদার্থ লিথিয়ামে তিনটি ইলেক্ট্রন; প্রথম বোর কক্ষ পূর্ণ থাকায় তৃতীয় ইলেক্ট্রনটিকে হয় দ্বিতীয় বোর বৃত্তীয় কক্ষে অথবা উপবৃত্ত কক্ষে থাকতে হয়। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ঐ কক্ষের উপবৃত্ত পথ তিনটি উপায়ে দিক্‌বিন্যাস করে থাকতে পারে। লিথিয়ামের তৃতীয় ইলেক্ট্রন এরকম একটি উপবৃত্তে বাঁধা পড়ে। এভাবে তিনটি উপবৃত্ত ও একটি বৃত্তে মোট ৪টি ইলেক্ট্রনে $n=2$ কক্ষপূর্ণ হয় নিওন পরমাণুতে। $n=3$-এর বৃত্তাকার কক্ষে একটি ইলেক্ট্রন দিয়ে আরম্ভ হয় সোডিয়াম। পূর্ণ কক্ষের পর যেমন নূতন কক্ষ দিয়ে লিথিয়ামের মত সোডিয়ামের ও ইলেক্ট্রন বাঁধা পড়ে, তাদের বর্ণালী ও রাসায়নিক ধর্মও প্রায় এক। ঐ কক্ষে পরবর্তী পরমাণু ম্যাগ্‌নেসিয়াম অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী কক্ষের বেরিলিয়ামের সমগোত্রীয়। এভাবে ভারী পরমাণুগুলির প্রতিরূপ তৈরি করা হয়।

পর্যায় সারণী

বোর-সোমারফিল্ডের ধারণা ও পউলির নীতি মিলে পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রনবিন্যাস ও তাদের ধর্মের পর্যায়ক্রমিক সামঞ্জস্য বেশ ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। 1869 খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেলীফ্ এইসব আবিষ্কারের অনেক আগেই মৌলিক পদার্থের পর্যায়সারণী প্রণয়ন করেছিলেন। পদার্থের নিয়মিত পর্যায়ক্রম সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এমনকি এই সারণীতে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হ'বে এই ধারণায় জায়গা খালি রেখেছিলেন—তাদের ধর্ম সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পদার্থের নাম ছাড়াই পর্যায় সারণীর বর্তমান রূপ দেখান হল। (1.27 চিত্রে পর্যায় সারণীর সঙ্গে তুলনীয়।)

পর্যায় সারণী

পর্যায়	I	II	III	IV	V	VI	VII
	1	3	11	19	37	55	87
		4	12	20	38	56	88
				21	39	57	89
						58	90
						59	91
						60	92
						61	93
						62	94
						63	95
						64	96
						65	97
						66	98
						67	99
						68	100
						69	101
						70	102
						71	103
				22	40	72	104
				23	41	73	105
				24	42	74	
				25	43	75	
				26	44	76	
				27	45	77	
				28	46	78	
				29	47	79	
				30	48	80	
		5	13	31	49	81	
		6	14	32	50	82	
		7	15	33	51	83	
		8	16	34	52	84	
		9	17	35	53	85	
	2	10	18	36	54	86	

পর্যায় VII-এর পর VIII, IX এরকম কাল্পনিক পর্যায় দিয়ে সারণী বাড়ান

যায়। তখন VIII ও IX-এ 50টি করে X ও XI-এ 72টি করে মৌলিক পদার্থ থাকতে পারে। তার চেয়ে বরং স্বাভাবিক ও কৃত্রিম মিলে এখন যে 105টি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে, তাই দিয়ে সারণীটি সীমাবদ্ধ রাখা যাক্। সারণীর বিশেষত্ব এই যে, এক লাইনের পদার্থগুলির ধর্ম প্রায় এক—তাদের ইলেকট্রন বিন্যাসেও কিছু সামঞ্জস্য আছে। যেমন, 2, 10, 18, 36, 54, 86 এর সবগুলিই বিরলবায়ু, এদের বেলায় ইলেকট্রন্ সবকক্ষেই পূর্ণ থাকে। প্রায় সব মৌলিক পদার্থ এই সারণীতে ঠিক ঠিক জায়গা করে নিয়েছে। সপ্তম পর্যায়ের 87, 88 ও 89 সংখ্যার পরমাণুর ধর্ম VI-এর 55, 56 ও 57-এর অনুরূপ। 90, 91 ও 92 পরমাণুর সমস্যা হল 1940 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদের ধর্ম বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তাই ধারণা ছিল যে VI-এর 57-71 বিরল মৃত্তিকা (rare earth) পদার্থগুলির নানারকম বিশেষত্ব আছে আর 87-89 পরমাণু বুঝি এদের সঙ্গে খাপ খাবে না। পরে দেখা গেল ল্যান্থানাইড্ শ্রেণীর মত এই অ্যাক্টিনাইডও বিরল মৃত্তিকা শ্রেণীর পদার্থ।

নীচের সারণীতে VI ও VII পর্যায়ের মৌলিক পদার্থগুলির নাম ও পারমাণবিক সংখ্যাসহ দেওয়া হল।

পর্যায়	VI		VII	
	55	সিজিয়াম (Cs)	87	ফ্রান্সিয়াম (Fr)
	56	বেরিয়াম (Ba)	88	রেডিয়াম (Ra)
	57	ল্যান্থানাম (La)	89	অ্যাক্টিনিয়াম্ (Ac)
	58	সিরিয়াম (Ce)	90	থোরিয়াম (Th)
	59	প্রেসিওডিমিয়াম (Pr)	91	প্রোটাক্টানিয়াম (Pa)
	60	নিওডিমিয়াম্ (Nd)	92	ইউরেনিয়াম (U)
	61	প্রোমিথিয়াম (Pm)	93	নেপচুণীয়াম (Np)
	62	সামারিয়াম (Sm)	94	প্লুটোনীয়াম (Pu)
	63	ইওরোপীয়াম্ (Eu)	95	এমেরিসিয়াম (Am)
	64	গ্যাডোলিনিয়াম্ (Gd)	96	কিউরিয়াম (Cm)
	65	টারবিয়াম (Tb)	97	বার্কেলিয়াম (Bk)
	66	ডিস্‌প্রোসিয়াম (Dy)	98	ক্যালিফোর্নিয়াম (Cf)
	67	হোলমিয়াম (Ho)	99	আইন্‌স্টাইনিয়াম্ (Es)
	68	এরবিয়াম (Er)	100	ফের্মিয়াম (Fm)
	69	থুলিয়াম (Tm)	101	মেণ্ডেলীভিয়াম্ (Md)
	70	ইটেরবিয়াম (Yb)	102	নোবেলিয়াম (No)

পর্যায়	VI		VII	
	71	লুটেসিয়াম (Lu)	103	লরেন্সিয়াম (Lr)
	72	হাফনিয়াম (Hf)	104	রাদারফোর্ডিয়াম (Rf)
	•73	ট্যান্টালাম (Ta)	105	হ্যানিয়াম্ (Hn)
	74	টাংস্টেন (W)	106	
	75	রিনিয়াম (Re)	107	
	76	ওসমিয়াম (Os)	108	
	77	ইরিডিয়াম (Ir)	109	
	78	প্ল্যাটিনাম (Pt)	110	
	79	গোল্ড (Au)	111	
	80	মার্কারী (Hg)	112	
	81	থালিয়াম (Tl)	113	
	82	লেড্ (Pb)	114	
	83	বিসমাথ (Bi)	115	
	84	পোলোনিয়াম (Po)	116	
	85	অ্যাস্টাটাইন (At)	117	
	86	রেডন (Rn)	118	

ওপরের সারণীর 83 সংখ্যার বেশী সব পরমাণুই তেজস্ক্রিয়। পরমাণু সংখ্যা যত বাড়ে সাধারণতঃ তেজস্ক্রিয়াও তত তীব্র হয়। অর্থাৎ তাদের গড় আয়ু কম হয় ও পদার্থটির স্থায়িত্ব হ্রাস পায়। এই নিয়ম সব পরমাণু যে মেনে চলে তা নয়। যেমন 90 সংখ্যার থোরিয়াম্-এর গড় আয়ু ইউরেনিয়াম-92 থেকে বেশী ও তার স্থায়িত্ব বেশী। কিন্তু 98 কৃত্রিম ক্যালিফোর্নিয়ামের গড় আয়ু পোলোনিয়ম-84 থেকে বেশী। আসলে নিউক্লিয়াসের নিউট্রন-প্রোটনের বিন্যাস থেকেই তার স্থায়িত্ব কতটা হ'বে তা নির্ধারিত হয়। এরকম বিন্যাস থেকে পারমাণবিক পর্যায়সারণীর মত নিউক্লীয় পর্যায়সারণীও ধারণা করা যায়। কিন্তু সেই সারণী বেশ জটিল হ'বে। এই জটিলতার মধ্যে না গিয়েও ধারণা করা হয় যে, সপ্তম পর্যায়ে এমন অনাবিষ্কৃত পরমাণু থাকতে পারে যা যথেষ্ট স্থায়ী হওয়াই সম্ভব।

এরকম দুটি পরমাণু 112 ও 114 যদি আবিষ্কৃত হয় তবে মনে হয় তারা বেশ স্থায়ী হবে। উপরের সারণী থেকে এদের অবস্থান কিছু কিছু রাসায়নিক ধর্মের আভাস দেয়। 30 জিঙ্ক, 48 ক্যাডমিয়াম, 80 মার্কারীর ঠিক পরে 112

অজানা পদার্থটিকে বলা যাক একমার্কারী (Ekmercury) এবং ঐ দলের পদার্থগুলির গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করা যায়

পর্যায়	পারমাণবিক সংখ্যা	গলনাঙ্ক (পরম তাপমাত্রা °A)	স্ফুটনাঙ্ক (পরম তাপমাত্রা °A)
IV	30 জিঙ্ক (Zn)	692·5	1180
V	48 ক্যাডমিয়াম (Cd)	594·0	1038
VI	80 মার্কারী (Hg)	234·2	629·7
VII	112 একমার্কারী	?	?

পর্যায় বাড়ার সঙ্গে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক দেখা যাচ্ছে কমে যায়। কিন্তু এই কমে যাওয়া নিয়মিত নয়। 30 থেকে 48 এর গলনাঙ্ক 98·5Å কম কিন্তু 48 থেকে 80,359·8Å কম। গলনাঙ্কের হ্রাস যদি নিয়মিত হত, তবে 112 পদার্থের গলনাঙ্ক শূন্যের নীচে নেমে যাওয়া বিচিত্র হত না। তা সম্ভব হতে পারে না। রসায়নবিজ্ঞানে দেখা যায় যে সমধর্মী পদার্থের প্রথম ও দ্বিতীয়ের ধর্মে পরিবর্তন মৃদু হলে, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়ে হয় বেশী আবার তৃতীয় থেকে চতুর্থে মৃদু আবার বেশী এইরকম পর্যায়ে। তা যদি হয় তবে মার্কারীর গলনাঙ্ক জিঙ্কের 0·338 অংশ ধরে একমার্কারী গলনাঙ্ক ক্যাডমিয়ামের গলনাঙ্কের 0·338 ধরা যেতে পারে। তখন তার গলনাঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় 200°A এবং একই পদ্ধতিতে স্ফুটনাঙ্ক হয় প্রায় 550°A।

কার্বন গ্রুপের লেড বা সীসার পরবর্তী পদার্থ হল অজানা। 114 সংখ্যার পদার্থ। কার্বন-জার্মেনিয়াম, সিলিকন-টিন, জার্মেনিয়াম-লেড এই জোড়াগুলির স্ফুটনাঙ্ক ও গলনাঙ্কের গড় অনুপাত থেকে 114 একলেড্-এর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক হবে যথাক্রমে 200°A ও 2400°A।

118 সংখ্যক একরেডন পদার্থের ও একইভাবে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক দাঁড়ায় যথাক্রমে 250°A ও 265°A।

কার্বন গ্রুপ

পর্যায়	পরমাণু সংখ্যা	গলনাঙ্ক °A	স্ফুটনাঙ্ক °A
II	6 কার্বন (C)	3800	5100
III	14 সিলিকন (Si)	1683	2628
IV	32 জারমেনিয়াম (Ge)	1210	3103
V	50 টিন (Sn)	505	2543
VI	82 লেড (Pb)	600	2017
VII	114 একলেড	200 ?	2400 ?

বিরল বায়ু

I	2 হিলিয়াম (He)	0	4·5
II	10 নিওন (Ne)	24·5	27·2
III	18 আর্গন (Ar)	83·9	84·4
IV	36 ক্রিপ্‌টন (Kr)	116·9	120·8
V	54 জেনন (Xe)	161·2	166·0
VI	86 রেডন (Rn)	202	211·3
VII	118 একরেডন	250 ?	265 ?

এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করা যায় যে, সাধারণ তাপমাত্রায় একরেডন অন্য বিরলবায়ুর মত বায়বই হবে। কিন্তু তাকে তরল বা কঠিন পদার্থে পরিণত করা অন্য বিরলবায়ু থেকে সহজই হবে। একলেড ও একমার্কারী হবে সম্ভবত তরল পদার্থ। একমার্কারী নিশ্চয়ই তেজস্ক্রিয় হবে এবং মার্কারীর চেয়ে হবে আরও নিষ্ক্রিয় পদার্থ। একলেড্‌ ও লেড্‌ এর চেয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াই সম্ভব।

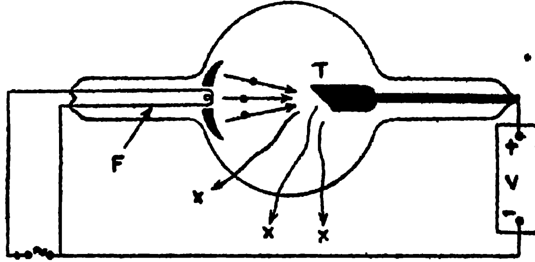
যে সব মৌলিক পদার্থ নিয়ে এইসব ভবিষ্যদ্বাণী তা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে পর্যায় সারণীর সাহায্যে রাসায়নিক ধর্ম যে কত নিখুঁতভাবে বলা যায় তা মেণ্ডেলিফ্‌-এর সময় কয়েকটি পদার্থ অনাবিষ্কৃত থাকলেও, পরে তাদের আবিষ্কার হওয়ায় পর্যায় সারণী অনুযায়ী রাসায়নিক ধর্মও সঠিক মিলে গেছে।

অবশ্য 112, 114 বা 118 প্রোটন দিয়ে কোন নিউক্লিয়াস গড়ে উঠতে পারে কিনা, তা নিউক্লীয় গঠনবিন্যাসের উপর নির্ভর করবে। পর্যায় সারণীর বর্তমান মৌলিক পদার্থগুলির মত শুধু পারমাণবিক সংখ্যা দিয়েই তাদের রাসায়নিক ধর্ম জানা গেলেও, অস্তিত্ব ধরা যাবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

রঞ্জেন বিকিরণের বর্ণালী

পরমাণুর বাইরের কক্ষের ওঠানামায় যে ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করে তাতে আলো বা অনুরূপ বিকিরণ পাওয়া যায়। ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি কক্ষের ইলেকট্রনের বন্ধনশক্তি রঞ্জেনরশ্মির পর্যায়ে পড়ে। এইসব ইলেকট্রনের ওঠানামায় রঞ্জেনরশ্মির বিকিরণ হয়। 1.25 চিত্রে দেখা যাবে যে একটি কাচের বায়ুহীন নলে ফিলামেণ্টের সাহায্যে ইলেকট্রন উৎপাদন করে অ্যানোডের দিকে +V বিদ্যুৎবিভবে চালিত করলে ঐ অ্যানোডের পরমাণু থেকে ভিতরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলি কক্ষচ্যুত হয়; পরমাণুর অন্য ইলেকট্রন এইসব কক্ষ দখল করলে সেই ইলেকট্রনগুলির আগেকার কক্ষের শক্তিস্তরের সঙ্গে পার্থক্য রঞ্জেন বিকিরণের রেখাবর্ণালী সৃষ্টি করে। ফিলামেণ্টের অন্যান্য বাকী ইলেকট্রনগুলি অ্যানোডে

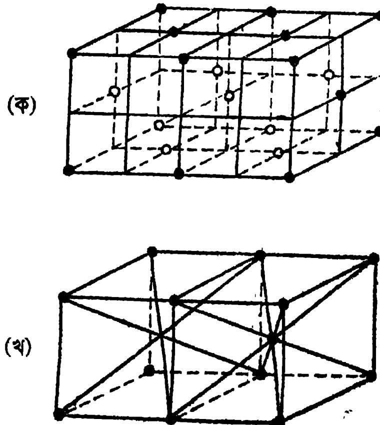
প্রতিহত হয়ে ক্রমশঃ গতিবেগ হারাতে থাকে। এদের এই হ্রাসপ্রাপ্ত গতিবেগ অবিরাম রঞ্জেন বর্ণালী উৎপাদন করে। অবিরাম রঞ্জেন বর্ণালীর পটভূমিতে যে রেখা



চিত্র 1.25 : রঞ্জেনরশ্মি উৎপাদক নল। *F*—ফিলামেণ্ট পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহে উত্তপ্ত হয়ে ইলেক্‌ট্রন উৎপাদন করে। তীর চিহ্ন দিকে ইলেক্‌ট্রন চালিত হ'য়ে *T* তে পড়ে। *T*—লক্ষ্য বস্তু, প্লেট। *V*—ইলেক্‌ট্রন ত্বরণকারী বিদ্যুৎবিভব। *X*→রঞ্জেনরশ্মি।

বর্ণালী দেখা যায়, তা অ্যানোডের ভারী পরমাণুর নির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ কক্ষগুলির ইলেক্‌ট্রনের অপসারণে সেই কক্ষীয় শক্তির সমতুল বিকিরণ।

রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে ক্রুস্ট্যালের গঠনবিন্যাস নির্ণয় করা যায়। ক্রুস্ট্যালের পরমাণুগুলি সারিবদ্ধ হয়ে সাজান থাকে। তাদের ল্যাটিসের অন্তর্বর্তী ফাঁক রঞ্জেন রশ্মির অববর্তনে ঝিল্লী বা গ্রেটিং-এর কাজ করে। অববর্তিত বর্ণালী থেকে ক্রুস্ট্যালের গঠনও ধরা পড়ে। 1.26 চিত্রে রূপা, সোনা ইত্যাদি পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনক ক্রুস্ট্যালের



চিত্র 1.26 : (ক) পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ও (খ) দেহকেন্দ্রিক কৃষ্ট্যালের গঠনবিন্যাস ; বিন্দু চিহ্নগুলি পরমাণুর অবস্থান সূচনা করে।

(ক) ও টাংস্টেন জাতীয় দেহকেন্দ্রিক ঘনক (খ) ক্রুস্ট্যালের গঠন দেখানো হয়েছে। এছাড়াও বহু জটিল গঠনের ক্রুস্ট্যালের বিভিন্ন ধর্ম রঞ্জেনরশ্মির পরীক্ষায় ধরা পড়ে।

অতিভারী মৌলিক পদার্থ

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় অতিভারী মৌলিক পদার্থ (superheavy elements) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। 1869 খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেলীফ্ যে পর্যায় সারণী তৈয়ার করেন, একশো বছরের বেশী সময়েও তার গুরুত্ব কমেনি। এই সারণী থেকে মৌলিক পদার্থের সাধারণ রাসায়নিক ধর্ম বিনা পরীক্ষাতেই বলে দেওয়া যায়। ল্যান্থেনাইড বা অ্যাক্টিনাইড জাতীয় পদার্থগুলি এই সারণীতে কিছুটা বেমানান, কারণ তাদের গঠনবিন্যাস কিছুটা জটিল। তা সত্ত্বেও আরো ভারী মৌলিক পদার্থ যে এই সারণী মেনে চলবে, তা ধরে নেওয়া যায়। 1.27 চিত্রে পর্যায় সারণীর সংবর্ধিত আকার দেওয়া হল—এতে সম্ভাব্য কয়েকটি অতিভারী মৌলিক পদার্থও দেখান হল। পরিবর্ধিত সারণীর অতিভারী মৌলিক পদার্থ এখনও অনাবিষ্কৃত আছে। সেসব পদার্থ কতটা স্থায়ী সে প্রশ্নও অবান্তর নয়।

বড় প্রশ্ন হল অতিভারী মৌলিক পদার্থ আমাদের কোন্ প্রয়োজনে আসবে? ধরা যাক্ 1 থেকে 26 সংখ্যার লোহা পর্যন্ত মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারের পর আর কোন পদার্থ যদি না পাওয়া যেত তবে কী ঘটত? এর মধ্যে অবশ্য অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস সবই পড়ে। কিন্তু যে জগতে রূপা বা ব্রোমিন নেই সেখানে আলোকচিত্রন কি সম্ভব হত? না পাওয়া যেত ইউরেনিয়াম থেকে নিউক্লীয় শক্তি? তাছাড়া এই 26টি মৌলিক পদার্থ দিয়ে অন্যান্যদের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থ যে সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে কতটা সাহায্য করেছে তার ইয়ত্তা নাই। আবার পর্যায় সারণীর মৌলিক পদার্থ সুবিন্যাসের অবদানও অস্বীকার করা যায় না। 1.27 চিত্রে বন্ধনী চিহ্নিত সংখ্যাগুলি অতিভারী মৌলিক পদার্থের পারমাণমিক সংখ্যা। এদের অবস্থান থেকে রাসায়নিক ধর্মও অনুমান করা যায়। এদের আবিষ্কার কখনও সম্ভব হলে সভ্যতা যে আরো অগ্রগামী হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 105 পারমাণবিক সংখ্যা পর্যন্ত যে সব কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, তাদের অর্ধজীবনকাল ইউরেনিয়ামের তুলনায় ক্রমশঃ অনেক কম, এমনকি কুচাটোভিয়ামের বেলায় তা এক সেকেণ্ডের কম হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এইসব ক্ষীণজীবী অতিভারী মৌলিক পদার্থ যদি পাওয়া যায় কখনও, তা কী কাজে লাগবে? এদের আবিষ্কার কি পণ্ডশ্রম হবে না?

কিন্তু তত্ত্ববিজ্ঞানীরা বলেন অন্য কথা। তাঁদের গণনায় 114 অথবা 126 সংখ্যার পরমাণুর নিউক্লিয়াস 184টি নিউট্রন সহযোগে বেশ স্থায়ী হতে পারে।

H 1																	He 2
Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
K● 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ca 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
K 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rb 45	Dd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
Cs 55	Ba 56	La 57	Ht 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 30	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	RN 86
Fr 87	Ra 88	Ac 89	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)
(119)	(120)	(121)															

ল্যান্থানাইড	Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	Tb 65	Dy 66	HO 67	Er 68	Tm 69	Yb 70	Lu 71
এ্যাক্টিনাইড	Th 90	Pa 91	U 92	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96	Bk 97	Ct 98	Es 99	Fm 100	Md 101	NO 102	Lr 103
অতি ভারী এ্যাক্টিনাইড	(122)	(123)	(124)											(153)

চিত্র 1.27 : পর্যায় সারণীতে অতি ভারী মৌলিক পদার্থের পর্যায় যেরকম হবে।

এর কারণ হল এই সংখ্যার প্রোটন বা নিউট্রন নিউক্লিয়াসে পুরোপুরি ভর্তি কোষের সৃষ্টি করে। ফলে এই নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব আসা অসম্ভব নয়।

নিওন, আর্গন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় বায়ব মৌলিক পদার্থে নির্দিষ্ট ইলেকট্রন কোষগুলি পুরোপুরি ভর্তি বলেই এইসব পরমাণু নিষ্ক্রিয়। নিউক্লিয়াসেও প্রোটন এবং নিউট্রনের এরকম আলাদা কোষ ধারণা করা যায়। বিশেষ সংখ্যায় এইসব কোষ ভর্তি হলে, সেই অবস্থায় নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব আসে।

নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংখ্যা প্রোটন থেকে কম বা বেশী হতে পারে। অক্সিজেনে 8, 9 বা 10টি নিউট্রন যুক্ত হয়ে তার তিনটি আইসোটোপ তৈরি করে। এইসব আইসোটোপ স্থায়ী। 6, 7, 11 বা 12টি নিউট্রনযুক্ত হয়ে অক্সিজেনের যে সব আইসোটোপ তৈরি হয়, তারা স্থায়ী নয়। অক্সিজেনের মত অন্যান্য পদার্থেরও কম বেশী একাধিক আইসোটোপ আছে—কেবল বেরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ছাড়া। এদের কোন আইসোটোপ নাই। একটু যত্ন নিয়ে দেখলে বোঝা যায় অযুগ্ম পারমাণবিক সংখ্যার পদার্থের আইসোটোপ সংখ্যা যুগ্মসংখ্যার পদার্থ থেকে সাধারণতঃ কম। যুগ্ম পারমাণবিক সংখ্যার প্রাচুর্য প্রকৃতিতে বেশী হতে দেখা যায়। আবার যুগ্ম নিউট্রন ও যুগ্ম প্রোটন সংখ্যার সমন্বয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস্-এর প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশী।

কোন্ নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় আইসোটোপ আছে—এর উত্তরে নিঃসন্দেহে টিনের নাম বলা যায়। এর আইসোটোপ দশটি। টিনের পারমাণবিক সংখ্যা 50 অর্থাৎ যুগ্ম। এই সংখ্যায় এত বেশী স্থায়ী আইসোটোপ প্রমাণ করে যে, 50 সংখ্যাটির বুঝি কোন যাদু আছে। 50টি নিউট্রন সংখ্যারও ছয়টি নিউক্লিয়াস রয়েছে—86 ক্রিপটন, 87 রুবিডিয়াম, 88 স্ট্রনসিয়াম, 89 ইট্রিয়াম, 90 জিরকোনিয়াম, 92 মলিব্ডেনাম। 50টি প্রোটন বা 50টি নিউট্রন নিয়ে এরকম স্থায়ী 16টি নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব দেখে জেনসেন এই সংখ্যার আখ্যা দেন যাদু সংখ্যা বা magic number। 50-এর পর 82টি নিউট্রনের যাদুসংখ্যায়ও 6টির বেশী স্থায়ী নিউক্লিয়াস আছে। এরকম সাতটি নিউক্লিয়াসের পারমাণবিক সংখ্যা 54 থেকে 62 ও ভরসংখ্যা 136 থেকে 144। 82টি প্রোটন সংখ্যায় লেড্-এর চারটি স্থায়ী আইসোটোপ আছে। 20টি নিউট্রন বা প্রোটন আছে এরকম স্থায়ী নিউক্লিয়াসও সংখ্যায় কম নয়। যেসব নিউক্লিয়াসের প্রাচুর্য বেশী, তাদের স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও অধিক। তাই এসব নিউক্লিয়াসের প্রোটন বা নিউট্রন সংখ্যা যাদুসংখ্যা হওয়া বিচিত্র নয়।

পরীক্ষায় দেখা গেল যে, পরমাণুর ইলেকট্রন কক্ষের মত নিউক্লিয়াসেরও প্রোটন ও নিউট্রনের কক্ষ আছে। প্রতি কক্ষে এদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। এক একটি

কোষ প্রোটন বা নিউট্রনে পুরোপুরি ভর্তি হলে, ঐ কণিকার সংখ্যাই হয় যাদুসংখ্যা। 2, 8, 20, 28, 40, 50 এবং 82 সংখ্যাগুলি প্রোটন ও নিউট্রন উভয়েরই যাদুসংখ্যা। সবচেয়ে বড় যাদুসংখ্যা হল প্রোটনের বেলায় 114 ও 126 এবং নিউট্রনের 126 ও 184। জেনসেন ও মেয়ারের গণনায় এই সংখ্যাগুলির বিশদ পরিচয় পাওয়া গেছে। সমান সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী প্রোটন নিউট্রন আছে 40 ভরসংখ্যার ক্যালসিয়ামে। 120 ভরের টিনে 50টি প্রোটন ও 70টি নিউট্রন থাকে। সবচেয়ে অধিক বাড়তি নিউট্রন 43টি রয়েছে 83 সংখ্যার বিসমাথের 209 ভরসংখ্যায়। 83 সংখ্যার পর পরমাণুগুলির নিউক্লিয়াস অস্থায়ী—ভারী ইউরেনিয়ামের গড় আয়ুষ্কাল যথেষ্ট বেশী।

যাদু সংখ্যার ক্ষমতা যে শুধু সমান সমান প্রোটন-নিউট্রন যাদু সংখ্যায় সীমাবদ্ধ তা নয়। তাদের পৃথক পৃথক যাদু সংখ্যা দিয়েও স্থায়ী নিউক্লিয়াস গঠিত হতে পারে। 28টি নিউট্রন বা প্রোটন দিয়ে 10টি, 40টি দিয়ে 9টি, 50টি দিয়ে 16টি, 82টি দিয়ে 11টি নিউক্লিয়াস স্থায়ী হতে পারে। শুধু 126টি নিউট্রন যাদু সংখ্যায় যে নিউক্লিয়াসটি স্থায়ী তা হল লেড-208। নিউট্রন ও প্রোটনের যাদু সংখ্যা পৃথক হয়েও তিনটি নিউক্লিয়াস স্থায়ী দেখা যায় $^{48}_{20}Ca$, $^{90}_{40}Zr$, $^{208}_{82}Pb$। নিউট্রন ও প্রোটন উভয়ের যাদু সংখ্যায় স্থায়ী বলেই ক্যালসিয়ামের মত ছোট নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সমান সংখ্যায় নিউট্রনের পরেও 8টি বেশী নিউট্রন থাকতে পারে। পরবর্তী এরকম নিউক্লিয়াস হল $^{64}_{28}Ni$।

40টি প্রোটন বা 50টি নিউট্রন দিয়ে গড়া অন্ততঃ দশটি নিউক্লিয়াস আছে। জারকোনিয়াম-90 এ দুই যাদু সংখ্যাই বর্তমান বলে প্রকৃতিতে তার এত প্রাচুর্য দেখা যায়। প্রোটন 82 ও নিউট্রন 126 দুটি যাদু সংখ্যা নিয়ে লেড 208। এই নিউক্লিয়াস সব লেড আইসোটোপের শতকরা 50 ভাগ। অথচ লেড 208-এ নিউট্রন ও প্রোটনের অনুপাত 1·537—মার্কারী 204-এর এই অনুপাত 1·550 থেকে নিশ্চয়ই কম। এই অনুপাত থেকে একটি প্রোটন কতটা নিউট্রন বেঁধে রেখে স্থায়ী নিউক্লিয়াস তৈয়ার করতে পারে তার একটা হিসেব পাওয়া যায়। কিন্তু মার্কারী 204এ, এই অনুপাত বেশী হলেও তার অন্য আইসোটোপের পরিমাণের $\frac{1}{8}$ ভাগ মাত্র এবং প্রাচুর্য লেড 208-এর তুলনায় এক-দশমাংশ। যাদু সংখ্যা কী রকম যাদুর সৃষ্টি করে লেড 208 তারই প্রমাণ। প্রোটন সংখ্যা 43 ও 61 যথাক্রমে টেক্নেসিয়াম ও প্রমিথিয়াম। এ দুয়েরই কোন স্থায়ী আইসোটোপ নেই। আবার নিউট্রন সংখ্যা 19, 35, 39, 45, 61, 89, 115 ও 125 দিয়ে কোনও স্থায়ী নিউক্লিয়াস হয় না।

61 সংখ্যাটি একেবারে বিপরীত যাদু সংখ্যা—এই সংখ্যার প্রোটন বা নিউট্রনে স্থায়ী নিউক্লিয়াস নাই।

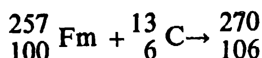
ইউরেনিয়ামের পর কোন স্থায়ী নিউক্লিয়াস সম্ভব হয় যদি গণনা অনুযায়ী 114 প্রোটন ও 184 নিউট্রন এই দুই যাদু সংখ্যায় কোন নিউক্লিয়াস গড়া যায়। পদার্থটি হবে একলেড্ (Eklead), যার ভৌতধর্ম সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। পুরোপুরি স্থায়ী না হলেও এই পদার্থটি যথেষ্ট স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। তেজস্ক্রিয় হলেও এর জীবনকাল হবে দীর্ঘ। এর কাছাকাছি সংখ্যার অন্য নিউ-ক্লিয়াসও স্থায়ী হতে পারে। যেমন 112 পারমাণবিক সংখ্যার একমার্কারী অথবা 118 সংখ্যার একরেডন। পর্যায় সারণীতে এদের অবস্থান ও ভৌত ধর্ম নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

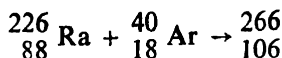
ইউরেনিয়ামের পর 105 সংখ্যা পর্যন্ত যে সব পদার্থ পাওয়া গেছে তাদের চেয়ে আরো ভারী স্থায়ী মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে। এরকম পদার্থ বাস্তবে পাওয়া গেলে অতি ভারী মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে নবতম পর্যায় সারণী প্রণয়ন সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

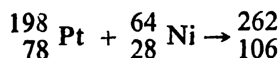
ফের্মিয়াম পর্যন্ত কৃত্রিম মৌলিক পদার্থ নিউক্লীয় রিয়্যাক্টর থেকে পাওয়া যায়; তার চেয়ে ভারী পদার্থ তৈরি করতে ত্বরণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। কার্যত কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন বা নিওন আয়ন এই যন্ত্রে যথেষ্ট বেগবান অবস্থায় যথাক্রমে কিউরিয়াম, অ্যামেরিসিয়াম, প্লুটোনিয়াম বা ইউরেনিয়ামে আঘাত করে যে নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটায়, তা থেকে 102 সংখ্যার নোবেলিয়াম তৈরি হয়। আরো ভারী মৌলিক পদার্থ পেতে ত্বরণের মাত্রা বাড়ান প্রয়োজন। সমস্যা হল, উপযুক্ত ত্বরণ যন্ত্রে উচ্চ শক্তির ভারী আয়ন পাওয়ার অসুবিধা। একেই তো কণা ত্বরণ যন্ত্র বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল। প্রোটন থেকে ভারী আয়ন ত্বরণে এই জটিলতা বাড়ে। আর্গন আয়ন ত্বরণ এখনই সম্ভব হচ্ছে, আরো ভারী আয়ন ত্বরণের উপযোগী যন্ত্র নির্মাণে চেষ্টার বিরাম নাই।

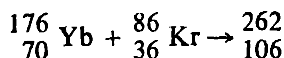
অতি ভারী মৌলিক পদার্থ পেতে যে সব নিউক্লীয় বিক্রিয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে তার একটি হল ভারী আয়ন বেগবান অবস্থায় অনুরূপ একটি ভারী নিউক্লিয়াসে জুড়ে দিয়ে অতি ভারী মৌলিক পদার্থ তৈরি করা। অপর একটি হল ইউরেনিয়াম বা অনুরূপ ভারী আয়ন বেগবান অবস্থায় অনুরূপ নিউক্লিয়াসে যুক্ত করে সেই বৃহত্তর নিউক্লিয়াসের বিভাজনে অতিভারী মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা।

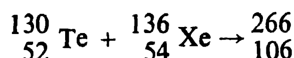
106 পারমাণবিক সংখ্যার নিউক্লিয়াস পেতে হলে নীচের বিক্রিয়াগুলির কথা ভেবে দেখা যায় :


$${}^{257}_{100}\text{Fm} + {}^{13}_{6}\text{C} \rightarrow {}^{270}_{106}$$


$${}^{226}_{88}\text{Ra} + {}^{40}_{18}\text{Ar} \rightarrow {}^{266}_{106}$$

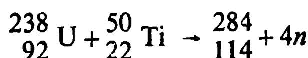

$${}^{198}_{78}\text{Pt} + {}^{64}_{28}\text{Ni} \rightarrow {}^{262}_{106}$$

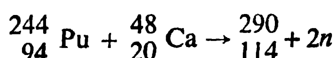

$${}^{176}_{70}\text{Yb} + {}^{86}_{36}\text{Kr} \rightarrow {}^{262}_{106}$$

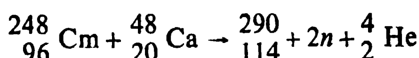

$${}^{130}_{52}\text{Te} + {}^{136}_{54}\text{Xe} \rightarrow {}^{266}_{106}$$

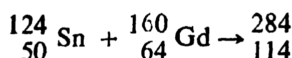
114 পারমাণবিক সংখ্যার পদার্থ তৈরি করতে নীচের বিক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে :

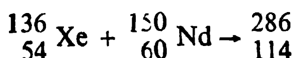

$${}^{248}_{96}\text{Cm} + {}^{40}_{18}\text{Ar} \rightarrow {}^{284}_{114} + 4n$$

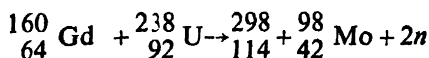

$${}^{238}_{92}\text{U} + {}^{50}_{22}\text{Ti} \rightarrow {}^{284}_{114} + 4n$$

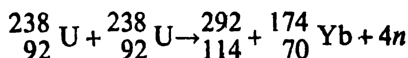

$${}^{244}_{94}\text{Pu} + {}^{48}_{20}\text{Ca} \rightarrow {}^{290}_{114} + 2n$$


$${}^{248}_{96}\text{Cm} + {}^{48}_{20}\text{Ca} \rightarrow {}^{290}_{114} + 2n + {}^{4}_{2}\text{He}$$


$${}^{124}_{50}\text{Sn} + {}^{160}_{64}\text{Gd} \rightarrow {}^{284}_{114}$$

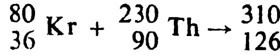

$${}^{136}_{54}\text{Xe} + {}^{150}_{60}\text{Nd} \rightarrow {}^{286}_{114}$$


$${}^{160}_{64}\text{Gd} + {}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{298}_{114} + {}^{98}_{42}\text{Mo} + 2n$$

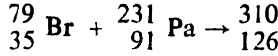

$${}^{238}_{92}\text{U} + {}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{292}_{114} + {}^{174}_{70}\text{Yb} + 4n$$

এই বিক্রিয়াগুলির জন্য আর্গন থেকে ইউরেনিয়াম এই সব ভারী আয়ন ত্বরণ প্রয়োজন। এরকম আরও সব বিক্রিয়ার পরিকল্পনা করা যায়। উপরের তালিকার শেষোক্ত দুটি আসলে বিভাজন ক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় অতিভারী মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল মনে করা হয়। শেষের বিক্রিয়াতে ইউরেনিয়াম আয়নে নিউক্লিয়ন পিছু প্রায় 8·2 Mev শক্তির ত্বরণ প্রয়োজন।

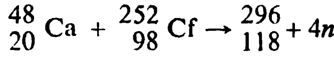
তা যদি সম্ভব হয় তবে নীচের বিক্রিয়াগুলি থেকে 114 পারমাণবিক সংখ্যার বা তার চেয়ে ভারী পদার্থ পাওয়া বিচিত্র নয়—



$$^{80}_{36}Kr + ^{230}_{90}Th \rightarrow ^{310}_{126}$$



$$^{79}_{35}Br + ^{231}_{91}Pa \rightarrow ^{310}_{126}$$



$$^{48}_{20}Ca + ^{252}_{98}Cf \rightarrow ^{296}_{118} + 4n$$

ভারী আয়নের ত্বরণ যতদূর করা যাবে, এরকম অনেক বিক্রিয়া ততটাই সম্ভব হবে। সে চেষ্টাও চলেছে।

অতিভারী মৌলিক পদার্থ তৈরি হলে অবশ্যই তার নিউক্লীয় ধর্ম পরীক্ষা করে তার অস্তিত্ব জানা যাবে। অন্য উপায় হল ওপরের সব বিক্রিয়াতে যখন দুটি নিউক্লিয়াস যুক্ত হবে, তখন একটি অস্থায়ী পরমাণু গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। সেই পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি কক্ষে যে ইলেকট্রন বাঁধা পড়বে, তার শক্তি ইলেকট্রনের স্থির ভরের শক্তি 0·5 Mev-ও ছাড়িয়ে যাবে। সংঘাতের সময় এই শক্তির রঞ্জেন রশ্মির রেখা-বর্ণালী তখন ধরা পড়বে। ভারী আয়ন ত্বরণ যন্ত্র থেকে বেগবান অবস্থায় লক্ষ্যবস্তুতে ফেলে এরকম যে রঞ্জেন রশ্মি বেরোয় তা পরীক্ষাগারে ধরা পড়েছে। পরমাণু বিজ্ঞানে এই ঘটনা এক নতুন অভিজ্ঞতা। কল্পনা করা যাক্, হাইড্রোজেনের কক্ষে ইলেকট্রনের বন্ধনশক্তি 13·58 ইঃ ভোঃ মাত্র, এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে ভারী পরমাণুতেও কক্ষস্থিত সবচেয়ে শক্তিশালী ইলেকট্রনেরও তার স্থির ভরের সমান 0·5 Mev শক্তি থাকা সম্ভব নয়।

অতিভারী মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেলে হয়ত ইউরেনিয়ামের চেয়ে আরো সহজে এবং সুবিধাজনক উপায়ে নিউক্লীয় শক্তি আহরণ করা যাবে। এখন আমাদের ভাণ্ডারে যে অজস্র স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপ রয়েছে, অতিভারী মৌলিক পদার্থের সংযোগে সেই ভাণ্ডারটিও ফুলে-ফেঁপে উঠবে। প্রয়োজনের সব ক্ষেত্রেই এদের প্রয়োগ এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

ডালটনের যুগে যখন ধারণা ছিল পরমাণুকে আর ভেঙে ছোট করা যাবে না, পরমাণুর অন্তর্নিহিত বিচিত্র জগতের সন্ধান যখন অজানা, তখনই কিন্তু স্টোনি একক-মাত্রা বিদ্যুৎ আধান ইলেকট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই ধারণা অবশ্য এসেছিল ফ্যারাডের বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ পরীক্ষা থেকে। হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে দুটি প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বার দিয়ে কয়েক ভোল্ট বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে নেগেটিভ দ্বারে হাইড্রোজেন ও পজিটিভে ক্লোরিন পাওয়া যায়। পরিচালিত বিদ্যুৎপ্রবাহের সমানুপাতী এই দুটি বায়বই নির্দিষ্ট সময়ে একই আয়তনে বেরিয়ে আসে। হাই-ড্রোজেন ক্লোরাইডের পরিবর্তে দ্রবণটি যদি সাধারণ জল হয় (H_2O) তবে নেগেটিভ দ্বারে আগের পরীক্ষার সমান আয়তনের হাইড্রোজেন বেরোলে পজিটিভ দ্বারে এখন যে অক্সিজেন বেরোবে তার আয়তন হাইড্রোজেনের অর্ধেক হবে।

রসায়নের ভাষায় অক্সিজেনের যোজ্যতা (Valency) হাইড্রোজেনের দুগুণ বলেই এরকম ঘটে। ফ্যারাডের সমীকরণে এই প্রক্রিয়াটি প্রকাশ করা হয়ঃ

$$\frac{\text{নির্গত পদার্থের ভর}}{\text{বিদ্যুতের পরিমাণ}} = \frac{\text{পরমাণুর ভর}}{F \times \text{যোজ্যতা}}$$

F হল ফ্যারাডের নিত্যসংখ্যা এবং

$$F = \frac{\text{বিদ্যুতের পরিমাণ}}{\text{নির্গত পদার্থের ভর}} \times \frac{\text{পরমাণুর ভর}}{\text{যোজ্যতা}}$$

এখানে বিদ্যুৎ পরিমাণ বলতে কুলম্ব অর্থাৎ এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহ এক সেকেণ্ডে যে আধান সৃষ্টি করে। ভর গ্র্যামে ধরা হয়। দুটি হাইড্রোজেন একটি অক্সিজেনকে বাঁধতে পারে—তৈরি হয় জলের অণু। এই বাঁধনের ক্ষমতার অনুপাত হল যোজ্যতা। সোডিয়াম, হাইড্রোজেন এরা একযোজী আর অক্সিজেন, ক্যাল-সিয়াম ইত্যাদি পরমাণু দ্বিযোজী। আরও বেশী যোজ্যতার পরমাণুও আছে।

পরমাণুর ভর বলতে অক্সিজেন-16 পরমাণুর অনুপাতে তার আপেক্ষিক ভর। এই হিসেবে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর 1·008। আজকাল কার্বন-12 পরমাণুর অনুপাতে ভর হিসাব করা হয়—তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

গ্র্যামে পরমাণুর ভর ও নির্গত পদার্থের ভর নিলে দেখা যাবে যে, একই পরিমাণ আধানের জন্য একযোজী পদার্থ যা নির্গত হয়, দ্বিযোজী পদার্থে তা অর্ধেক হয়ে যায়, ত্রিযোজী পদার্থে এক-তৃতীয়াংশ। ফ্যারাডের পরীক্ষায় এই প্রমাণ থেকে দেখা

যায় যে, 96500 কুলম্ব আধান দিয়ে কোন পদার্থের তুল্যমূল্য ওজনের (equivalent weight) সমান ভর গ্র্যামে নির্গত হতে পারে। গ্র্যামে পরমাণুর ভরকে যোজ্যতা দিয়ে ভাগ করলে তুল্যমূল্য ওজন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মিলিকান একটি ইলেকট্রনের আধান বিখ্যাত তৈলবিন্দু পরীক্ষায় পরিমাপ করেন। এর মান হল $1{\cdot}60\times10^{-19}$ কুলম্ব। 96500 কুলম্ব বলতে $\frac{96500}{1{\cdot}60\times10^{-19}}=6{\cdot}02\times10^{23}$ ইলেকট্রন, ফ্যারাডের পরীক্ষায় ক্যাথোড্ থেকে অ্যানোডে বাহিত হয়। একযোজী পদার্থ যে সময়ে তার আয়নে এরকম একটি আধান বয়ে নিয়ে যায়, দ্বিযোজী নেয় দুটি ইত্যাদি। এথেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পদার্থের এক গ্র্যাম-পারমাণবিক ওজনে $6{\cdot}02\times10^{23}$ পরমাণু রয়েছে। এই সংখ্যাটি অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা। অ্যাভোগাড্রো অনেক আগেই দেখিয়েছিলেন যে সব গ্যাসের গ্র্যাম-আণবিক ওজনে এই সংখ্যক অণু বর্তমান থাকে।

পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের সঙ্গে ইলেকট্রনের সম্পর্ক অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল। পরমাণুর শক্তিবিকিরণে তার ভূমিকা আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ইলেকট্রন জড় পদার্থের মৌলিক কণা—কিন্তু তার অন্য কণাগুলির মত তরঙ্গধর্ম প্রত্যক্ষ করা যায়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ইলেকট্রনের এই ভূমিকা অদৃশ্য জগতের প্রকাশে সাহায্য করেছে। দৃশ্যজগতে পদার্থের স্বরূপ জানতে ইলেকট্রনের ভূমিকা আধুনিক বিজ্ঞানে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

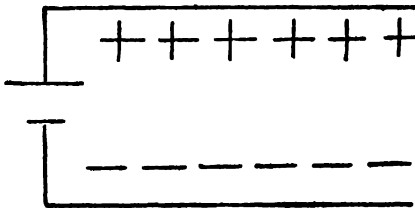
পদার্থের পরিবাহিতা ও ইলেকট্রন

কঠিন পদার্থের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যুৎপরিবাহী আবার কোনটি বিপরীত অর্থাৎ সম্পূর্ণ অপরিবাহী। উত্তম পরিবাহী পদার্থের 100 সেণ্টিমিটার দীর্ঘ ও 1 বর্গ-সেণ্টিমিটার প্রস্থচ্ছেদের একটি দণ্ডে প্রায় 10 থেকে 100 অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাফেরা করতে পারে। আবার অপরিবাহী পদার্থে এই প্রবাহের 10^{-26} গুণ পরিবাহিতাও সম্ভব হয় না। আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে যাদের আধা-পরিবাহী (semi-conductor) বলা হয়। পরিবাহী পদার্থে তাপ বাড়ালে পরিবাহিতা কমে, কিন্তু আধা-পরিবাহী পদার্থে তাপের সঙ্গে পরিবাহিতাও বেড়ে যায়। পদার্থের ইলেকট্রন বিন্যাসের বৈচিত্র্য থেকে পরিবাহিতা নির্ণীত হয়।

ক্রিস্ট্যালের পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলির বাঁধন কিছুটা শিথিল, তাই তারা সেখানে একটু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। পরিবাহী পদার্থের দুই প্রান্তে বিদ্যুৎ-বিভব প্রয়োগ করলে উঁচু বিভবের দিকে ইলেকট্রনগুলি চালিত হয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। প্রথমেই মনে হবে ক্রমশঃ ইলেকট্রনগুলির ত্বরণ হ'য়ে বুঝি বিদ্যুৎপ্রবাহ

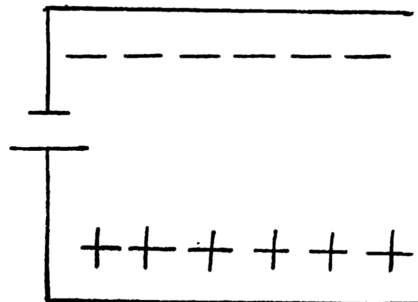
বাড়বে। কার্যত কৃস্ট্যালের পরমাণুর সঙ্গে তাদের সংঘাত এরকম ত্বরণকে বাধা দেয়—ফলে স্থির মানের বিদ্যুৎপ্রবাহই পাওয়া যায়। এই প্রবাহ তখন পদার্থের একক আয়তনে মুক্ত ইলেকট্রনের সমানুপাতী ও সেকেণ্ডে যতবার সংঘাত ঘটে সেই সংখ্যার বিপরীত অনুপাতী হবে।

একটি পরমাণুতে ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষের শক্তিস্তরে আবদ্ধ থাকে। দুটি বা অধিক পরমাণু মিলে অণু হলে এই স্তরগুলি বিভক্ত হয়ে পড়ে। কঠিন পদার্থে বহু পরমাণুর সমবায়ে এই স্তরগুলি এমনভাবে ভাগ হয়ে পড়ে যে তা একটি অবিরাম পটির (band) সৃষ্টি করে। 1.28 চিত্রে দেখা যাবে যে, এই পটির সূক্ষ্মতর উপস্তর থাকে। পটিগুলির মাঝখানের ফাঁকে কোন ইলেকট্রন থাকে না। উপরের পটিতে পরিবাহী ধাতুর সব পরমাণুর পরিবাহী ইলেকট্রনগুলি চলাফেরা করে। একে পরিবাহী পটি (conduction band) বলা হয়। এই পটির সূক্ষ্মতর প্রতি স্তরে পউলির নিয়ম অনুযায়ী দুটির বেশী ইলেকট্রন থাকতে পারে না। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একাধিক শক্তিস্তর আছে—কিন্তু তার একটিমাত্র ইলেকট্রন একসময়ে একটি স্তরেই থাকতে পারে।



চিত্র 1.28 : পরিবাহী পদার্থে যোজ্যতা পটি থেকে পরিবহন পটির পার্থক্য কম, তাই অল্পবিভবে ইলেকট্রন চলাফেরা করে।

তেমনি কঠিন পদার্থে একাধিক পটি থাকলেও সবগুলিতে ইলেকট্রন থাকে না। পরিবাহী পদার্থের পরিবাহী পটিতে অল্পসংখ্যক ও নীচের পটিগুলিতে ভর্তি ইলেকট্রন থাকে। বিদ্যুৎবিভব প্রয়োগ করলে নীচের স্তরের ইলেকট্রনগুলি সহজেই পরিবহন পটিতে লাফিয়ে যেতে পারে। তাই এসব পদার্থ পরিবাহী।



চিত্র 1.29 : অপরিবাহী পদার্থে যোজ্যতা ও পরিবহন পটির দূরত্ব বেশী, তাই ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে না।

1.29 চিত্রে দেখা যাবে যে নীচের যোজ্যতাপটি (valence band) যেসব পদার্থে আংশিক বা পুরোপুরি ইলেকট্রনে ভর্তি থাকে ও পরিবহন পটিতে ইলেকট্রন থাকে না এবং এই দুই পটির

দূরত্ব এত বেশী হয় যে, বিদ্যুৎবিভব প্রয়োগ করলেও নীচের স্তরের ইলেকট্রনগুলি সহজে পরিবহন পটিতে উঠতে পারে না—সেই সব পদার্থ অপরিবাহী।

আধাপরিবাহী পদার্থের গঠনবিন্যাস অপরিবাহী পদার্থের মত—কিন্তু তাদের পরিবহন ও যোজ্যতা পটির দূরত্ব অনেক কম। সামান্য বিদ্যুৎবিভবের সাহায্যে একই পটির নীচের স্তর থেকে ওপরে ইলেকট্রন গেলে পদার্থটি পরিবাহী পদার্থের মত আচরণ করে। নীচের যোজ্যতা পটির ইলেকট্রন পরিবহন পটিতে গেলে, যোজ্যতা পটির তার নীচের স্তরের কোন ইলেকট্রন ঐ স্তরের খালি জায়গা দখল করতে পারে। তখন নীচের স্তরে যেন ছিদ্র সৃষ্টি হয়—যা পজিটিভ বিদ্যুৎ আধানের মত। ইলেকট্রনের এরকম ওঠানামা চলে বলেই জারমেনিয়াম ও সিলিকন্ আধাপরিবাহী। বাইরের পরমাণু ঢুকিয়ে এদের পরিবাহিতা যথেষ্ট বাড়ান যায়।

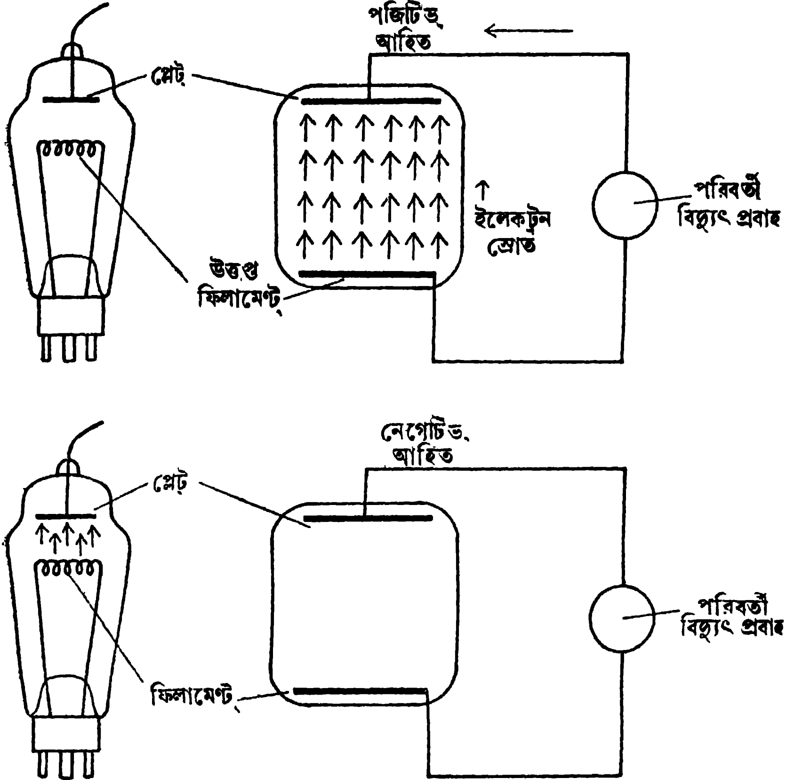
ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্‌

আকাশে বিদ্যুতের চমকে ইলেক্‌ট্রনের ধর্মের আভাস পাওয়া যায়। মেঘ ও পৃথিবীপৃষ্ঠে বিপরীত বিদ্যুৎ আধান জমা হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটে। পৃথিবী ও মেঘের মাঝামাঝি বায়ু মুক্ত ইলেক্‌ট্রনের ধাক্কায় ইলেক্‌ট্রন হারিয়ে আয়নে পরিণত হয়। এভাবে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বাড়ে। আয়নগুলি নেগেটিভধর্মী পৃথিবী অথবা মেঘের দিকে এবং ইলেক্‌ট্রনগুলি আয়নের উল্টোদিকে প্রবাহিত হয়। আয়ন ভারী বলে তার গতিও মন্থর। ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে মিলে তাদের অনেকেই উদাসীন (neutral) হয়ে যায়। এই মিলনে যে শক্তির বিকিরণ হয়, তা বিজলীর চমকে প্রকাশ পায়। বায়ুর কোন্‌ আয়নের কোন্‌ শক্তিস্তরে ইলেক্‌ট্রন বাঁধা পড়ছে তার উপর বিজলীর রং ও তীব্রতা নির্ভর করে। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে তখন যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে তাতে বায়ুর বিক্ষিপ্ত পরমাণুগুলি প্রচণ্ড শক্তিলাভ করে, স্থানীয় তাপমাত্রা বেড়ে যায়, বায়ুমণ্ডল সবেগে প্রসারিত হয়। বাড়তি চাপের জন্য বাজের শব্দ শোনা যায়। এই ক্রিয়ার ফলে মেঘ ও পৃথিবীর স্থৈতিক শক্তি, তাপ, আলো ও শব্দ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রাকৃতিক এই ইলেক্‌ট্রনপ্রবাহের অনুরূপ উপায়ে তৈরি গবেষণাগারে মুক্ত ইলেক্‌ট্রন নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। ক্যাথোড ও এক্সরশ্মি মুক্ত ইলেক্‌ট্রন দিয়েই উৎপন্ন করা যায়। মুক্ত ইলেক্‌ট্রনের সাহায্যে রেডিও, TV, কম্প্যুটার প্রভৃতি চালান সম্ভব হয়। সামগ্রিকভাবে ইলেক্‌ট্রন এভাবে কাজে লাগানোর পদ্ধতির প্রযুক্তিবিদ্যাকে ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্‌ (Electronics) বলা হয়।

রেডিও, TV, রাডার বা এরকম হাজার হাজার যন্ত্রে মূল উপাদান হল এক বা একাধিক ভ্যাকুয়াম টিউব। এই টিউবের কার্যপ্রণালী হল ক্যাথোড্‌ ও প্লেট বা অ্যানোডের মধ্যে মুক্ত ইলেক্‌ট্রন প্রবাহ চলতে পারে। প্রায়-ভ্যাকুয়ামে এই টিউব বাইরে থেকে বন্ধ রাখা হয়। পরিবাহী ধাতুতে ইলেক্‌ট্রনের স্পন্দনগতি আছে—সাধারণতঃ এই গতি ধাতুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তরলপদার্থের পৃষ্ঠটানের মত একটি বল ধাতুপৃষ্ঠ থেকে ইলেক্‌ট্রন বেরোতে দেয় না। তরলপদার্থ পৃষ্ঠ থেকে অবশ্য উবে (evaporate) যেতে পারে, ঠিক তেমনি উঁচু তাপমাত্রায় ও ধাতুপৃষ্ঠের কিছু ইলেক্‌ট্রন মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। ভ্যাকুয়াম টিউবের ক্যাথোড্‌এ যথেষ্ট তাপ দিলে তা থেকে ইলেক্‌ট্রন মুক্ত হয়। অ্যানোড ও ক্যাথোড-এর মধ্যে বিদ্যুৎবিভব দিলে ঐসব ইলেক্‌ট্রন প্রবাহিত হয়। ইলেক্‌ট্রনগুলি ক্যাথোড থেকে

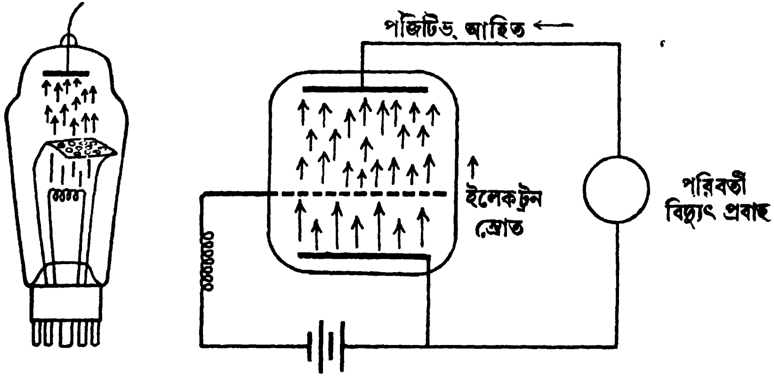
প্লেটে একমুখী হ'য়ে যেতে পারে—কারণ অ্যানোড থেকে কোন ইলেক্ট্রন উৎপন্ন হয় না। বিদ্যুৎবিভব পরিবর্তী (alternating) হলে এরকম ক্যাথোড অ্যানোডের ডায়োডে বিদ্যুৎপ্রবাহ একমুখী (rectified) হয় (চিত্র 1.30)। ফ্লেমিং ডায়োডের আবিষ্কার করেন। বহু যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহ একমুখী করতে ডায়োড্ ব্যবহৃত হয়।

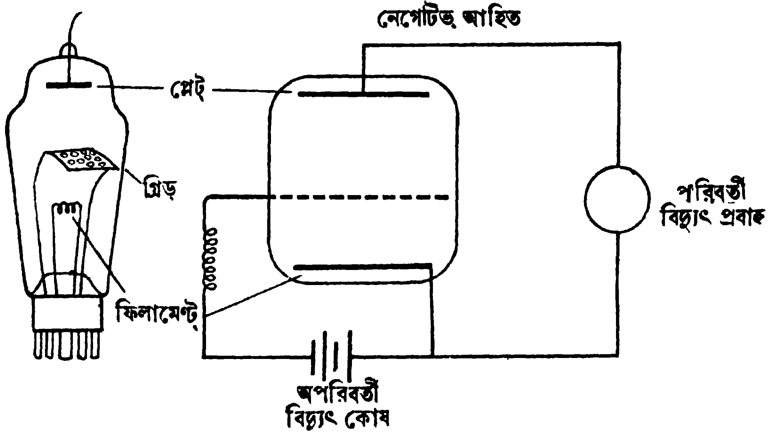


চিত্র 1.30 : ডায়োডে পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ কীভাবে একমুখী হয় তা দেখানো হয়েছে।

আর একটু জটিল কার্যপ্রণালী হল ট্রায়োডের (Triode)। এর আবিষ্কার করেন দ্য ফরেস্ট 1906 খ্রীষ্টাব্দে। এই ভ্যাকুয়াম টিউবে একই অক্ষকে কেন্দ্র করে দুটি এক-কেন্দ্রিক সিলিণ্ডার থাকে। বাইরের ধাতুর সিলিণ্ডার নিরেট ও ভেতরের সিলিণ্ডার গ্রিড্ (grid)টি হল ঘন-সান্নিহিত তারের কুণ্ডলী। তাপ দিলে ট্রায়োডের ক্যাথোডেও অসংখ্য ইলেক্ট্রন বেরোয়। ক্যাথোডে নেগেটিভ ও অ্যানোডে পজিটিভ বিদ্যুৎবিভব প্রয়োগ করলে ডায়োডের মতই ট্রায়োডে ইলেক্ট্রন প্রবাহ চলে। এখন গ্রিডে যদি

সামান্য নেগেটিভ আধান দেওয়া যায়, তাহলে ইলেকট্রনগুলি প্লেটে আসতে বাধা পাবে। গ্রিডের নেগেটিভ বিভব যদি খুব বেশী হয়, তাহলে কোন ইলেকট্রনই প্লেটে

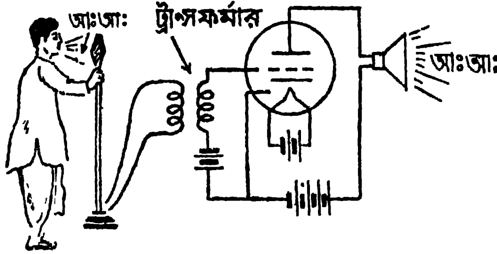




চিত্র 1.31 : গ্রিড সহযোগে ট্রায়োডের কার্যপ্রণালী। ফিলামেণ্ট উত্তপ্ত করার জন্য ব্যাটারী দেখানো হয়নি।

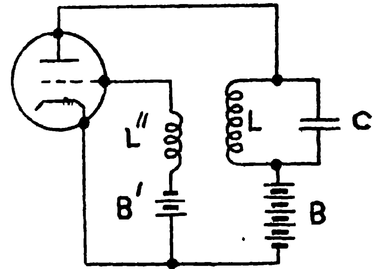
পৌঁছবে না। তাহলে, দেখা যাচ্ছে যে গ্রিডে বিদ্যুৎ আধান থাকলে ট্রায়োডকে ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে কপাটের মত ব্যবহার করা চলে (চিত্র 1.31)। সামান্য বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে গ্রিডে আবশ্যকীয় আধান প্রয়োগ করা যায়। 1.32 চিত্রে মাইক্রোফোনের দুর্বল পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ ট্রায়োডে কীভাবে বিবর্ধিত হয় তা দেখানো হল।

ব্যাটারী গ্রিডে ক্যাথোডের অনুপাতে নেগেটিভ বিভব উৎপন্ন করে। মাইক্রোফোন ট্রান্সফরমার-এর দ্বিতীয়ক (Secondary) থেকে পরিবর্তী প্রবাহ গ্রিডে প্রযুক্ত বিভবের বেশী বা কম বিভব উৎপন্ন করে। গ্রিড বিভবের এই পরিবর্তন প্লেটের লাউডস্পীকার সহ বিদ্যুৎবর্তনীতে প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করে দেয়।



চিত্র 1.32 : ট্রায়োডের সাহায্যে মাইক্রোফোন উৎপাদিত পরিবর্তী ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রবাহ কীভাবে বিবর্ধিত হয়—তা দেখানো হল। ট্রান্সফর্মারটি বিশেষ ধরনের। 1.31 চিত্রের ট্রায়োডের সঙ্গে বাকী অংশটুকু তুলনীয়। কেবল ট্রায়োডের ফিলামেন্ট উত্তপ্ত করার জন্য ব্যাটারী এই চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ট্রায়োডের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের বিবর্ধন ছাড়াও বৈদ্যুতিক স্পন্দনের উৎপাদন করা যায়। 1.33 চিত্রে ট্রায়োডের প্লেটে একটি আবেশ-কুণ্ডলী (induction coil) ও বিদ্যুৎধারক (condenser) নিয়ে স্পন্দকারী বর্তনী দেখানো হল। এই বর্তনীর কার্যপ্রণালী বুঝতে আমরা সাধারণ দুটি বিদ্যুৎপরিবাহী গোলকের বৈদ্যুতিক শক্তি থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির উৎপাদন কীভাবে সম্ভব হয় তা আলোচনা করতে পারি। এরকম দুটি গোলকের পৃষ্ঠদেশ একটি পজিটিভ ও অন্যটি নেগেটিভ করতে যে শক্তির ব্যয় হয়, দুটি গোলক কাছাকাছি রাখলে এই শক্তি তাদের মধ্যে তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে জমা থাকে। এখন দুটির মধ্যে পরিবাহী তার যোগ করলে, বিদ্যুৎপ্রবাহ চলবে এবং ক্রমশঃ তড়িৎক্ষেত্রটিও দুর্বল হতে থাকবে। তড়িৎক্ষেত্র থেকে এই শক্তির হ্রাসটুকু কিন্তু বিনষ্ট হয়ে যাবে না, তা ঐ তারের বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্য তার চারপাশে চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে তাতে জমা হয়ে থাকবে। এক সময় গোলক দুটির মধ্যে যখন বিদ্যুৎপ্রবাহ থাকবে

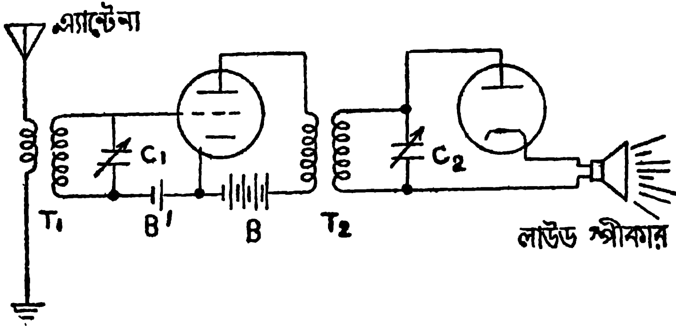


চিত্র 1.33 : ট্রায়োড দিয়ে বেতার আন্দোলক। L ও L' আবেশকুণ্ডলী, C কণ্ডেন্সার, B', B—ব্যাটারী।

না, তা কার্যত উদাসীন হয়ে পড়বে ; তখন চুম্বকক্ষেত্রের সঞ্চিত শক্তি দিয়েই আবার বিদ্যুৎপ্রবাহ চলবে, তবে এবার উল্টোদিকে। ফলে পজিটিভ গোলকটি এবার নেগেটিভ এবং নেগেটিভটি পজিটিভ হয়ে পড়বে। এরকম ব্যবস্থায় বিদ্যুৎপ্রবাহ কখনই বন্ধ হত না যদি-না তারের রোধ বৈদ্যুতিক শক্তিকে বাধা দিত—তাছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তির কিছু অংশ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার ফলে ও বাইরের শক্তি যুক্ত না হলে এরকম স্পন্দকারী বর্তনী কাজ চালিয়ে যেতে পারে না। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েল যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 1888 খ্রীষ্টাব্দে হার্জ পরীক্ষায় তা আবিষ্কার করেন। মার্কনী এই তরঙ্গের কার্যকরী দিক্‌টির এত উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন যে, 1899 খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই তরঙ্গের সাহায্যে ইংলিশ চ্যানেলের এপার ওপার বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদানে সমর্থ হন। 1901 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রেডিও যন্ত্র আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদানে সমর্থ হয়। আধুনিককালে রেডিও এবং TV ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। স্পন্দকারী বর্তনীতে দুটি গোলকের পরিবর্তে যে বিদ্যুৎ ধারক থাকে তার তড়িৎক্ষেত্র বেশী পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি মজুত রাখতে পারে। একটি তারের পরিবর্তে সলিনয়েড-এর মত তারের কুণ্ডলী তার চুম্বকক্ষেত্রে শক্তি জমা করে রাখতে পারে। সলিনয়েডের মত কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ হলে যে চুম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়, তা বিদ্যুৎপ্রবাহকেই বাধা দিতে থাকে, তাই এই আকারের কুণ্ডলীকে আবেশ কুণ্ডলী বলা হয়। স্পন্দকারী বর্তনীর স্পন্দন যাতে বন্ধ না হয়, ট্রায়োড সেই শক্তি যুগিয়ে যায়। ট্রায়োডের গ্রিডে একটি আবেশকুণ্ডলী থাকে তা স্পন্দকারী বর্তনীর আবেশকুণ্ডলীর দ্বিতীয়ক হিসেবে শক্তি আহরণ করে ও গ্রিডের ব্যাটারীর বিভবের উপর এই স্পন্দন আরোপ করে প্লেটে তা পুনর্নিবেশ (feed back) করে।

1.33 চিত্রে স্পন্দক (transmitter) হিসেবে ট্রায়োডের এই ব্যবহার সম্পর্কে একটি সহজ ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। স্পন্দক থেকে স্পন্দন উৎপাদন করে মাইক্রো-ফোনের শব্দ বা সঙ্গীতের সাহায্যে এই স্পন্দনের বিস্তার (amplitude) অথবা কম্পাঙ্ক (frequency) মড্যুলেট করে তা বাহক তরঙ্গ হিসেবে দূরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এখন গ্রাহক যন্ত্রের তা ধরবার পালা। আধুনিক গ্রাহকযন্ত্রের জটিলতার ভেতর না গিয়ে 1.34 চিত্রে একটি সহজতর ব্যবস্থা দেখানো হল। গ্রাহকযন্ত্রের অ্যাণ্টেনাতে বাহকতরঙ্গ আঘাত করলে বেতার-তরঙ্গ অ্যাণ্টেনা ও ভূমির মধ্যবর্তী ট্রান্সফরমার (T_1)-এর মুখ্য অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। ঐ ট্রান্সফরমারের দ্বিতীয়ক ও পরিবর্তী বিদ্যুৎ-ধারক (C_1) মিলে যে স্পন্দকারী বর্তনী তৈরি হয়, তাতে ঐ ধারকের মান পরিবর্তন করে বাঞ্ছিত কম্পাংকের তরঙ্গ ধরা পড়ে। এখন ঐ বর্তনীতে যে বিভবের হ্রাসবৃদ্ধি বেতার তরঙ্গের পরিবর্তী প্রবাহের জন্য ঘটে তা সংশ্লিষ্ট ট্রায়োডের গ্রিডের ব্যাটারীর একমুখী বিভবকে

ঐ প্রবাহের অনুরূপ ঘটিয়ে গ্রিডকে বেশী বা কম নেগেটিভ অবস্থায় নিয়ে আসে।



চিত্র 1.34 : সাধারণ বেতারগ্রাহক যন্ত্র। এতে আছে একটি ট্রায়োড বিবর্ধক ও একটি ডায়োড। T_1, T_2—ট্রান্সফরমার, B, B'—ব্যাটারী, C_1, C_2—কণ্ডেন্সার।

ট্রায়োডের প্লেটের সঙ্গে ট্রান্সফরমার (T_2)-এর মুখ্য অংশটির যোগ থাকায় তার বিদ্যুৎ প্রবাহ ও গ্রিডের নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী বাড়ে বা কমে। T_2-এর দ্বিতীয়ক-এর সঙ্গে C_2 বিদ্যুৎ ধারক নিয়ে যে স্পন্দকারী বর্তনী তার পরিবর্তী C_2 ধারকের মান C_1 ধারকের মানের সঙ্গে একযোগে পরিবর্তন করা যায়। ফলে এই বর্তনীতে প্রথম বর্তনীর বাঞ্ছিত কম্পাংক অনুনাদিত (resonant) হয়ে ধরা পড়ে। তখন ঐ বেতার-তরঙ্গকে একটি ডায়োড-এর সাহায্যে একমুখী করা হয় ও প্রয়োজনমত বিবর্ধকের সাহায্যে জোরালো করে লাউড্‌স্পীকারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সিজিয়াম, সেলেনিয়াম প্রভৃতি ধাতু থেকে আলো দিয়ে ইলেক্‌ট্রন মুক্ত করা যায়—এই আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার কথা আমাদের জানা আছে। এই প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে টেলিভিশনে বেতার তরঙ্গ দিয়ে দূরে ছবি পাঠান যায়। ভ্যাকুয়াম ভাল্‌বের সাহায্য ছাড়া কঠিন পদার্থ অর্থাৎ সেমিকণ্ডাক্টরের সাহায্যে যে আধুনিক ইলেক্‌ট্রনিক্‌সের পত্তন হয়েছে তার প্রয়োগ সমাজে যুগান্তর নিয়ে এসেছে।

সেমিকন্ডাক্টর ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্‌

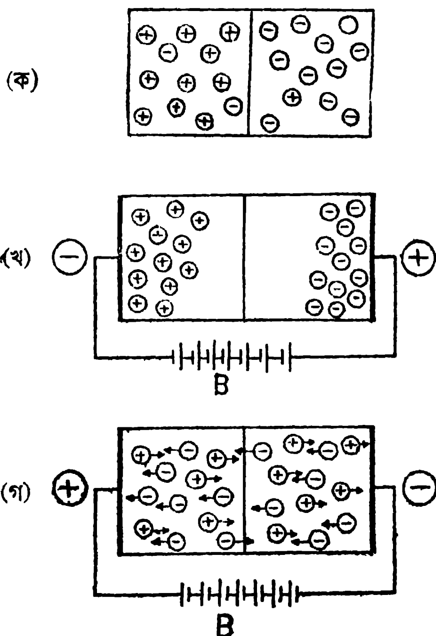
জারমেনিয়াম, সিলিকন এই দুটি আধা-পরিবাহী (semi-conductor) পদার্থে কিছু অন্য পরমাণু ভেজাল ঢুকিয়ে (dope) দিলে তাদের ধর্মের যে পরিবর্তন হয় তাতে ডায়োড বা ট্রায়োডের মত কাজ পাওয়া যায়।

সিলিকন ও জারমেনিয়াম পরমাণু চতুর্যোজী (tetravalent)। বোরন বা গ্যালিয়ামের মত ত্রিযোজী পরমাণু ঢুকিয়ে দিলে—এদের চারটি যোজ্যতা বাহুর একটি

খালি থাকে, আর তিনটি বোরন বা গ্যালিয়াম পরমাণুর তিনটি বাহুর সঙ্গে বাঁধা পড়ে। খালি বাহু একটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করতে পারে ও পেছনে পজিটিভ-ধর্মী ছিদ্রের (hole) সৃষ্টি করে। এই ভেজাল পরমাণুকে গ্রাহী (acceptor) ও ভেজাল ক্রস্ট্যালকে p শ্রেণীর সেমি-কণ্ডাক্টর বলে।

আর্সেনিক অথবা অ্যান্টিমনির মত পঞ্চযোজী পরমাণু ঢুকিয়ে দেখা যায় তাদের একটি ইলেক্ট্রন আল্‌গা থেকে যায়, বাকী চারটি সিলিকন বা জারমেনিয়ামের চারটি বাহুতে বাঁধা পড়ে। এই সব পঞ্চযোজী পরমাণুকে দানী (donor) ও ভেজাল ক্রস্ট্যালকে n শ্রেণীর সেমি-কণ্ডাক্টর বলে।

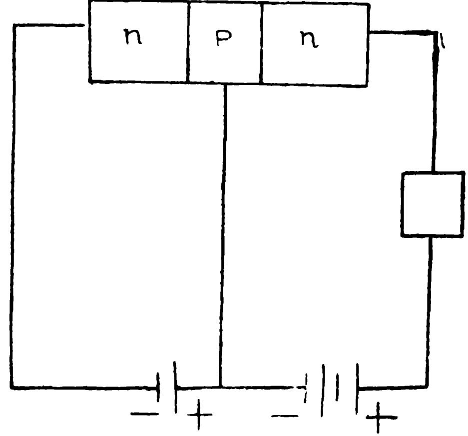
1.35 চিত্রে n ও p দুটি সেমি-কণ্ডাক্টর জোড়া দিয়ে ডায়োডের কাজ কিভাবে চলে তা দেখানো হয়েছে। (খ)চিত্রে দেখা যাবে যে, বিদ্যুৎ কোষের পজিটিভ দ্বার n ক্রস্ট্যালের ইলেক্ট্রনকে আকর্ষণ করে ও p ক্রস্ট্যালের ছিদ্রগুলিকে কোষের নেগেটিভদ্বার আকর্ষণ করে। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রায় চলে না। (গ) চিত্রে দেখা যাবে যে, বিদ্যুৎকোষের মেরু পরিবর্তন করলে ইলেক্ট্রন ও ছিদ্র পরস্পরের দিকে ছুটে গিয়ে দুই ক্রস্ট্যালের সংযোগস্থলে মিলে উদাসীন অবস্থায় আসে। যে ক্রস্ট্যাল ইলেক্ট্রন হারাল, প্রযুক্ত বিদ্যুৎ কোষ অন্য শক্তিস্তর থেকে তাকে ইলেক্ট্রন যোগান দেয়, p ক্রস্ট্যালেও নতুন ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে। এই প্রবাহ একমুখী, তাই ভাল্‌ব ছাড়াই দুটি ক্রস্ট্যাল জোড়া দিয়ে পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহকে একমুখী করার কাজে ডায়োডের মত ব্যবহার করা হয়।



চিত্র 1.35 : (ক) বিদ্যুৎক্ষেত্র ছাড়া n ও p ক্রস্ট্যালে ইলেক্ট্রন ও ছিদ্রের যাতায়াত। (খ) বিশেষ দিকের বিদ্যুৎস্রোতে n ও pর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে না। (গ) (খ)-এর বিপরীত বিদ্যুৎস্রোতে বিদ্যুতের প্রবাহ। B—ব্যাটারী।

জন বার্ডিন, ওয়াল্‌টার ব্রাটাইন ও উইলিয়াম সক্‌লি ট্রায়োডধর্মী ট্রানজিস্টারের আবিষ্কার করেন।

1.36 চিত্রে দুটি *n* ক্রিস্ট্যালের মাঝখানে একটি পাতলা *p* ক্রিস্ট্যাল জুড়ে যে ট্রানজিস্টর হয়, তাতে ট্রায়োডের কাজ দেখানো হয়েছে। বিদ্যুৎকোষ দিয়ে বাঁদিকের অংশে পরিবহন চলে কিন্তু ডানদিকের অংশে পরিবহন হয় না। *p* ক্রিস্ট্যাল এত পাতলা যে তার ভেতর দিয়ে বাঁদিকের বিদ্যুৎস্রোত চলে যায়—এদিকে বিভব কম থাকলেও প্রবাহ চলে। ডানদিকে বিভব বেশী বলে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ এখানে বিবর্ধিত হয়। ভাল্‌ভের পরিবর্তে ট্রায়োডের কাজে ট্রানজিস্টর ব্যবহার ইলেক্‌ট্রনিক্‌সে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।



চিত্র 1.36 : *n p n* সংযুক্ত ট্রানজিস্টর ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎবর্তনী।

আলোর সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরি প্রভৃতি নানা প্রয়োগে সেমি-কণ্ডাক্টর ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ প্রযুক্তিবিজ্ঞানে এক বিস্ময়কর সংযোজন।

ইলেক্‌ট্রনিক কম্প্যুটার

ভন নিউম্যান্ মানুষের মস্তিষ্ককোষের আদর্শে ইলেক্‌ট্রনিক কম্প্যুটার বা স্বয়ংক্রিয় গণকযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। মস্তিষ্ককোষের যেমন শুধু দুটি অবস্থা থাকে উত্তেজিত অথবা শান্ত, তেমনি ইলেক্‌ট্রনিক ভাল্‌ভের অন্ (on) ও অফ্ (off) এই দুটি অবস্থা কাজে লাগিয়ে গণক যন্ত্র তৈরি করা হয়। প্রাচীন যান্ত্রিক গণকযন্ত্রে চাকার দশটি দাঁতের সাহায্যে 10-এর স্কেলে গণনা করা হত, কিন্তু ইলেক্‌ট্রনিক ভাল্‌ভের অন্ ও অফ্ দুটি অবস্থা কাজে লাগাতে 2-এর স্কেলে গণনা করা হয়।

377 সংখ্যাটির কথা ধরা যাক্—10-এর স্কেলে এই সংখ্যাটি লেখা যায়

$$3 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 7 \times 10^0 = 300 + 30 + 7 = 337$$

2-এর স্কেলে (binary) এই সংখ্যাটি লেখা যায়

101010001

অর্থাৎ $1 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 256 + 64 + 16 + 1 = 337$

কম্প্যুটারে সারি সারি ইলেকট্রনিক ভালভ থাকে—অন্ ও অফ্ এই দুটি সংকেতের সাহায্যে পুরো গণনা তা যত বড়ই হোক্ না কেন করা যেতে পারে।

বিশেষ ভাল্ভের সাহায্যে এই সব গণনার ফলাফল কম্প্যুটার সঞ্চয়ও করে রাখতে পারে। বাস্তবিক মানুষের অজস্র মস্তিষ্ক কোষের (neuron) কাজ অধিকাংশই কম্প্যুটারে করা চলে। লস্ এলামস্ ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীরা কম্প্যুটারকে দাবা খেলোয়াড় হিসাবেও ব্যবহার করেছেন।

কী পরিমাণ তথ্য কম্প্যুটার সঞ্চয় করে রাখতে পারে—তার একটা আভাস দেওয়া যেতে পারে। 0, ও 1 এই দুটি সংখ্যায় আমরা চারটি তথ্য পেতে পারি 00, 01, 10, ও 11—এরকম তিনটি সংখ্যা দিয়ে 8টি, চার সংখ্যার 16টি অর্থাৎ n সংখ্যা দিয়ে 2^n তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। একটি দশমিক সংখ্যা 0, 1, ···, 9 চারটি দুইয়ের স্কেলের সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। তাই দ্ব্যাত্মক সংখ্যাকে তথ্যের একক বিট (bit) ধরা হয়। প্রত্যেকটিতে 5টি দশমিক সংখ্যা রয়েছে এরকম 1000টি সংখ্যা থাকলে তা 20000 বিট্-এর সাহায্যে অর্থাৎ অন্ ও অফ্ সংকেতে কম্প্যুটারে সঞ্চয় করে রাখা যায়। ইংরেজী ভাষার একটি বইয়ের এক ঘনফুট ছাপার অক্ষর 10^8 বিটের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। একটি বড় লাইব্রেরীর সমস্ত বই-এর তথ্য 10^{12} বিট্-এর সাহায্যে সঞ্চয় করে রাখা যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানুষের মস্তিষ্কে 10^{10} সংখ্যক কোষ (neuron) আছে তাতে ঐ সংখ্যক তথ্য সঞ্চিত থাকতে পারে। কম্প্যুটারে সঞ্চিত তথ্য প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়। আধুনিক গণকযন্ত্রে স্মরণশক্তি (memory), সঞ্চয় ক্ষমতার মান এত উন্নত হয়েছে যে, এদের সাহায্যে একসঙ্গে সেকেণ্ডে প্রায় 30 লক্ষ তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারা যায়, 100টি অজানা সংখ্যার সমীকরণ সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ে সমাধান হয়। বড় বড় গণকযন্ত্রে সারি সারি প্রায় 5 লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে। এই যন্ত্রই বোধ হয় ইলেকট্রনিক্সের শেষ কথা নয়। আরও শক্তিমান যন্ত্র তৈরি করার জন্য গবেষণা চলছে—তা দিয়ে হয়ত মানুষের মস্তিষ্কের সব কাজই সমাধা করা যাবে।

ইলেকট্রন ও পদার্থের চুম্বকত্ব, অতিপরিবাহিতা ও অতিবহমানতা

কঠিন পদার্থে চুম্বকত্ব ধর্ম অনুযায়ী তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় : অপচুম্বকত্ব (dia-magnetism), উপচুম্বকত্ব (para-magnetism) ও অয়শ্চুম্বকত্ব (ferro-magnetism)। চুম্বকক্ষেত্রের আবেশে অপচুম্বকীয় পদার্থ অতি অল্প পরিমাণ চুম্বকত্ব পায় ও ঐ চুম্বকত্ব আবেশকারী চুম্বকের মেরুর বিপরীত হয়। আদর্শ অপচুম্বকীয় পদার্থে চুম্বকত্বের আবেশ না হওয়াই উচিত, তবে এরূপ আদর্শ পদার্থ নাই বললেই চলে। ঐ সব পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি আবেশকারী চুম্বকের ক্রিয়ায় যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে লেনজের নিয়ম (Lenz's Law) অনুযায়ী তা আবেশকারী চুম্বকের আবেশ নষ্ট করে দেয়।

উপচুম্বকীয় পদার্থে আবিষ্ট চুম্বকক্ষেত্রের দিক আবেশকারী চুম্বকের অভিমুখে ঘটে—ফলে তার চুম্বকত্ব আবেশকারী চুম্বক থেকে বেশী হয়। এই সব পদার্থের পরমাণু ছোট ছোট চুম্বকের মত আচরণ করে।

অয়শ্চুম্বকীয় পদার্থের পরমাণুতে উপচুম্বকীয় পদার্থের পরমাণুর তুলনায় ইলেকট্রনের স্পিন সমান্তরাল থাকে। ফলে এই সব পদার্থে শক্তিশালী চুম্বকত্ব উৎপাদন করা যায়। লোহা প্রভৃতি অল্প কয়েকটি পদার্থে অয়শ্চুম্বকত্ব দেখা যায়।

নীচু তাপমাত্রায় লোহা ছাড়া কিছু পদার্থ আছে যাদের অয়শ্চুম্বকীয় ধর্ম প্রাপ্তি হয়। নীচু তাপমাত্রায় পদার্থের পরমাণুর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি যখন স্তিমিত হয়ে আসে সেই অবস্থায় কয়েকটি পদার্থ অতিপরিবাহী (super conductor) হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ প্রবাহের আবেশে যে চুম্বকত্বের সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ অতিপরিবাহী পদার্থের উচ্চ-প্রবাহ পরিবহণের ক্ষমতার সাহায্যে বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। নীচু তাপমাত্রায় অন্ততঃ একটি পদার্থ তরল হিলিয়াম অতিবহমানতা (superfluidity) অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

1911 খ্রীষ্টাব্দে ক্যামারলিঙ ওনস্ তাঁর গবেষণাগারে তাপমাত্রার সঙ্গে পারদের রোধ ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা করে দেখেন যে, তাপমাত্রা কমলে পারদের রোধশক্তি কমে এবং 4·2K তাপমাত্রায় এই পদার্থের রোধ শূন্যমানে দাঁড়ায়। এই তাপমাত্রায় প্রায় ·001°C তাপমাত্রার ব্যবধানে রোধ প্রায় 10^{-11} গুণ কমে যায়। অতিপরিবাহী পদার্থের এই আবিষ্কারের পর নীচু তাপমাত্রায় আরও কয়েকটি অতি-পরিবাহী পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। টেক্নেসিয়াম 11·2K ও সীসা সর্বোচ্চ 7·2K তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী হয়ে পড়ে। তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতি সাধারণ

পরিবাহী পদার্থ কখনই অতিপরিবাহী হয় না, অন্ততঃ যে নীচু তাপমাত্রায় তা ঘটতে পারে তা উৎপাদন করা সম্ভব নয়। অতিপরিবাহী পদার্থে রোধহীনতার জন্য যত বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়ান হোক্ না কেন তাতে তার তাপ বাড়ে না।

অতিপরিবাহী পদার্থের একটি কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎবিভব প্রয়োগ করে যদি একবার বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দেওয়া যায়, তবে বিভব তুলে নিলেও সেই প্রবাহ চলতে থাকে। অতিপরিবাহী সীসার কুণ্ডলী চুম্বকক্ষেত্রে রাখলে তাতে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ আবেশ হয়, চুম্বকক্ষেত্র তুলে নেওয়ার পরও এমনকি বৎসরাধিক কাল এই প্রবাহ চলতে থাকে। অতিপরিবাহী অবস্থায় পদার্থ আদর্শ ডায়াচুম্বকত্ব ধর্ম প্রাপ্ত হয়—তার নিজস্ব চুম্বকক্ষেত্র থাকে না। চুম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করলে পদার্থের অতিপরিবাহিতা লুপ্ত হয়। টিন 3·73K, অ্যালুমিনিয়াম 7·20K, ইউরেনিয়াম 0·8K, টাইটেনিয়াম 0·53K, হাফনিয়াম 0·35K তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী হয়। সাধারণতঃ তরল হিলিয়ামের তাপমাত্রায় পদার্থগুলি অতিপরিবাহী হয়। তরল হাইড্রোজেনের তাপমাত্রায় (21K) নাইওবিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও জারমেনিয়াম মিশ্রধাতু (alloy) অতিপরিবাহী হয়। এই একটি মাত্র উদাহরণ ছাড়া আর সব পদার্থের বেলায় তরল হিলিয়াম প্রয়োজন।

অতিপরিবাহিতা ধর্মের সাহায্যে তড়িৎচুম্বক তৈয়ার করার প্রধান অসুবিধা হল চুম্বকের ক্রিয়ায় এই ধর্ম নষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও টিন, নাইওবিয়াম মিশ্রধাতুর তার তৈরি করে 18K তাপমাত্রায় এই তারের অতিপরিবাহী কুণ্ডলীর সাহায্যে প্রায় 250000 গউস্ চুম্বকক্ষেত্র উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। ভ্যানাডিয়াম ও গ্যালিয়ামের মিশ্রধাতুর সাহায্যে আরও মজবুত অতিপরিবাহী তারের কুণ্ডলী তৈরি করা যায়। অতিপরিবাহী পদার্থ দিয়ে এখন প্রায় 5 লক্ষ গউস্ চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

অতি নীচু তাপমাত্রায় হিলিয়ামের অতিবহমানতা (superfluidity) ধর্ম আর একটি বিরল ঘটনা। পরমশূন্য তাপমাত্রায় ও তরল হিলিয়াম কঠিন পদার্থে পরিণত হয় না। 1935 খ্রীষ্টাব্দে কীসম ও তাঁর ভগ্নী আবিষ্কার করেন যে 2·2K তাপমাত্রার নীচে তরল হিলিয়াম বরং আদর্শ তাপপরিবাহীতে পরিণত হয়। এই পরিবাহিতা তামার চেয়ে অন্ততঃ 200 গুণ বেশী এবং তার গতি বায়ব পদার্থের গতিকেও ছাড়িয়ে যায়। যে সব ছিদ্রে বায়বপদার্থ চলাচল করতে পারে না 2·2K নীচে তাপমাত্রায় হিলিয়াম সেখানে অনায়াসে চলে যেতে পারে। 2·2K তাপমাত্রার নীচে ও উপরে তরল হিলিয়ামের আচরণের পার্থক্য এত বেশী যে ঐ তাপমাত্রাকে ল্যামডা বিন্দু (λ-point) নামে অভিহিত করে 2·2K এর নীচের তাপমাত্রায়

হিলিয়ামকে He 11 ও উঁচু তাপমাত্রার হিলিয়ামকে He 1 বলা হয়। He 11 স্বভাবতঃই উঁচু তাপমাত্রার দিকে অনায়াসে ছুটে যায়।

হিলিয়ামের ভরসংখ্যা 4। এর সঙ্গে 3 সংখ্যার সামান্য যে আইসোটোপ থাকে তা পৃথক্ করে দেখা যায় যে 0·25K তাপমাত্রায়ও তা He 11-এর মত আচরণ করে না। তার কারণ ^{3}He এর স্পিন ^{4}He এর মত যুগ্মসংখ্যক নয়। ইলেকট্রনের স্পিনের সঙ্গে অতিবহমানতা ধর্মের এই সম্পর্ক আবিষ্কার করেন এফ্. লণ্ডন।

অতিবহমানতা ও অতিপরিবাহিতার একটি সাধারণ ধর্ম হল যথাক্রমে প্রথমটির প্রবাহ ও দ্বিতীয়টির বিদ্যুৎপ্রবাহ পুরোপুরি ঘর্ষণহীন(frictionless)। একই পদার্থের আইসোটোপগুলি একই তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী হয় না—ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। পরমাণু বা তার পজিটিভ আয়ন এজন্য দায়ী। ফ্রলিক্, বার্ডিন, কুপার ও স্রিফার দেখান যে ক্রিস্ট্যালের আয়নের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় ইলেকট্রন আকৃষ্ট হয়। বিপরীত স্পিনের ইলেকট্রন এমনভাবে জুড়ি বাঁধে যা 0K তাপমাত্রায় অসাধারণ ধর্মের সৃষ্টি করে। এরকম জুড়ি থেকেই অতিবহমান হিলিয়াম সবচেয়ে নীচু শক্তিস্তরে উৎপন্ন হয়। যেসব ধাতুতে এরকম জুড়ি বাঁধার সম্ভাবনা নাই, নীচু তাপমাত্রায় তাদের নীচের শক্তিস্তরে নামিয়েও অতিপরিবাহী করা যায় না।

2

বিকিরণ ও জড়জগৎ

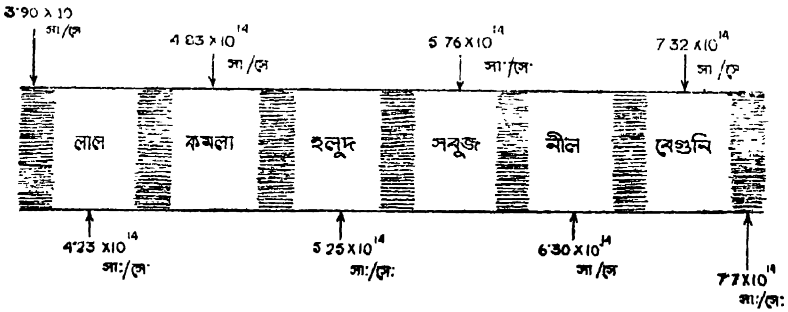
যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা

স্ফুলিঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ

সুসঙ্গত বিকিরণ : মেসার ও লেসার

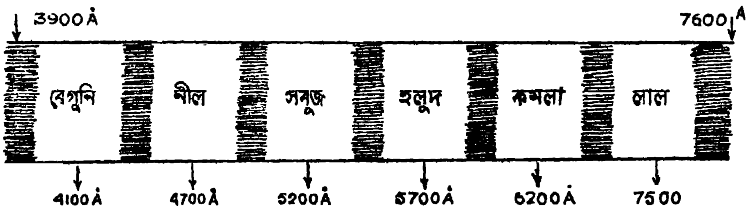
শক্তির বিকিরণ

সৃষ্টির আদি থেকেই আলোর সঙ্গে মানুষের পরিচয়। প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য পৃথিবীতে আলো পাঠায়, আরো দূরের জ্যোতিষ্কের আলোও আমরা দেখতে পাই। এই সব আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে বহু বাধা অতিক্রম করে। কাছের একটি প্রদীপ থেকেও আমরা আলো পাই। সব আলোই প্রায় সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার বেগে তার উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের সাদা আলোতে রয়েছে কয়েকটি রঙের মিশ্রণ। তাদের একটি লাল—তরঙ্গ হিসেবে এই লাল আলোর



চিত্র 2.1 : দৃশ্য আলোর বর্ণালীর বিভিন্ন কম্পাংক বা কাঁপনসংখ্যার (সাইক্‌ল্‌স্ / সেকেণ্ড) আলো। বেগুনি ও নীলের মাঝখানে গাঢ়নীল (indigo) একটি রং ধরা যায়—চিত্রে তা দেখান হয়নি।

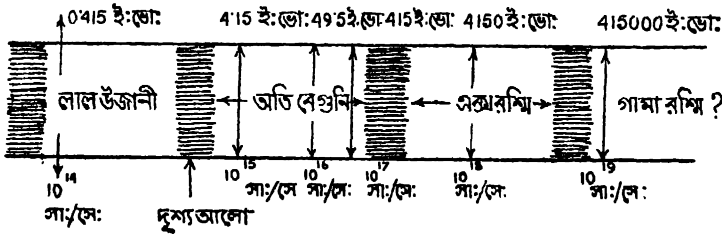
দৈর্ঘ্য ·000071 সেন্টিমিটার আর কাঁপন সংখ্যা $4{\cdot}23 \times 10^{14}$ সাইক্‌ল্‌স্/সেকেণ্ড,—অর্থাৎ এই আলো সেকেণ্ডে $4{\cdot}23 \times 10^{14}$ বার পূর্ণ তরঙ্গ হিসেবে কাঁপে। ক্রমশঃ



চিত্র 2.2 : 2.1 চিত্রের বর্ণালীর দৃশ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

ভায়োলেট আলোর দিকে যেমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে তেমনি কাঁপনসংখ্যা হয় বেশী। দৈর্ঘ্যের পরিমাপে দৃশ্য আলোর ব্যাপ্তি প্রায় 4000 অ্যাংস্ট্রম বা Å(1Å = 10^{-8}

সে: মি:) সবচেয়ে ছোট ভায়োলেট বা বেগুনি 3900Å আর সবচেয়ে বড়, লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 7600Å । এ দুয়ের মাঝখানে পড়ে অন্য রঙের সব আলো। তাদের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্যের সীমা গড়ে প্রায় 600Å এর মধ্যে—কাঁপনসংখ্যার পার্থক্য লাল ও বেগুনির প্রায় সেকেণ্ডে $3{\cdot}7 \times 10^{14}$ সাইক্‌ল্‌স্ । লাল আলোর চেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ চোখে দেখা যায় না—কিন্তু এইসব লাল উজানী তরঙ্গের অনুভূতি পাওয়া যায় উত্তাপে। এই অংশের কাঁপনসংখ্যার ব্যাপ্তি প্রায় সেকেণ্ডে $4{\cdot}4 \times 10^{14}$ সাইক্‌ল্‌স্ । বেগুনির চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ অতিবেগুনি ও অদৃশ্য। ফোটো-



চিত্র 2.3 : বর্ণালীর কম্পাংক অনুসারী শক্তিমাত্রা (ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট)।

গ্রাফিক প্লেটের ওপর এর ক্রিয়া দেখা যায়। ইলেক্‌ট্রিক আর্ক বা পারদ বাষ্পের আলো এই বিকিরণের উৎস। লাল উজানী বিকিরণের চেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এক মিটার পর্যন্ত মাইক্রোওয়েভ বা অণুতরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। তার চেয়েও বড় তরঙ্গ হল বেতার তরঙ্গ। এই সব তরঙ্গের সাহায্যে রেডিও এবং টেলিভিশনের কাজ চলে। অতিবেগুনির চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্যের বা বেশী কাঁপনসংখ্যার এক্স রশ্মি, গামা রশ্মির দিকে ক্রমশঃ শক্তির মাত্রাও বাড়তে থাকে। আমরা যে বিদ্যুৎ নিয়তই ব্যবহার করি তার কাঁপনসংখ্যা সেকেণ্ডে পঞ্চাশ সাইক্‌ল্‌স্ অথবা দৈর্ঘ্যে প্রায় 3720 মাইল—তার শক্তির মাত্রাও অতি অল্প।

বিকিরণের ধর্ম

দৃশ্য ও অদৃশ্য সব বিকিরণই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন রূপ। তাদের যে সব সাধারণ ধর্ম আছে তা হল (1) সব বিকিরণই সেকেণ্ডে 3×10^{8} মিটার বেগে চলে। (2) কাঁপনসংখ্যা বা দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিকিরণের যতই শ্রেণীবিভাগ করা যাক্ না কেন এদের মধ্যে কোন বিরতি নেই ; অর্থাৎ দৃশ্য আলোর পর একটি বিশেষ কাঁপনসংখ্যার বিকিরণকে অতিবেগুনি বলা হলেও এ দুয়ের মধ্যে কোন ছেদ নাই। (3) বিকিরণের ধর্ম পদার্থ ও পরিবেশ ভেদে পরিবর্তনশীল নয়। নীল্‌স্ বোরের ভাষায় বিকিরণ দূরবর্তী দুই পদার্থের মধ্যে শক্তির পরিবহন মাত্র। শক্তি

হল কাজ করার ক্ষমতা—তাই বিকিরণ ও শক্তি অভেদ্য। (4) বিকিরণ পদার্থ নিরপেক্ষ ও শক্তির পরিবাহক—আর তা চলে আলোর গতিবেগে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মতে পদার্থের গতিবেগ কখনই বিকিরণের সমান বা বেশী হতে পারে না। (5) বিকিরণের উৎস হল পদার্থ। পদার্থ শক্তি হারায় বলেই বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি পাওয়া যায়। (6) বিকিরণ পদার্থের মধ্যে যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তখনই পদার্থে বাড়তি শক্তিটুকু সঞ্চারিত হয়। (7) সংস্পর্শ ছাড়া বিকিরণই হল শক্তি পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম।

যে কোন পদার্থই যদি সমর্থ হয়, তবে তাতে বিকিরণ ধরা পড়বে। আমাদের চোখ সে রকম একটি বিকিরণ গ্রাহক যন্ত্র। দৃশ্য আলো ছাড়া অন্য বিকিরণ গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই।

বেতারবহ বিকিরণের স্বরূপ

গত শতাব্দীতে অণুতরঙ্গ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। এখন বাইরের জগৎ থেকে এই বিকিরণ ধরা পড়ছে। সাধারণ যে বেতার তরঙ্গ সংবাদ আদান-প্রদানে ব্যবহার করা হয় তার কাঁপন সংখ্যা সেকেণ্ডে 3×10^{11} সাইক্‌ল্‌স্। বেশী কাঁপনসংখ্যার অণুতরঙ্গ বা দৃশ্য আলো ব্যবহার করা যায় না তার কারণ এসব তরঙ্গ শক্তিমান ও সুসঙ্গত হয় না। বেতার তরঙ্গের যে সব ধর্ম থাকা প্রয়োজন তা হল (1) কাঁপন সংখ্যানুযায়ী এই তরঙ্গের শক্তি 10-15 কিলোওয়াট পর্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। (2) সংবাদ আদান-প্রদানের প্রয়োজনে বেতার তরঙ্গ হবে সুসম, অবিরাম ও পরিবর্তনহীন। (2) সংবাদের আদান-প্রদানে সমস্ত খুঁটিনাটি পরিবহন সম্ভব করতে হলে প্রেরক যন্ত্রের মূল কাঁপন সংখ্যাকে কেন্দ্র করে ঐ সংখ্যার কিছুটা ব্যাপ্তি থাকা প্রয়োজন। যেমন মূল কাঁপনসংখ্যা সেকেণ্ডে 6×10^{7} সাইক্‌ল্‌স হলে তার ব্যাপ্তি হওয়া প্রয়োজন $5{\cdot}54 \times 10^{7}$ থেকে $6{\cdot}5 \times 10^{7}$ সাইক্‌ল্‌স। টেলিভিশনের বেলায় এই ব্যাপ্তি আরও বেশী হতে হবে। ফলে পৃথিবীর অসংখ্য বেতার প্রেরক যন্ত্রের জন্য যে সব আলাদা কাঁপনসংখ্যার তরঙ্গ দরকার বর্তমান বেতার তরঙ্গের পরিধি 3×10^{11} কাঁপনসংখ্যায় তা কুলিয়ে ওঠবে না। দৃশ্য আলো ব্যবহার সম্ভব হলে 423×10^{12} থেকে 483×10^{12} কাঁপনসংখ্যার মধ্যে প্রায় দেড় কোটি নূতন টেলিভিশন চ্যানেল পাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু সাধারণ দৃশ্য আলোতে কয়েকটি অসুবিধা আছে। সূর্যের কথাই ধরা যাক্। সূর্যের আলো থেকে একটি বিশেষ কাঁপনসংখ্যার ধরা যাক্ 625×10^{12} সাইক্‌ল্‌স ফিল্টার করে নেওয়া গেল কিন্তু তাতে ঐ আলোর শক্তি এত কমে যাবে যে, সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে লাগানো যাবে না। সূর্যপৃষ্ঠের দশ বর্গমিটার আয়তনের শক্তি এভাবে সংগ্রহ করলেও

এক ওয়াট হবে কিনা সন্দেহ। একটি টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্রের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা অন্ততঃ সূর্যপৃষ্ঠের এক লক্ষ বর্গমিটার আয়তনের উৎপাদিত শক্তির সমান। সূর্যের বিকিরণ বিপুল হলেও পৃথিবীতে তা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তা বেতার প্রেরণের ক্ষমতা রাখে না।

যে কোন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় আলো তৈরি করে নিলেই যে তা বেতারবহ হবে তাও নয়। তার কারণ সাধারণ উৎসের আলো সুসঙ্গত (coherent) হয় না। বিকিরণের সব তরঙ্গের দিক্, কাঁপনসংখ্যা, দশা ও সমবর্তন হুবহু এক হলেই তবে তা সুসঙ্গত হবে ও তখনই তাকে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে লাগান যাবে।

ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভে ইলেকট্রনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ বেতার তরঙ্গ উৎপাদন করা হয়। অণুতরঙ্গের জন্যও বিশেষ ধরনের ভাল্‌ভ যেমন ম্যাগ্‌নেট্রন, ক্লাইস্ট্রন ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু 1940 খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আরো ছোট অণু-তরঙ্গ তৈরির চেষ্টা সফল হচ্ছিল না—তার কারণ এজন্য ভাল্‌ভের আকার ছোট করতে হয়, তাতে বিকিরণের শক্তি কমে যাবে। তা দিয়ে বেতারবহন চলবে না। আলোর বেলায়ও তাই। ফলে কম কাঁপনসংখ্যার বেতার তরঙ্গ দিয়েই সংবাদ আদান-প্রদান চলে—কারণ এ সব বিকিরণ সুসঙ্গত ও শক্তিশালী।

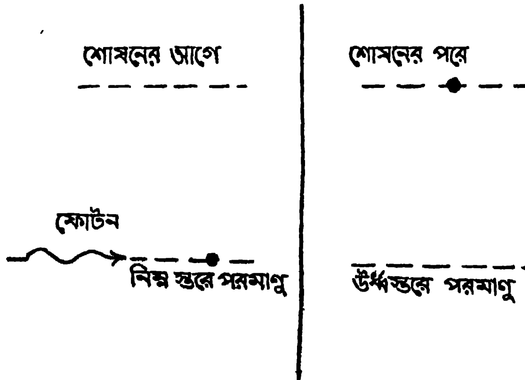
কোয়ান্টামবাদ ও বিকিরণ

মেসার (MASER : Microwave Amplification of Stimulated Emission of Radiation) ও লেসার (LASER : Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation) আবিষ্কারের দ্বারা যথাক্রমে সুসঙ্গত অণু-তরঙ্গ ও আলোর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এই আবিষ্কার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এক নবযুগের সূচনা করেছে।

উৎস থেকে দূরত্বের বর্গ অনুযায়ী আলোর তীব্রতা কমে। এই তীব্রতার পরিমাপ করলে দেখা যাবে যে একটি বিশেষ কাঁপন সংখ্যার আলো এক মিটার দূরে এক বর্গ সেন্টিমিটার আয়তনে যত তীব্র ছিল, দশ মিটার দূরে তার একশো ভাগের এক ভাগে হ্রাস পেয়েছে। একশো মিটার দূরে হয়েছে $\frac{1}{10000}$। এই তীব্রতা কমে কোথায় পৌঁছুবে? কোয়ান্টামবাদের মতে এই আলোর কাঁপনসংখ্যা যদি ν হয় তবে তার একটি কোয়ান্টামের শক্তি হল $E=h\times\nu$—আর এই শক্তির কম তীব্রতায় ঐ আলো কখনই হ্রাস পাবে না। হয় এক, দুই বা অধিক পূর্ণ সংখ্যক কোয়ান্টাম পাওয়া যাবে, ভগ্নাংশ কখনই নয়। কোয়ান্টাম হল শক্তির অবিভাজ্য পরমাণুর মত—দৃশ্য আলোর বেলায় তাকে ফোটনও বলা হয়। ν এর মান থেকে

তার শক্তি ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। একটি এক্স রশ্মি কোয়াণ্টাম লাল আলোর চেয়ে প্রায় লক্ষ গুণ শক্তিশালী।

ইলেকট্রনের মত কোয়াণ্টাম বা ফোটনের কোন আধান নেই। ইলেকট্রনের শক্তি তার গতিবেগের উপর নির্ভর করে কিন্তু বিকিরণের গতিবেগ সর্বদাই আলোর গতিবেগের সমান ও তার কোয়াণ্টার শক্তি কাঁপনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। শক্তি ও পদার্থের তুল্যমূল্যতার সূত্র $E=mC^2$ ও কোয়াণ্টামবাদের সূত্র $E=h\nu$ থেকে কোয়াণ্টাম বা ফোটনের ভর পাওয়া যায় $m=\frac{h\nu}{C^2}$। তার ভরবেগ ও কাঁপন সংখ্যার অনুপাতী। ফোটনের আঘাতে পদার্থে বিকিরণের শোষণ হয় ও পদার্থ থেকে বিকিরণ ঘটে। পদার্থের পরমাণু যখন একটি বিশেষ কাঁপন সংখ্যার কোয়াণ্টাম শোষণ করে, তখন তার শক্তিটুকুর পরিমাণ নিয়েই পরমাণুটি উত্তেজিত হয়—তার কম বা বেশী নয়—আবার ঐ শক্তির কোয়াণ্টামই বিকিরণ করে। একটি বিশেষ শক্তির কোয়াণ্টাম কোন পরমাণু থেকে নির্গত হলে বুঝতে হবে যে সেই পরমাণুতে এমন দুটি শক্তি স্তর আছে যাদের তফাত নির্গত কোয়াণ্টামের শক্তির সমান। শোষণের বেলায় এদের নীচের স্তর থেকে ইলেকট্রন উপরের স্তরে উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে পড়ে। এই উত্তেজনা আসে আপতিত কোয়াণ্টামের শক্তির বিলোপে। আবার ইলেকট্রন নীচের শক্তি স্তরে নামলে এই উত্তেজনার প্রশমন হয় ও শক্তিটুকু বিকিরণের কোয়াণ্টামের আকারে পরমাণুর বাইরে নির্গত হয়। ইলেকট্রনের এরকম



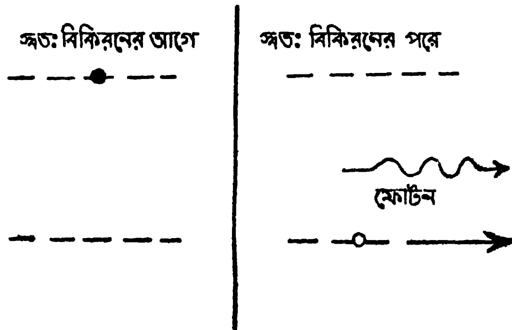
চিত্র 2.4: ফোটনের শোষণ ও উত্তেজিত পরমাণু।

ওঠানামা ধাপে ধাপে ওঠানামার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সিঁড়ির প্রথম থেকে ধাপে যাওয়া যায় মাঝামাঝি কোথাও নয়। এক থেকে তিন নম্বরেও

হতে পারে—কিন্তু পূর্ণসংখ্যায় হওয়া চাই। আবার সব পূর্ণসংখ্যাও নিয়মমাফিক নয়—এই ওঠানামা বিশেষ নির্বাচনী নিয়ম (selection rule) মেনে চলে। সাম্যাবস্থার অণু বা পরমাণুতে ইলেক্‌ট্রনগুলি তাদের নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে থাকে। বিকিরণের আঘাতেই তাতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনার—আসে অস্থির অবস্থা।

পদার্থ ও বিকিরণের সংঘাতে কি ঘটে

কৃষ্ণদেহ বিকিরণে দেখা যায় যে, তাপীয় সাম্যাবস্থায় পদার্থ একটি কম্পনসংখ্যার যতগুলি ফোটন শোষণ করে, ঠিক ততগুলিই বিকিরণ করে। 1916-17 খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইনের শোষণ বিকিরণ সম্পর্কিত মতবাদ প্রকাশ পাবার আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, ফোটন পদার্থে শোষিত হওয়ার পর, উত্তেজিত পরমাণু শুধু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ফোটন বিকিরণ করে। স্বতঃ বিকিরণের (spontaneous emission) স্বরূপ হল, একশোটি শোষিত ফোটনের পর পঞ্চাশটির স্বতঃবিকিরণের সময়কে তার অর্ধজীবন কাল (half life) বলে। এই সময় পরমাণুর শক্তিস্তরের উপর নির্ভর করে। কোন প্রতিবেশী বিকিরণের সঙ্গেও তার কোন সম্পর্ক নেই।



চিত্র 2.5 : স্বতঃ বিকিরণের ধর্ম।

পরমাণুতে তার ইলেক্‌ট্রনের বিভিন্ন শক্তিস্তরে ওঠানামা থেকে শোষণ বিকিরণ সম্ভব হয়। স্বতঃ বিকিরণ হল পরমাণুর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। অর্ধজীবনকালে কোন্ পরমাণু বিকিরণ করবে না করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অর্ধজীবনকাল যত কম সময়ই হোক্ না কেন, উঁচু কাঁপনসংখ্যার বিকিরণে একটি তরঙ্গ আর একটি থেকে এগিয়ে বা পেছিয়ে থাকবে—ফলে বিকিরণ সুসঙ্গত হবে না। আইনস্টাইনের মতবাদে জানা গেল যে, স্বতঃ বিকিরণ ছাড়া আর এক ধরনের বিকিরণ আছে তা উত্তেজিত বা আবিষ্ট বিকিরণ (induced emission)। কৃষ্ণদেহ বিকিরণে উচ্চ

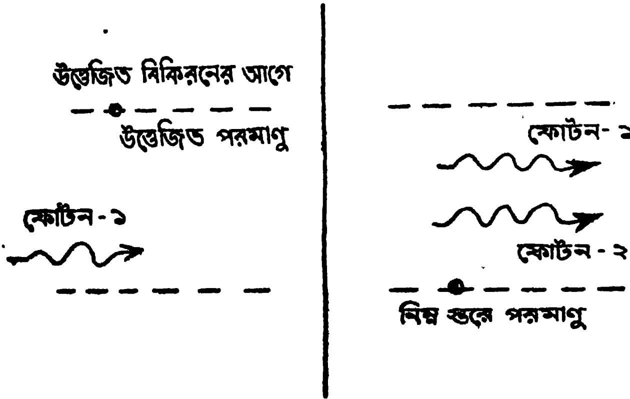
তাপমাত্রায় শোষিত ফোটনের অল্পই স্বতঃ বিকিরণ হয়—বাকীগুলি বিশেষতঃ নিম্নতর কম্পন সংখ্যার বিকিরণ সম্ভব হয় উত্তেজিত বিকিরণের দ্বারা।

পদার্থের সঙ্গে ফোটনের সংঘাতের চিত্রটি এইরকম ঃ

1. **শোষণ ঃ** উপযুক্ত ফোটন পরমাণুর সঙ্গে সংঘাতে শোষিত হয়। তখন ইলেক্‌ট্রনের সাহায্যে ফোটনের শক্তি পরমাণুর একস্তর থেকে অন্যস্তরে বাহিত হয়। পরমাণু ও ফোটনের প্রকৃতি থেকে এই শোষণের সম্ভাবনা যদি একশো ভাগের একভাগ হয় তবে দশলক্ষ ফোটনের দশহাজার শোষিত হয়ে পরমাণুটি উত্তেজিত অবস্থায় আসবে।

2. **স্বতঃ বিকিরণ ঃ** উত্তেজিত পরমাণু থেকে শোষিত ফোটনের বিকিরণ হ'বে। ওপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে ইলেক্‌ট্রন নেমে এলে যে শক্তি হারায় স্বতঃ বিকিরণে সেই শক্তি বাইরে বেরিয়ে আসে।

3. **উত্তেজিত বিকিরণ ঃ** উত্তেজিত পরমাণুর উপর তার উত্তেজনার একই মানের শক্তির ফোটন পড়লে স্বতঃ বিকিরণের ফোটন ও আপতিত ফোটন দুটিই একই দিকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসবে। এরকম বিকিরণ হল উত্তেজিত বিকিরণ।



চিত্র 2.6 : উত্তেজিত বা আবিষ্ট বিকিরণ।

উত্তেজিত বিকিরণের সংগতি

বিকিরণ ও পদার্থের সংঘাতে দেখা যায় যে, এই তিনটি ক্রিয়াই পরমাণুতে একসঙ্গে চলে। এখন উত্তেজিত বিকিরণের পরিমাণ বাড়াতে হলে প্রথমেই পরমাণুগুলিকে উত্তেজিত অবস্থায় আনতে হবে। তখন তাদের ফোটন শোষণের সম্ভাবনা থাকবে না। বিপুল পরিমাণে উত্তেজিত বিকিরণের কী প্রয়োজন তার উত্তর পেতে হলে,

আমরা ডিরাকের তত্ত্বের কথা স্মরণ করব। আইনস্টাইনের উল্লিখিত মতবাদের প্রায় দশ বছর পরে ডির‍্যাক্ বলেন যে, উত্তেজিত বিকিরণের দিক্, 'কাঁপন' সংখ্যা, দশা ও সমবর্তন হুবহু এক অর্থাৎ তা' সুসঙ্গত বিকিরণ। স্বতঃ বিকিরণের তরঙ্গগুলি খামখেয়ালী ; দিক্ বা সময়ের জ্ঞান তাদের একেবারেই নাই। ফলে এই বিকিরণ সুসঙ্গত নয়। অথচ উত্তেজিত বিকিরণের সুসঙ্গতি থেকে তার তীব্রতা বাড়িয়ে বেতার প্রেরণের কাজে লাগান যায়। তাই যে অণুতরঙ্গ বা আলো সাধারণতঃ সুসঙ্গত বিকিরণ নয়, তাদের তীব্রতা বাড়াতে উত্তেজিত বিকিরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত।

উত্তেজিত বিকিরণের প্রধান শর্ত হল যে, প্রথমেই উত্তেজিত পরমাণু নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। একটি বিশেষ তাপমাত্রায় কতগুলি পরমাণু কতটা উত্তেজিত অবস্থায় থাকবে, নির্দিষ্ট তাপীয় সাম্যাবস্থায় তা প্রায় নির্ধারিত। কিন্তু ঐ তাপমাত্রায় নির্ধারিত পরিমাণ থেকে বেশী পরমাণু উত্তেজিত করতে না পারলে আমাদের বাঞ্ছিত উত্তেজিত বিকিরণও বাড়ান যাবে না। পদার্থকে এই অবস্থায় আনার অর্থ হ'ল পদার্থকে সাম্যাবস্থা থেকে অসাম্যে আনা। এরকম অসাম্য অবস্থাকে বলা হয় নেগেটিভ তাপমাত্রা। এরকম অবস্থা তৈরি করতে পারলে তবেই উত্তেজিত বিকিরণ দিয়ে সুসঙ্গত বিকিরণ পাওয়া যাবে।

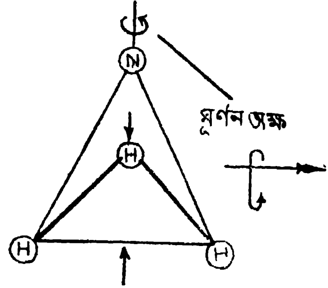
শোষণ ও উত্তেজিত বিকিরণ দুটি বিপরীত প্রক্রিয়া হলেও অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে তাদের মিল আছে—তা হল উভয় ক্রিয়াই বাইরের ফোটনের উপর নির্ভর করে। অথচ স্বতঃ বিকিরণ উত্তেজিত পরমাণুর আন্তর অবস্থার উপর নির্ভর করে—বাইরের ফোটনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

উত্তেজিত বিকিরণ ও অ্যামোনিয়া মেসার

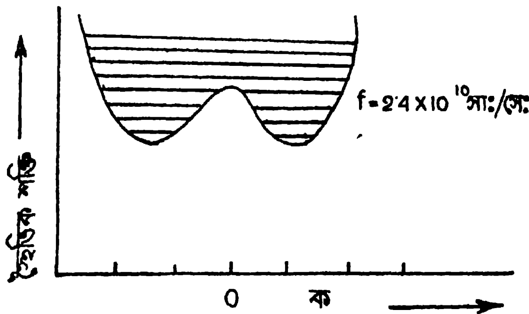
প্রত্যেক পরমাণুর কয়েকটি নির্দিষ্ট শক্তিস্তর আছে—এই সব স্তরের মধ্যবর্তী কোন অবস্থা নেই। একটি পরমাণুর পর পর চারটি শক্তি স্তর 0, 1, 2 এবং 3 হলে 0 স্তরটি তার শান্ত অবস্থা। নীচু তাপমাত্রায় এই স্তরেই বেশী পরমাণু থাকবে। 1, 2, 3 স্তরে ক্রম অনুযায়ী সংখ্যা কমবে। তাপমাত্রা বাড়ালে উঁচু স্তরে পরমাণুর সংখ্যা বাড়বে। এসব অবস্থায় উত্তেজিত বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে শোষণের সম্ভাবনাও বেশী। কারণ শুধু তাপমাত্রা বাড়িয়ে 0 থেকে উঁচু শক্তিস্তরে বেশী সংখ্যক পরমাণুকে আনা যায় না। ধরা যাক্ 0 স্তর থেকে 3নং স্তরে অন্ততঃ চারগুণ বেশী পরমাণু বাড়ান সম্ভব হল, তখন উত্তেজিত বিকিরণের সম্ভাবনা ও শোষণের চেয়ে চারগুণ বেড়ে যাবে। 0 স্তরে পরমাণু কম বলে সেখানে শোষণের সম্ভাবনাও কমবে। তাই কেবল তাপমাত্রা বাড়িয়ে উঁচু স্তরের পরমাণুর সংখ্যা বাড়ান যায়

না অর্থাৎ যে কোন তাপীয় সাম্যাবস্থা থেকে পরমাণুসমষ্টি উল্টানো (population inversion) সহজ নয়। 1951 খ্রীষ্টাব্দে টাউনেস্ অন্য উপায়ে সফল হলেন। এই সাফল্য এল অ্যামোনিয়া অণুতে মেসারের আবিষ্কারে।

পরমাণুর চেয়ে অণুর শক্তিস্তর জটিল—তার স্পন্দন (vibration) ও আবর্তনের (rotation) জন্য কিছু বাড়তি শক্তি স্তর থাকে। অ্যামোনিয়া NH_3 অণুর তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু এক সমতলে থাকে আর নাইট্রোজেন পরমাণু এই সমতলের উভয়-দিকেই চলাফেরা করতে পারে। নাইট্রোজেন পরমাণুর স্পন্দনজনিত ধাপে ধাপে কয়েকটি শক্তিস্তর আছে। NH_3 অণু হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির সমতলের সমান্তরাল একটি অক্ষের ও তার লম্ব অন্য একটি অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হয়। এই আবর্তন অবিচ্ছিন্ন নয়। ফলে স্পন্দনজনিত প্রত্যেক শক্তিস্তর আবর্তনের জন্য সূক্ষ্মতর শক্তিস্তরে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। অ্যামোনিয়া অণুর এরকম দুটি শক্তিস্তর বেছে নেওয়া হল, যাদের কম্পাংকের ব্যবধান f=সেকেণ্ডে $2{\cdot}4\times10^{10}$ সাইক্‌লস অর্থাৎ এই স্তর দুটির মধ্যে 0·0125 মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বিকিরণের কোয়াণ্টাম শোষণ ও পরে বিকিরণ হতে পারে। এই তরঙ্গ অণুতরঙ্গ পর্যায়ে পড়ে।



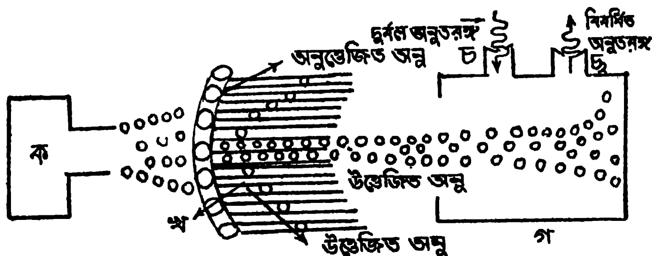
চিত্র 2.7 : অ্যামোনিয়া অণু ও তার শক্তিস্তর।



চিত্র 2.8 : হাইড্রোজেন পরমাণু তিনটির সমতল থেকে নাইট্রোজেনের দূরত্ব ক-এর সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের স্থৈতিক শক্তির (potential energy) সম্পর্ক।

এখন অ্যামোনিয়া মেসার উৎপাদনের উপায় হল,—প্রথমে একটি পাত্রে অ্যামোনিয়া উত্তপ্ত করা হল। ফলে কিছু অণু উঁচু শক্তিস্তরে উত্তেজিত অবস্থায়

আসে। পাত্রের একটি ছিদ্রপথে অণুগুলি বাইরে এনে কয়েকটি বেলনাকার ধাতুদণ্ডের অসম বিদ্যুৎক্ষেত্রের ভেতর পাঠান হয়। সেখানে শান্ত অণুগুলি তির্যক পথে ধাতুদণ্ডে আটকে পড়ে আর উত্তেজিত অণুগুলি সোজাসুজি এসে আর একটি পাত্রে সঞ্চিত হয়। এদের উপর বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কোন প্রভাব পড়ে না বলেই তা সম্ভব হয়। এইসব উত্তেজিত অণুর স্বতঃ বিকিরণের কিছু কোয়ান্টাম উত্তেজিত অণুগুলিকে আঘাত করলে উত্তেজিত বিকিরণের সৃষ্টি হয়। ফলে



চিত্র 29 : অ্যামোনিয়া মেসার উৎপাদন।
ক—তপ্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস, খ—বিদ্যুৎক্ষেত্রে উত্তেজিত অণু উৎপাদন, চ—একই কম্পাংকের দুর্বল অণুতরঙ্গ, ছ—মেসার ক্রিয়ায় বিবর্ধিত ঐ কাঁপনের অণুতরঙ্গ, গ—অণুতরঙ্গবাহী কক্ষ।

$2{\cdot}4 \times 10^{10}$ সাইক্ল্ কাঁপনসংখ্যার সুসঙ্গত অণুতরঙ্গ পাওয়া যায়। একই কাঁপন-সংখ্যার ক্ষীণ অণুতরঙ্গ এই উপায়ে বিবর্ধিত হয়।

কঠিন পদার্থে মেসার ক্রিয়া

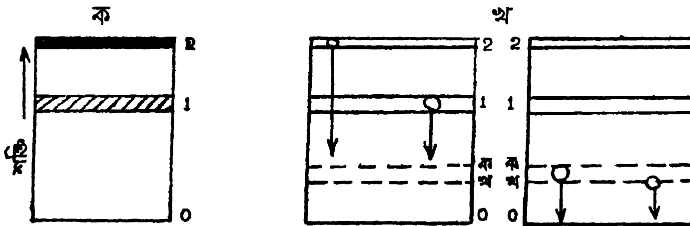
অ্যামোনিয়া বায়বের পরিবর্তে কঠিন পদার্থ দিয়ে মেসার তৈরি করতে পারলে তীব্রতর অণুতরঙ্গ পাওয়া সম্ভব। রুবি ক্রুস্ট্যালে এই ক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। রুবি হল অ্যালুমিনিয়াম্ অক্সাইড্ যার প্রায় একহাজার অ্যালুমিনিয়াম্ পরমাণুর একটি ক্রোমিয়াম। এই ক্রোমিয়াম পরমাণুই মেসারের উৎস। উপ-চুম্বকীয় পদার্থ বলে ক্রোমিয়াম বাইরের চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে বিভিন্ন শক্তিস্তরে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। চুম্বকক্ষেত্রের মানের উপর এই স্তরগুলির ব্যবধান নির্ভর করে। এখন তরল নাইট্রোজেনের শীতলতায় ঠাণ্ডা হলে রুবির 0 স্তরে পরমাণু সংখ্যা বাড়ে। আমরা চাই উঁচু স্তরের পরমাণু সংখ্যা বাড়াতে। তাই পরের ধাপ হল 0 স্তরের পরমাণুগুলিকে 1 স্তরে ও 1 স্তরের পরমাণুগুলিকে 0 স্তরে নিয়ে আসা। এরকম উল্টে দেবার একটি পদ্ধতি হল ;— 0 এবং 1 স্তরের শক্তির মানের নির্দিষ্ট কাঁপনসংখ্যার সঙ্গে কিছু কম ও বেশী কাঁপনের তরঙ্গ দিয়ে রুবি ক্রুস্ট্যালে আঘাত করলে নির্দিষ্ট শক্তির বিচ্ছিন্ন সুসঙ্গত

অণুতরঙ্গ বিচ্ছিন্ন ঝলকে পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট কাঁপনের অনুগামী বাড়তি কাঁপনের তরঙ্গ শক্তিস্তর দুটির পরমাণু সমষ্টিকে উল্টে দেয়। এই উপায়ে শুধু বিকিরণের ঝলক (pulse) পাওয়া যায়, তা অবিরাম হয় না।

রুবিতে অবিরাম সুসঙ্গত বিকিরণ পেতে হলে ক্রোমিয়ামের 0, 2 স্তরের ব্যবধানের নির্দিষ্ট কাঁপনসংখ্যার বিকিরণের আঘাতে প্রথমেই 0 স্তরের অধিক সংখ্যক পরমাণুকে 2 স্তরে তুলে দিতে হয়। তখন 1 স্তরের পরমাণু সংখ্যায় 0 স্তর থেকে স্বভাবতঃই বেশী হয়ে পড়ে। তখন ঐ দুই স্তরের নির্দিষ্ট কাঁপনসংখ্যার অণুতরঙ্গ পাঠিয়ে সুসঙ্গত ও তীব্র অণুতরঙ্গ অবিরাম উৎপাদন করা যায়।

আলোকীয় মেসার বা লেসার

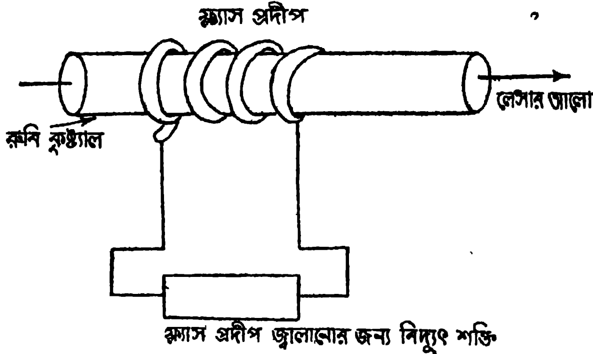
রুবি ছাড়া আরও অনেক কঠিন পদার্থে মেসার উৎপাদন করা যায়। রুবির বৈশিষ্ট্য হল যে, তা দিয়ে অণুতরঙ্গের পরিবর্তে আলোর মেসার বা লেসার আবিষ্কৃত হয়। এখানে রুবির উপচুম্বকীয় ধর্মের বদলে তার প্রতিপ্রভতা ধর্মকে কাজে লাগান হয়। লেসারের জন্য রুবিতে ক্রোমিয়াম পরমাণুর ভাগ আরও কমিয়ে দেওয়া হয়। ক্রোমিয়ামের তিনটি শক্তিস্তরের 1 ও 2 নং স্তর চওড়া পটির মত। ফ্লাশ



চিত্র 2.10 : রুবি কৃষ্ট্যালের (ক) চওড়া পটির দুটি স্তর 1 এবং 2, তাছাড়া (খ) দুটি আধাস্থায়ী স্তর ক ও খ।

(flash) দীপের আলোতে রুবি কৃস্ট্যাল উত্তেজিত হলে 0 স্তর থেকে ক্রোমিয়াম পরমাণুগুলি 1 ও 2 স্তরে লাফিয়ে যাবে। 1 স্তরের ও 0 স্তরের মাঝামাঝি দুটি আধাস্থায়ী স্তর আছে ক ও খ। উত্তেজনা প্রশমনে 1 ও 2 স্তর থেকে পরমাণুগুলি 0-তে নামতে গিয়ে ঐ ক ও খ স্তরে এসে পড়ে। কিন্তু স্তর দুটি অস্থায়ী বলে কোন বিকিরণ হবে না। সংশ্লিষ্ট শক্তিটুকু তাপের আকারে গোটা কৃস্ট্যালে ছড়িয়ে পড়বে। তখন ও ক ও খ স্তরে পরমাণুর পরিমাণ 0 থেকে বেশী। এই দুটি স্তর থেকে 0 স্তরে নেমে আসার সময় বিচ্ছিন্ন ঝলকে লাল আলোর সুসঙ্গত বিকিরণ

পাওয়া যাবে। ক ও খ-এর জন্য এই বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 6940 Å ও 6929 Å, লাল রঙের দৃশ্য আলো যার শক্তি প্রায় 50 জুল। এতে প্রায় 2×10^{20} ফোটন $\frac{1}{1000}$ সেকেণ্ডের এক একটি ঝলকে ঠাসাঠাসি হয়ে বেরিয়ে আসবে।



চিত্র 2.11 : রুবি কৃষ্ট্যালে লেসার উৎপাদন পদ্ধতি।

ফ্লাশ দীপের 5600 Å দৈর্ঘ্যের সবুজ আলোর উত্তেজনায় রুবি থেকে এই যে তীব্র লেসার পাওয়া যায়, তা এত শক্তিশালী যে তা দিয়ে 150 পাউণ্ড ওজনের পদার্থ 500 ফুট উপরে তোলা যায়। উপযুক্ত ব্যবস্থায় এই আলো লেন্স অথবা বক্রদর্পণের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করা যায়। 1/1000 বর্গসেণ্টিমিটারের কম আয়তনে ফোকাস্ করতে পারলে তা ঐ আয়তনে প্রায় 10 কোটি ওয়াট্ শক্তি দিতে পারে। সূর্যের আলো যথেষ্ট কেন্দ্রীভূত করে ও ঐ আয়তনে 500 ওয়াট্ও শক্তি পাওয়া যায় না। এ থেকে লেসারের শক্তি অনুমান করা যায়।

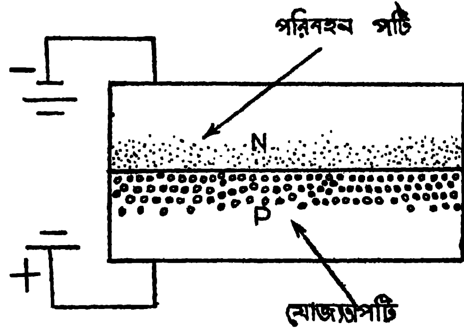
লেসারের সাহায্যে হীরা বা ঐ রকম কঠিন বস্তুতে ফুটো করা যায়, $\frac{1}{1000}$ সেকেণ্ডে 10000°F তাপমাত্রা উৎপন্ন করা যেতে পারে। এক মাইল দূরে লেসার কাঠ পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলতে পারে। 1962 খ্রীষ্টাব্দে 9 মে একটি লেসার রশ্মি চন্দ্র-পৃষ্ঠে পৃথিবী থেকে 250000 মাইল দূরে পাঠান হয়। এতদূরেও তা দুমাইলের বেশী ছড়িয়ে পড়েনি। $\frac{1}{1000}$ সেকেণ্ডের যে লেসার ঝলকগুলি পাঠান হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে ছিল প্রায় 2×10^{10} টি ফোটন। পৃথিবীর টেলিস্কোপে ফিরে আসা এই আলো কিছু ধরা পড়লেও সুদীর্ঘ পথের যাতায়াতে অধিকাংশই হারিয়ে গিয়েছিল। লেসার ছাড়া সাধারণ আলো এই দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই নষ্ট হয়ে যায়।

বায়ব ও কঠিন পদার্থে লেসারের ক্রিয়া

রুবির পরিবর্তে ক্যালসিয়ম ফ্লোরাইড ও ক্রোমিয়ামের বদলে ইউরেনিয়াম বা

সামারিয়াম ব্যবহার করে আগের পদ্ধতিতে অথচ খুব নীচু তাপমাত্রায় অবিরাম লেসার রশ্মি পাওয়া যায়। 1961 খ্রীষ্টাব্দে জাভন ও তাঁর সহযোগীরা বায়ব পদার্থ দিয়ে অবিরাম লেসার উৎপন্ন করেন। এই পদ্ধতিতে হিলিয়াম ও নিওনের মিশ্রণকে 28 মেগাসাইক্‌ল্. কাঁপন সংখ্যা বেতার তরঙ্গ দিয়ে উত্তেজিত করা হয়। ফলে হিলিয়াম পরমাণু 20 ইঃ ভোঃ উঁচু শক্তিস্তরে উঠে যায়। মিশ্রণের নিওন পরমাণু হিলিয়াম থেকে এই শক্তি কেড়ে নেয় ও উঁচু স্তরে উঠে পড়ে। নিওনের এই স্তর থেকে ঠিক নীচের স্তরে পরমাণুগুলি নামলে লাল উজানীর সুসঙ্গত বিকিরণ পাওয়া যায় আর 0 স্তরে নামলে উৎপন্ন হয় লাল আলোর লেসার। নানা বায়বের মিশ্রণে এরকম বেশ কয়েকটি লেসার উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

আধা পরিবাহী গ্যালিয়াম আর্সেনাইড্ (GaAs) দিয়েও লেসার উৎপন্ন হয়। ঐ পদার্থে কিছু টেলুরিয়াম্ দানী (donor) পরমাণু ঢুকিয়ে *n* শ্রেণীর ও জিঙ্ক পরমাণু ঢুকিয়ে *p* শ্রেণীর সেমি কণ্ডাক্টর বা আধাপরিবাহী পদার্থ পাওয়া যায়। *n* ও *p* দুটি টুক্‌রো জোড়া দিয়ে ঐ সংযোগস্থলে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দিতে হয়। তখন *n* অংশের পরিবহণ পটির ইলেক্‌ট্রন্ *p* অংশের যোজ্যতা পটির ছিদ্রে (hole) (2.12 চিত্র) চলে যায়। তখন যোজ্যতা পটির 1/10000 ইঞ্চি মত ছোট আয়তনে তীব্র লেসার রশ্মি পাওয়া যায়।



চিত্র 2.12 : আধাপরিবাহী লেসার।

লেসারের আধুনিক রূপ

সাধারণ কঠিন পদার্থ, বায়ব, আধাপরিবাহী এমনকি প্ল্যাস্টিক বা তরল পদার্থ থেকেও লেসার উৎপন্ন হয়। পদার্থের কোথায় কোন উপযুক্ত শক্তিস্তর আছে খুঁজে দেখে উঁচু কোন স্তরে তার অধিকাংশ পরমাণুকে তুলে দিতে পারলে অনেক পদার্থই লেসার বিকিরণ করতে পারে।

যে সব পদার্থে লেসার তৈরি হয়, তাদের সক্রিয় পদার্থ বলে। পদার্থ অনুযায়ী কোথাও অবিরাম (continuos) আবার কোথাও বিচ্ছিন্ন ঝলকে ঝলকে (pulsed) লেসারের বিকিরণ ঘটে। সক্রিয় পদার্থের তালিকায় নিত্য নতুন সংযোজন ঘটে চলেছে। 1নং সারণীতে কয়েকটি বায়ব পদার্থের লেসার বিকিরণের

ধর্ম দেওয়া হল। 2নং সারণীতে কঠিন পদার্থে লেসার বিকিরণের পরিচয় পাওয়া যাবে। সক্রিয় পদার্থের সঙ্গে সক্রিয়ক পরমাণুও দেখান হয়েছে।

সারণী : 1

সক্রিয় পদার্থ	লেস্যারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\times 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার	বিকিরণের প্রকৃতি অ = অবিরাম, বি = বিচ্ছিন্নঝলক
নিওন Ne^{3+}	2358	বি
Ne^{2+}	3324	বি
নাইট্রোজেন N_2	3371	বি
আর্গন Ar^{2+}	4880	অ
হিলিয়ম + নিওন $He + Ne$	5145	অ
	6328	অ
	11523	অ
	33920	অ
আর্গন ও অক্সিজেন $Ar + O_2$	8445	বি, অ
হিলিয়াম ও ক্যাডমিয়ম বাষ্প $He + Cd$	3250	অ
	4420	অ
কার্বন ডাই-অক্সাইড + নাইট্রোজেন + হিলিয়াম্ $CO_2 + N_2 + He$	106000	অ, বি
	279000	বি
জলীয় বাষ্প H_2O	1186000	বি

সারণী : 2

সক্রিয় পদার্থ	সক্রিয়ক পরমাণু	বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\times 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার	তাপমাত্রা °k	বিকিরণের প্রকৃতি
Al_2O_3	Cr^{3+}	6929	300	বি
		6934	77	অ
$CaF_2 : U^{3+}$	U^{3+}	6943	293	বি, অ
		25100	300	বি
			77	অ
$SrF_2 : Sm^{2+}$	Sm^{2+}	6969	4	বি
$CaF_2 : Dy^{2+}$	Dy^{2+}	23600	293	বি
			27	অ
$CaF_2 : Nd^{3+}$	Nd^{3+}	10461	300	বি
$CaWO_4 : Nd^{3+}$	Nd^{3+}	10650	77	অ
$SrF_2 : Tm^{3+}$	Tm^{3+}	19100	77	অ
$CaWO_4 : Pr^{3+}$	Pr^{3+}	10468	90	বি

বিরল মৃত্তিকার (Rare Earth) পরমাণু কাচের মধ্যে ঢুকিয়ে কাঁচকে সক্রিয় পদার্থে পরিণত করা যায়। বেরিয়াম কাঁচে 0·13 থেকে 10 ভাগ নিওডিমিয়াম্ পরমাণু ঢুকিয়ে লেসার পাওয়া গেছে। 3নং সারণীতে আধাপরিবাহী পদার্থে লেসার বিকিরণের প্রকৃতি ও উত্তেজনা প্রয়োগের পদ্ধতি দেওয়া হল।

সারণী : 3

আধাপরিবাহী পদার্থ	বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\times 10^{-8}$ সেন্টিমিটার	উত্তেজনা প্রয়োগের পদ্ধতি
GaAs	8500	বিদ্যুৎ প্রবাহ
InP	9000	বিদ্যুৎ প্রবাহ
PbS	43000	বিদ্যুৎ প্রবাহ
ZnS	3300	ইলেক্‌ট্রন্ সংঘাত
CdTe	8000	ইলেক্‌ট্রন্ সংঘাত
GaAs	8500	ইলেক্‌ট্রন্ সংঘাত
CdS	5000	আলো
GaAs	8500	আলো
GaAs	8500	বিদ্যুৎক্ষেত্র

p শ্রেণীর AlGaAs ও *n* শ্রেণীর GaAs ব্যবহার করে অসমগঠনের (hetero-structure) পদার্থে লেসার বিকিরণের উন্নতি ঘটান যায়। 1970 খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ান্ বিজ্ঞানী অ্যাল্‌ভেরোভ অসমগঠনের কয়েকটি *n* ও *p* আধাপরিবাহী পদার্থ পর পর জোড়া দিয়ে যথেষ্ট উন্নত মানের লেসার উৎপাদনে সমর্থ হন।

তরল পদার্থ দিয়েও লেসার উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। কঠিন পদার্থের সুবিধা হল তরলের চেয়ে তার বেশী ঘনত্ব তীব্র লেসার বিকিরণের উপযোগী। কিছু অসুবিধাও আছে,—যেমন কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনকে সুসমভাবে আলো চলাচলের উপযোগী করা ও তার দুটি প্রান্তের পৃষ্ঠদেশ আলো প্রতিফলনের জন্য যথেষ্ট মসৃণ করা খুব সহজ নয়। তাছাড়া লেসার বিকিরণে কঠিন পদার্থ উত্তাপে গলে যেতে পারে। আবার বায়ব পদার্থে লেসার বিকিরণের জন্য তা' যথেষ্ট কম চাপে রাখতে হয়। ফলে উপযুক্ত শক্তির লেসার পেতে বায়ব পদার্থের আয়তন বেশ বড় হয়ে পড়ে।

কঠিন ও বায়ব পদার্থের সব সুবিধাগুলিই তরল প্রদার্থে আছে, অথচ লেসার-জনিত উত্তাপ আলাদা করে ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন হয় না।

ফস্‌ফরাস অক্সিক্লোরাইড অথবা সেলেনিয়াম অক্সিক্লোরাইডের সঙ্গে টিন বা অন্য ধাতুর ক্লোরাইড ও নিওডিমিয়াম্ অক্সাইডের দ্রবণ মিশিয়ে যে সক্রিয় তরল পদার্থ

পাওয়া যায়, তা কাচের লেসারের মত কাজ করে, অথচ এর সুসমতা বেশী বলে বিকিরণের বিস্তৃতি কম প্রায় 10^{-8} সেণ্টিমিটার।

জৈব পদার্থের রঞ্জকের (dye) দ্রবণ থেকেও লেসার তৈরি হয়। পাইরোনিস, রোডামিন প্রভৃতি রঞ্জকের দ্রবণ লেসারের উপযোগী।

লেসারের প্রয়োগ

লেসারের প্রয়োগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এক নূতন দিগন্তের সূচনা করেছে। বেতার, টেলিভিশন, রেডার, রসায়ন, জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ত্রিমাত্রিক আলোক-চিত্রণ (holography) ও মহাকাশ অভিযান সম্পর্কীয় নানা কাজে লেসারের প্রয়োগ একটি বহু আলোচিত বিষয়। পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে এইসব প্রয়োগ নিয়ে যেসব গবেষণা চলেছে, তাতে শুধু লেসারই বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। আমরা এখানে লেসারের দুটি আধুনিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব।

1. **মাইক্রোফিসন** (microfission): ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ম প্রভৃতি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজনে বিপুল শক্তি উৎপাদনের কথা কারুরও অজানা নয়। ভারতে পোখ্‌রান পরীক্ষায় যে সাড়া পড়েছিল, তা এখনও মিলিয়ে যায়নি। নিউক্লীয় বিস্ফোরণের শান্তিপূর্ণ নানা প্রয়োগও আছে। অন্ততঃ দুই কিলোগ্রামের মত বিভাজনযোগ্য ইউরেনিয়াম না হলে বিস্ফোরণ হয় না—এই পরিমাণকে সন্ধিভর (critical mass) বলে। সন্ধিভরের কম পরিমাণ ইউরেনিয়ামে শৃঙ্খলক্রিয়ার অংশীদার নিউট্রন সহজে বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে ফিসন বা বিভাজন থেকে শৃঙ্খলক্রিয়ায় বিপুল শক্তির বিস্ফোরণ সম্ভব হয় না। সাধারণ চাপে অবশ্যই এই সন্ধিভর বিস্ফোরণের জন্য অপরিহার্য। তবে এই চাপ যদি বাড়ান যায়—তাহলে কী হবে? তত্ত্বগত দিক্ দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইউরেনিয়ামে লেসার রশ্মির উত্তাপ দিয়ে বিপুল চাপের সৃষ্টি করা যায়—যার পরিমাণ সাধারণ বায়ুচাপের 10^{13} গুণ বেশী হতে পারে। তখন এই চাপে সন্ধিভরের পরিমাণও এত কম হবে যে, এক গ্রাম্ ইউরেনিয়ামেও বিস্ফোরণ ঘটবে—আর তার শক্তি 50 টন T. N. T-র কম হবে না। এই পরিকল্পনা সফল হলে নিউক্লীয় বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

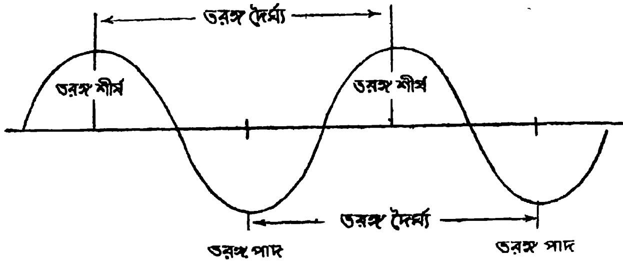
2. হাল্কা নিউক্লিয়াসের সংযোজনে (fusion) অফুরন্ত শক্তি সংগ্রহ করার চেষ্টা বেশ কিছুদিন হল চলছে। এরকম সংযোজনের জন্য পদার্থকে লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী তাপ-মাত্রায় তুলতে হয়। এরকম তাপমাত্রায় পদার্থ কঠিন, তরল বা বায়ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক চতুর্থ অবস্থা প্লাজমায় (plasma) পরিণত হয়। সূর্যের কেন্দ্রে এরকম অবস্থা বর্তমান। হাইড্রোজেন বোমায় নিউক্লীয় সংযোজনে বিপুল শক্তির বিস্ফোরণ ঘটান

সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত সংযোজন ক্রিয়া আজও আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলেছে নানা উপায়ে—তার সাফল্য সম্ভব হলে জলের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে ভারী হাইড্রোজেনের সংযোজনে, যে বিপুল শক্তি পাওয়া যাবে তা হবে প্রায় অফুরন্ত।

লেসার এই সংযোজন ঘটানোর হাতিয়ার হতে পারে। লেসার বিকিরণ প্লাজমায় কেন্দ্রীভূত করে এরকম উঁচু তাপমাত্রা পাওয়া যেতে পারে ও নিউক্লীয় সংযোজন তখন সহজসাধ্য হ'বে। কঠিন পদার্থে লেসার যথেষ্ট উঁচু তাপমাত্রার প্লাজমা উৎপন্ন করতে পারে। প্রোখোরভ্ ও তাঁর সহকর্মীরা রুবি লেসার দিয়ে 5 লক্ষ ডিগ্রী তাপমাত্রা তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আর এক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 30 লক্ষ মেগাওয়াটের লেসার ঝলক দিয়ে অন্ততঃ 10^{14} আয়নকে 1 থেকে 10 ইলেকট্রন ভোল্টে উত্তেজিত করা যায়।

অবশ্য এসবই পরিকল্পনার ও প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের গতিপথ সংশোধন, কণাত্বরণ, পাথরকাটা ও খনির কাজ, ছোট ছোট ইঁট পাথর জুড়ে মনোলিথিক দেয়াল তৈরি—এসবই হল লেসারের প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা। আধুনিক যুগে পরিকল্পনা বিজ্ঞানভিত্তিক বলেই তার সাফল্য আর অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে না। লেসার সম্পর্কেও আশা আছে—বিজ্ঞানের এই নব-জাতক ভবিষ্যতে অসম্ভবকেও সম্ভব করবে।

অস্বচ্ছ পদার্থে আলো ঢুকতে পারে না—যেটুকুও বা ঢোকে তা ফিরে আসতে পারে না। স্বচ্ছ বস্তুতে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ হয়। আলোকে উদ্ভাসিত ছোট ছোট কণাদল থেকে যে আলোর বিকিরণ হয় তা ঠিক উদ্ভাসী আলোকের মত নয়। 1869 খ্রীষ্টাব্দে টিণ্ড্যাল্ কণাদল বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন। 1872 খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালে দেখালেন যে, উদ্ভাসিত পদার্থের অণু থেকেও আলো বিক্ষিপ্ত হয়, তার



চিত্র 2.13 : বিকিরণ তরঙ্গ, শীর্ষ ও পাদ।

দীপ্তি উদ্ভাসী আলো থেকে ক্ষীণ। আবার এই বিক্ষিপ্ত আলোতে বেগুনি রংয়ের দীপ্তি লাল থেকে প্রায় ষোলোগুণ বেশী। বিক্ষিপ্ত আলোর দীপ্তির তারতম্যের তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অণুর আয়তন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। দীপ্তির তারতম্য হলেও বিক্ষিপ্ত আলোর কাঁপন সংখ্যা উদ্ভাসী আলোর মতই হয়ে থাকে।

এই শতকের গোড়ায় কোয়াণ্টামতত্ত্ব যখন প্রতিষ্ঠিত, তার প্রয়োগ নিয়ে একটি সুন্দর পরীক্ষা করলেন কম্পটন্। এই পরীক্ষায় দেখা গেল এক্সরশ্মির সঙ্গে ইলেক্ট্রনের সংঘাতে ইলেক্ট্রন এক্স রশ্মির কাঁপন সংখ্যার কিছু অংশ কেড়ে নেয়, ফলে তার শক্তি কমে যায়। দীপ্তি নয় তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যই পাল্টে গেল। বিকিরণের তরঙ্গবাদ দিয়ে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দৃশ্য আলো নিয়ে কি একরকম পরীক্ষা সম্ভব ? ইলেক্ট্রনের উপর নীল আলো পড়লে তা কি লাল আলোতে বদলে যেতে পারে ? স্মেকাল গণিত দিয়ে প্রমাণ করলেন যে তা হওয়া সম্ভব। 1925 খ্রীষ্টাব্দে ক্রামার্স ও হাইসেনবার্গ যে বিশদ তত্ত্ব খাড়া করলেন তাতে পদার্থের অণু ও আলোর সংঘাতে কম্পটন এফেক্টের অনুরূপ ফল পাওয়া অবশ্যম্ভাবী হল। এই সব সিদ্ধান্ত এবং পরীক্ষা রামন এফেক্টের ভিত্তিভূমি। 1923 খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিলে রামনের সহযোগী রামনাথন জল ও সুরাসারের বিক্ষিপ্ত আলোতে উদ্ভাসী আলোর র‍্যালে

বিকিরণ ও কিছু অস্পষ্ট ক্ষীণ দীপ্তির ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর সন্ধান পান। পরে কৃষ্ণান ও রামন একাধিক তরল পদার্থে, বরফ ও স্বচ্ছ কাঁচে এরকম আলো লক্ষ্য করেন। 1928 খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী রামন অণু থেকে বিক্ষিপ্ত এই আলোর নিশ্চিত সন্ধান পান—যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য উদ্ভাসী আলো থেকে ভিন্ন। 31 মার্চ নেচার পত্রিকায় এই আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রকাশিত হয়। আলোর রাজ্যে কম্পটন এফেক্টের অনুরূপ এই যুগান্তকারী আবিষ্কার রামন এফেক্ট নামে অভিহিত হয়। একই সময়ে রাশিয়া থেকে ল্যাণ্ডসবার্গ ও ম্যাণ্ডেলস্ট্যাম্ রামনের আবিষ্কারের কথা না জেনেও কোয়ার্টজে অনুরূপ আবিষ্কার করেন। 5 মে জার্মান পত্রিকায় এই বিবরণ প্রকাশিত হয়। তবু যথার্থ পূর্বসূরী হিসেবে রামন এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। আলোর রাজ্যে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সফল প্রয়োগই রামন এফেক্টের একমাত্র কথা নয়, এই আবিষ্কার বাস্তবে অণু জগতের এক অজানা রাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছে।

অণুর অন্তর্লোকে

দুই বা অধিক পরমাণু মিলে অণু তৈরি হলে, পরমাণুদের প্রকৃতিতে বড় একটা পরিবর্তন হয় না, কিন্তু অণুতে বাঁধা পড়ে তাদের গতিবিধিতে কিছুটা জটিলতা আসে। যেমন, পরমাণুগুলি তাদের অদৃশ্য বাঁধনের মাঝামাঝি একটি কক্ষপথে ঘুরপাক খায়। এই আবর্তনের শক্তি অণুতরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া থাকে স্পন্দন—তা থেকে বিভিন্ন কাঁপন সংখ্যার বিকিরণ হয়। এই স্পন্দনের শক্তি লাল-উজানীর পাল্লায় পড়ে। এই রশ্মির শক্তি আলোর চেয়েও কম, তাই পদার্থের বাইরে বেরিয়ে আসার আগেই তাপের আকারে তা' পদার্থে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এই কাঁপন সংখ্যাগুলি জানলে অণুর অন্তর্লোকের রহস্য জানা যায়। অণুদের গঠন-বিন্যাস বিচিত্র, কোনটি সরলরেখার, কোনটি বা ইংরাজী V অথবা L অক্ষরের মত, কোনটা অষ্টতলীয় বা বহুতলীয় ইত্যাদি। পরমাণুর এইসব বিশেষ সজ্জায় বিভিন্ন অণুর গঠনরহস্য সমাধান করা অণুজগতের চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। রামন এফেক্ট সেই চাবিকাঠি—যার সাহায্য নিয়ে অণুর অজানালোকে প্রবেশ করা যায়।

রামন এফেক্ট ও অণুজগৎ

কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সাহায্যে রামন এফেক্টের ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক্, নির্দিষ্ট শক্তির কয়েকটি ফোটন অণুতে আঘাত করল। অণু আর ফোটনের মধ্যে তখন চলল শক্তিপরীক্ষা। কিছু ফোটন এই শক্তিপরীক্ষা এড়িয়ে তার নিজস্ব শক্তি নিয়ে ও কিছুটা দীপ্তি হারিয়ে বিক্ষিপ্ত হল—যাকে আমরা আগেই র‍্যালে বিকিরণ

বলেছি। অবশিষ্ট ফোটনগুলি শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে অণুর অভ্যন্তরের কম্পনগুলির নির্দিষ্ট সমপরিমাণ শক্তি খুইয়ে বিক্ষিপ্ত হল, আবার কখনো অণু থেকে ঐ পরিমাণ শক্তি চুরি করে নিয়ে আরো একটু শক্তিশালী ফোটন হয়ে বেরিয়ে এল। দুটি ক্ষেত্রেই বিক্ষিপ্ত আলোর কাঁপন সংখ্যা উদ্ভাসী আলো থেকে আলাদা। একটি অণুতে একাধিক কম্পন থাকতে পারে, তাদের শক্তি যদি $E(1)$, $E(2)$ ইত্যাদি হয় তবে $E(n)$-এর n সংখ্যা দিয়ে কয়টি স্পন্দন আছে জানা যায়। উদ্ভাসী আলোর শক্তি $E=h\nu$ হলে, বিক্ষিপ্ত আলোতে কিছুটা $h\nu$ শক্তির র‍্যালেবিকিরণ থাকবে আর কিছু হবে $h\nu \pm E(n)$—এইসব শক্তির বিকিরণই রামন এফেক্টের মূলকথা। সব পরীক্ষায় যে অণুর সব স্পন্দনের চিত্র পাওয়া যাবে তা নয়—তার সঙ্গত কারণ আছে। বিভিন্ন অণুতে $E(n)$-এর মান 0·7 থেকে 0·01 ইলেক্ট্রন্ ভোল্ট এর মধ্যে পড়ে—আর উদ্ভাসী আলোর শক্তি সাধারণতঃ 2 ইলেক্ট্রন্ ভোল্ট হলে বর্ণালীলেখ যন্ত্রে বিক্ষিপ্ত কাঁপনসংখ্যাগুলির পার্থক্য ধরা কঠিন নয়। তবু এতদিন র‍্যালে বিকিরণ ছাড়া রামন বিকিরণ কেন ধরা পড়েনি, তার কারণ হল এদের দীপ্তি র‍্যালে বিকিরণ থেকে অনেক কম। কোন পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে তাতে বহু অণুর সমাহার থাকায় টিণ্ড্যাল কথিত কণাদল বিকিরণ, প্রতিপ্রভার বিকিরণ প্রভৃতি অবাঞ্ছিত আলো রামন বিকিরণের ক্ষীণদীপ্তিকে ঢেকে দেয়। রামনের কৃতিত্ব হল, অণু থেকে বিক্ষিপ্ত এইসব ক্ষীণদীপ্তির বিকিরণ ধরতে পেরেছিলেন। এজন্য বর্ণালীলেখ যন্ত্রের সঙ্গে উপযুক্ত সূক্ষ্ম ব্যবস্থায় সাহায্য নিতে হয়েছিল।

লাল উজানী বিকিরণের শোষণপদ্ধতি ও রামন এফেক্ট

অণুতে স্পন্দনগুলির শক্তি লাল উজানীর পাল্লায় পড়ে বলে ঐ বিকিরণে উদ্ভাসিত হলে অণু তার স্পন্দনের কাঁপনসংখ্যা অনুযায়ী এই বিকিরণ শোষণ করে নেয়। এই পরীক্ষায় ও স্পন্দনের কাঁপনসংখ্যা মাপা যায়। অবশ্য এতে নানা অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ পরীক্ষাধীন পদার্থের আবরণ এমন হওয়া চাই যে, তাতে যেন উদ্ভাসী লাল উজানী বিকিরণ আগেই না শোষিত হয়ে যায়। তাই কাঁচের পরিবর্তে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ঐ জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে এই রশ্মি পাঠাতে হয়। দ্বিতীয়তঃ জল বা অনুরূপ দ্রবণে নমুনা নেওয়া চলে না। লাল উজানী বিকিরণ উৎপাদন করা ও পরীক্ষাধীন নমুনা থেকে বিক্ষিপ্ত এই বিকিরণ মাপা দৃশ্য আলো থেকে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। অণুজগতের স্পন্দনগুলি লাল উজানীর পাল্লায় পড়লেও উদ্ভাসী ও বিক্ষিপ্ত উভয় বিকিরণই রামন পরীক্ষায় দৃশ্য আলোর পর্যায়ে পড়ে। তাই এই রামন এফেক্টের পরীক্ষা কিছুটা সহজসাধ্য হতে পারে।

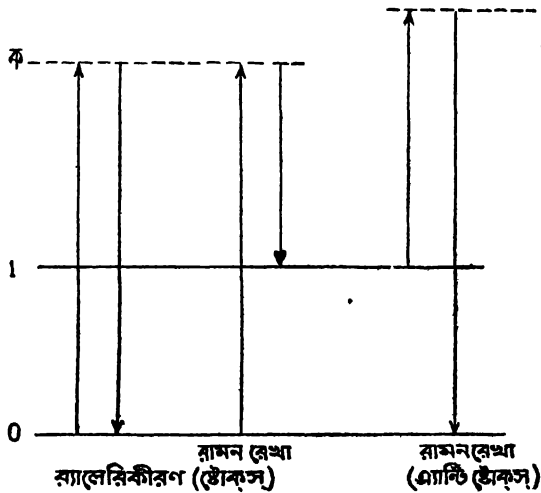
অবশ্য রামন বর্ণালী ও লাল উজ্জানীর শোষণ পদ্ধতির পরীক্ষায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যার ফলে অণুর সম্পূর্ণ সাম্যধর্মী স্পন্দন লাল উজ্জানী পরীক্ষায় ধরা পড়ে না—অথচ রামন বর্ণালীতে ধরা যায়। আবার সম্পূর্ণ সাম্যবিরোধী স্পন্দনের বেলায় ঠিক উল্টো—রামন বর্ণালী তা ধরতে পারে না। দুই পরমাণুর সরলরেখাকার অণুর সাম্যধর্মী স্পন্দনের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। এরকম স্পন্দনে দুটি পরমাণুই মুখোমুখি একবার এগিয়ে আসছে, আবার উল্টোদিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। যেন পরপর অণুটির আয়তন কমছে ও বাড়ছে। আর সাম্যবিরোধী স্পন্দনের বেলায় একটি পরমাণু যখন এগিয়ে আসছে, অন্যটি তখন বিপরীতমুখী—অর্থাৎ অণুর আয়তনে কখনো কোন হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিকিরণের সঙ্গে এই দুরকমের স্পন্দন কীভাবে কাজ করে তা জানা প্রয়োজন। যে কোন বিকিরণই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। বিকিরণের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্র তরঙ্গাকারে এগিয়ে চলে। বিকিরণজনিত তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে পদার্থের অণু দ্বিমেরুর মত আচরণ করে অর্থাৎ অণুতে পরমাণুর পজিটিভ ও নেগেটিভ আধান যা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল, তা দুটি মেরুতে যেন একটি বৈদ্যুৎকেন্দ্রের দুদিকে কেন্দ্রীভূত হয়। বিকিরণের মত তড়িৎক্ষেত্রটিরও কাঁপন আছে বলেই আণবিক দ্বিমেরুও একই সঙ্গে কাঁপতে থাকে—ফলে তা বিকিরণের একটি উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এই বিকিরণই র‍্যালে বিকিরণ। বৈদ্যুৎকেন্দ্র থেকে মেরুর দূরত্ব যা দ্বিমেরুভ্রামক (dipole moment) নামে অভিহিত হয় তার মান অণুর সাম্যবিরোধী স্পন্দনের বেলায় পাল্টে যায়, তখন লালউজ্জানীর শোষণে তার কাঁপনসংখ্যা ধরা পড়ে। সাম্যধর্মী অণুর বেলায় এই ভ্রামকের কোন পরিবর্তন হয় না, তখন লাল উজ্জানীর শোষণে ঐ স্পন্দন ধরা পড়ে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে র‍্যালে বিকিরণের সঙ্গে দোলায়িত (modulated) রামনরেখা ঐ স্পন্দনের কাঁপন-সংখ্যা বলে দেয়।

অণুর কোন স্পন্দনের কাঁপনসংখ্যা ν' হলে ν কাঁপনসংখ্যার উদ্ভাসী আলোতে যে রামন বর্ণালী পাওয়া যাবে তা হ'বে দুটি কাঁপনসংখ্যার দুটি রেখা $\nu-\nu'$ ও $\nu+\nu'$। $\nu-\nu'$ রেখাটি স্টোক্স্ রেখা নামে অভিহিত হয়—অন্যটির নাম অ্যান্টি-স্টোক্স্। প্রতিপ্রভার আলোর কাঁপনসংখ্যা উদ্ভাসী আলো থেকে কম হয় স্টোক্স্ তা প্রতিপন্ন করেছিলেন তাই হ্রাসপ্রাপ্ত কাঁপনসংখ্যার ঐ রেখার সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় অণুর স্পন্দনগুলিতেও শক্তি অনুযায়ী উঁচুনীচু ভেদ আছে। উদ্ভাসী আলোর সংঘাতে অণু উপরের স্তরে গেলে স্টোক্স্‌রেখা আবার নীচে নামলে অ্যান্টি-স্টোক্স্‌রেখা পাওয়া যায়।

কিছুটা সাম্যধর্মী আবার কিছুটা সাম্যবিরোধী স্পন্দন বহু অণুর বেলায় একই সঙ্গে

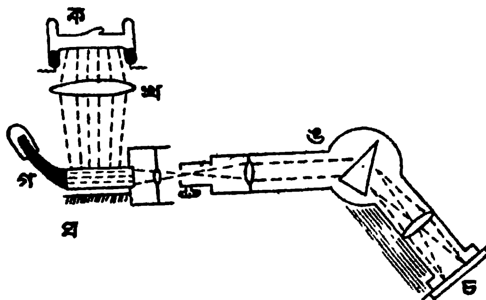
দেখা যায়। লালউজ্জ্বানী ও রামন এফেক্ট—দুই পরীক্ষাতেই তা ধরা পড়ে। তাই এরা কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও পরস্পরের পরিপূরক।



চিত্র 2.14 : র‍্যালে, স্টোক্‌স ও অ্যান্টিস্টোক্‌স রামনরেখা বর্ণালী। 0—ভূমিস্তর।

রামন এফেক্টের পরীক্ষা

রামন পরীক্ষার উৎস হল তীব্র একবর্ণী আলো। এই উৎস হিসেবে পারদ বাষ্পদীপের 4047Å বা 4358Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষাধীন



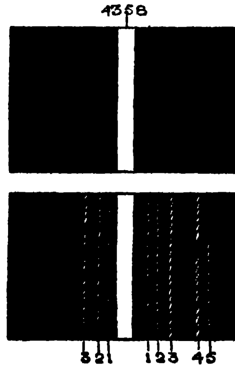
চিত্র 2.15 : রামন এফেক্টের পরীক্ষায় নিয়োজিত রামনের যন্ত্রের চিত্র।
ক—পারদ বাষ্পদীপ, খ—ফিল্টার, গ—উড়ের নল, ঘ—নমুনা পদার্থ, ঙ—বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র, চ—রামনবর্ণালীজ্ঞাপক।

নমুনাটি যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ অবস্থায় নেওয়া হয়। তাতে অবাঞ্ছিত আলোর বিক্ষেপ বহুলাংশে কমে যায়। বিক্ষিপ্ত আলো সমাহারী লেন্সের সাহায্যে

কেন্দ্রীভূত করে বর্ণালীলেখ যন্ত্রের সাহায্যে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা হয়। ঐ প্লেটে একটি জানা বর্ণালীরেখার কাঁপনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করে এদের কাঁপনসংখ্যা মাপা হয়। সাধারণত তরলপদার্থের উপর এই পরীক্ষা সহজ—তবে কঠিন ও বায়ব পদার্থেও এই পরীক্ষা করা যায়। রামনের সমসাময়িক পরীক্ষায় কোয়ার্টজে এই বর্ণালী আবিষ্কারের কথা আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে রামন পরীক্ষার অনেক উন্নতি হয়েছে। ফটোগ্রাফিক প্লেটের পরিবর্তে ফোটোমাল্টিপ্লায়ারের (photomultiplier) সাহায্যে আলোকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত ও বিবর্ধিত করে ক্ষীণ রামন বর্ণালীও পাওয়া সম্ভব হয়। ফলে রামন এফেক্টের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিস্তৃততর হয়েছে।

রামন বর্ণালীর বিশ্লেষণ

রামন এফেক্ট প্রয়োগের গুরুত্ব তার বর্ণালীর কাঁপনসংখ্যা মাপাতে নয়, অণুর মধ্যে কী ধরনের কোন কাঁপনসংখ্যার স্পন্দন আছে তা নির্ধারণ করা।

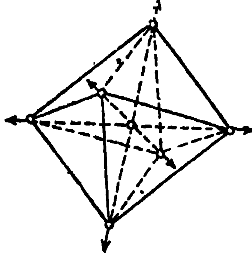
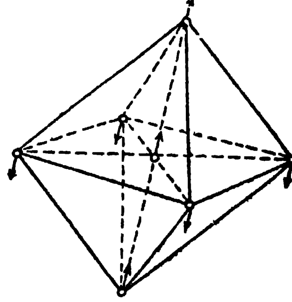


চিত্র 2.16 : (উপরে) ফটোগ্রাফিক প্লেটে পারদ বাষ্পদীপের আলোর বর্ণালী যেরকম দেখায়। (নীচে) ঐ আলোর কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালী রামন পরীক্ষায় বর্ণালী লেখ যন্ত্রে যেমনটি দেখায়। মাঝে অভিন্ন কম্পাংকের রেখার ডানদিকে তিনটি অ্যান্টিস্টোক্‌স্ ও বাঁদিকে পাঁচটি স্টোক্‌স্ রেখা। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড অণুর পাঁচটি স্থির কম্পাংক স্টোক্‌স্ রেখায় ধরা পড়লেও অ্যান্টিস্টোক্‌স্ রেখায় তাদের ক্ষীণদীপ্তির জন্য 4 ও 5 এই দুটি রেখা ধরা পড়েনি।

উদ্ভাসী আলো ও বিক্ষিপ্ত রামনরেখার কাঁপনসংখ্যার পার্থক্য থেকে তা নিরূপণ করা যায়।

রামন পরীক্ষার ফলবিশ্লেষণের আর একটি মাপকাঠি হল—রামন রেখার দীপ্তির মাত্রা। কোনও অণুর এরকম একাধিক রেখার দীপ্তি একরকম নাও হতে পারে—কারণ অণুর স্পন্দন বিভিন্ন ধরনের হয়। সাম্যধর্মী স্পন্দনের বেলায় রামন রেখা

যেমন উজ্জ্বল, আংশিক সাম্যধর্মীজনিত রামনরেখা তেমনি অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের অণু আছে। কেউ বা এড়ো গঠনের, কেউ V অক্ষরের মত,

(ক) (খ)

চিত্র 2.17 : অষ্টতলক অণুতে রামন এফেক্ট ছাড়া (ক) সাম্যধর্মী ও লাউউজ্জানী ছাড়া (খ) সাম্যবিরোধী স্থির কম্পন ধরা পড়ে না। তীরচিহ্ন স্থির কম্পনে পরমাণুর গতিবিধির দিগ্‌দর্শী। যে কোন গড়নের অণুতে এই দুরকম ছাড়া অংশত সাম্যধর্মী কম্পনও থাকে।

কারো গঠন অষ্টতলীয় ইত্যাদি। রামন রেখার দীপ্তির মাত্রা থেকে অণুর স্পন্দন কোন্ জাতের তা বুঝতে পারা যায়।

তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ যখন এগিয়ে চলে, তার সহগামী তড়িৎক্ষেত্র এক সমতলে থাকে না। যখন এক সমতলে থাকে তখন বিকিরণের সমবর্তন (polarisation) হয়। অণুর স্পন্দন যতটা সাম্যধর্মী হয়, র‍্যালে বিকিরণও ততটা সমবর্তিত হয়। স্পন্দনের সাম্যধর্মের সঙ্গে রামন এফেক্টের প্রত্যক্ষ যোগ আছে বলেই, রামন বর্ণালী কত পরিমাণে সমবর্তিত হয়েছে জেনে স্পন্দনটি কতটা সাম্যধর্মী তা অনায়াসে বলা যায়।

রামন বর্ণালী যেন অণুর বুড়ো আঙুলের টিপ—যা দিয়ে জটিল একটি মিশ্রণের মধ্যেও আমরা তাকে খুঁজে নিতে পারি। কিছুটা গণিতের সাহায্য নিয়ে তার গঠন, স্পন্দনের সাম্যধর্ম ইত্যাদির হদিস্ পাই। যে আকর্ষণী শক্তির বলে পরমাণুগুলি অণুতে বাঁধা পড়ে তার স্বরূপও রামনবর্ণালী থেকে পেতে পারি।

তাই গভীর আত্মবিশ্বাসে রামন তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা প্রচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, "এই পরীক্ষার ফল দিয়ে তরঙ্গবাদ, অণু পরমাণু জগৎ, বিকিরণতত্ত্ব, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে, যার সমাধান এখনও হয়নি। প্রচুর কাজ শুধু বিজ্ঞানী কর্মীর অপেক্ষায় আছে।" এই মন্তব্য

অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বহু সমস্যার সমাধানে রামন এফেক্টের সাহায্য নিলেন। রামন বর্ণালী বিজ্ঞান নামে একটি নূতন শাখার সৃষ্টি হল। ঐ সংক্রান্ত প্রায় পাঁচহাজার মৌলিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 1936 খ্রীষ্টাব্দে এরকম প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ক্রমশ সংখ্যা কমতে থাকে। তার কারণ হল রামন পরীক্ষার আঙ্গিকে অনুকুল অণুগুলি নিয়ে পরীক্ষা ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসায় কাজ কিছুটা ঢিমেতালে চলে। আর এক কারণ বোধ হয় রামন বর্ণালীর দীপ্তির ক্ষীণতা। অবশিষ্ট বহু অণুতে এরকম ক্ষীণদীপ্তির জন্য পরীক্ষা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। রামন পরীক্ষার উৎস নীলঘেঁষা আলো কেন্দ্রীভূত করা এক সমস্যা—ফলে পরীক্ষাধীন নমুনার আয়তন বড় রাখতে হয়। তার জন্য খুঁটিনাটি ব্যবস্থাগুলি সহজসাধ্য নয়। কখনো হয়ত উদ্ভাসী আলোর আভাস রামন বর্ণালীকে ঢেকে দেয়, আবার কখনো উদ্ভাসী আলো নমুনাতে যে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে, তাতে রামন রেখা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভাসী আলোতে নমুনার রাসায়নিক বিকৃতি ঘটে যায়। রঙীন পদার্থে উদ্ভাসী আলো প্রায়ই শোষিত হয়, ফলে তাদের রামন প্রণালী পাওয়া দুষ্কর। কঠিন পদার্থের একাধিক তল থেকে উদ্ভাসী আলোর অজস্রমুখী প্রতিফলন রামন বর্ণালীকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে রাখে।

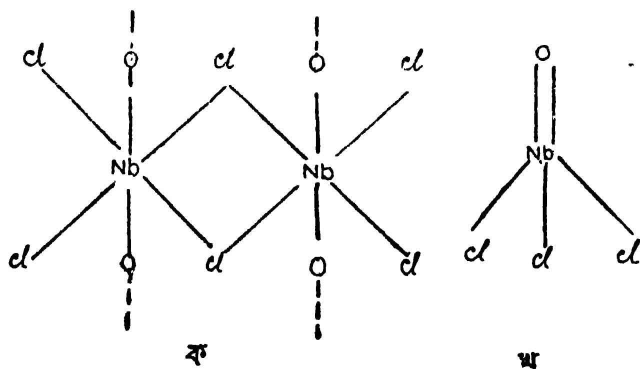
লেসার ও রামন বর্ণালী

তীব্র লেসার আলোতে উদ্ভাসিত অণু থেকে যে বিক্ষিপ্ত আলো পাওয়া যায় তার দীপ্তি যথেষ্ট বেশী। সেক্ষেত্রে রামনরেখার দীপ্তিও বাড়ে। গ্যাস লেসারের অবিরাম বিকিরণ রামন পরীক্ষাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। লেসারের তীব্র একবর্ণী আলোর রেখার ব্যাপ্তি এত কম যে, তা আধ মিলিমিটার ব্যাসের সরু আকারে উপযুক্ত দর্পণের সাহায্যে খুব ছোট আয়তনের নমুনায় কেন্দ্রীভূত করা যায়। লেসার দিয়ে 8×10^{-9} লিটার নমুনায় রামন বর্ণালী পাওয়া যায়। এখন তাই বায়ব পদার্থে রামন বর্ণালী পাওয়া কোনও সমস্যাই নয়। গ্যাস্ লেসারের এমন কয়েকটি কাঁপনসংখ্যার আলো বেছে নেওয়া যায় যে, তা রঙীন পদার্থে শোষিত হয় না—ফলে রঙীন পদার্থের রামনপরীক্ষায় লেসার অপরিহার্য। লেসার বিকিরণের সবটাই সমবর্তিত হওয়ার ফলে তা থেকে পাওয়া রামন বর্ণালী কতটা সমবর্তিত নয় জেনে নিয়ে এখন অণুর স্পন্দনের সাম্যধর্মিতার মাত্রা নিরূপণ করা যায়। লেসার থেকে একটি যন্ত্র দিয়েই 60 cm^{-1} থেকে 4000 cm^{-1} তরঙ্গসংখ্যার সব রামন বর্ণালী পাওয়া যায়। জৈব রসায়নবিদ্‌দের প্রয়োজনীয় 60 cm^{-1} থেকে 400 cm^{-1} তরঙ্গসংখ্যার পাল্লায় লাল উজানী শোষণ পদ্ধতির জটিল যন্ত্রপাতি

নিয়ে এতদিন দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। যেসব অণুর বেলায় রামন এফেক্ট ও লাল উজ্জানীর শোষণ পদ্ধতি দুটিই কার্যকরী, এখন সেখানে এরকম লেসার রামন যন্ত্রকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

লেসার রামন বর্ণালীবিজ্ঞানের প্রয়োগ

1. রঙীন অণু—MX_6^{n-1} অষ্টতলীয় ($M = Re, Ir, Os, Pt, Pd$); $X = Cl, Br$)। এই অণু এত রঙীন যে, সাধারণ চোখে তা অস্বচ্ছ মনে হয়। লেসারের সাহায্যে এইসব অণুর রামন বর্ণালী ধরা পড়েছে, ফলে M ও X কীভাবে বাঁধা পড়ে, সেই বাঁধনের প্রকৃতিই বা কি, তা সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করা যায়।
2. অষ্টতলীয় $V(CO)_6^-$, $Cr(CO)_6$, $MO(CO)_6$, $W(CO)_6$, $Re(CO)_6^+$ অণুগুলি পারদ বাষ্পের উদ্ভাসী আলোতে বিকৃত হয় ও তাদের কাঠামো ভেঙে পড়ে। ফলে এতদিন এদের রামন বর্ণালী পাওয়া সম্ভব হয়নি। হিলিয়াম্-নিওন লেসারের লাল আলোতে এখন এইসব অণুর অবিকৃত অবস্থার রামন বর্ণালী ধরা পড়ছে। ফলে ধাতু ও কার্বন এইসব অণুতে যেভাবে জোট বাঁধে, সেই বাঁধন শক্তির একটা পরিমাপ পাওয়া যায়। দেখা যায়, এই শক্তি Re, Cr, W, V এর ক্রম অনুযায়ী যেন ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

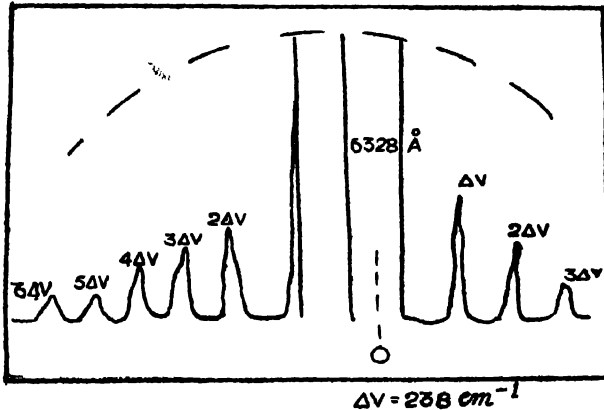


চিত্র 2.18 : $NbOCl_3$ অণুর (ক) কঠিন ও (খ) গ্যাসীয় অবস্থায় গঠনবিন্যাস—যা লেসার রামন বর্ণালীর সাহায্যে নির্ধারিত হয়েছে।

3. কঠিন, তরল ও বায়ব অবস্থায় XeF_6 এর রামন বর্ণালী নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, বায়ব ও অন্য দুটি অবস্থার অণুর গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। $NbOCl_3$ অণুর বায়ব অবস্থার ও কঠিন অবস্থার পার্থক্য রামন বর্ণালীতে ধরা পড়েছে।

4. লাল উজানী রশ্মিতে বিকৃত হয় এমন সব অস্থায়ী যৌগিক পদার্থে লেসারের সাহায্যে রামন বর্ণালী নিয়ে তাদের অজানা আণবিক সূত্র ধরা সম্ভব হয়েছে।
5. সিলিকা জেল্-এর উপর শোষিত Br, CCl_4 CS_2 ইত্যাদির রামন বর্ণালী লেসারের সাহায্যে সহজেই নেওয়া যায়। এতে শোষিত অ্যাসিটেলডি-হাইড্-এর রামন বর্ণালীতে তার ভিন্ন রূপ ধরা পড়েছে। তাই মনে হয়, এই পদ্ধতি অনুঘটক (Catalyst) প্রক্রিয়ার গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করবে।
6. কৃস্ট্যাল তৈরিতে গঠনের কতটুকু অসম্পূর্ণতা রয়েছে, লেসার রামন বর্ণালী সে তথ্য দিতে পারে।
7. পলিমার—সাধারণ প্ল্যাস্টিকের বোতাম, গিয়ার (gear) অথবা টিউবের রামন বর্ণালী লেসারের সাহায্যে সহজেই পাওয়া যায়। পলিভিনাইল ফ্লোরাইডের গঠনবিন্যাসে যে বিশৃঙ্খলা অন্যান্য পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল, লেসার রামন বর্ণালীতে তার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়েছে।
8. অনুনাদী রামন বর্ণালী : 1951 খ্রীষ্টাব্দে অণুর স্পন্দনজনিত মূল রামন-রেখার দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি অনুনাদী রামন বর্ণালী আবিষ্কৃত হয়—যা তত্ত্বের দিক দিয়ে ছিল অবশ্যম্ভাবী।

রঙীন পদার্থের নমুনায় উদ্ভাসী লেসার রশ্মির কাঁপন সংখ্যা ঐ নমুনার শোষিত হতে পারে এরকম কাঁপনসংখ্যার বাইরে নিতে হয়। তত্ত্বের দিক দিয়ে এই সত্য



চিত্র 2.19 : I_2^+ অণুর অনুনাদী রামন বর্ণালী। দ্রব ক্লোরোসালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষীণতর রামন বর্ণালী শোষিত হয়ে যায়। অনুনাদী রামন বর্ণালী ক্রমশ ক্ষীণতর হয় ও ব্যাপ্তিতে (width) বাড়ে। উপরের খাপছাড়া রেখাটি I_2^+ এর শোষণ কম্পাংকের পাল্লা, যার সর্বোচ্চ মান হল 6400 Å (অ্যাংস্ট্রম)।

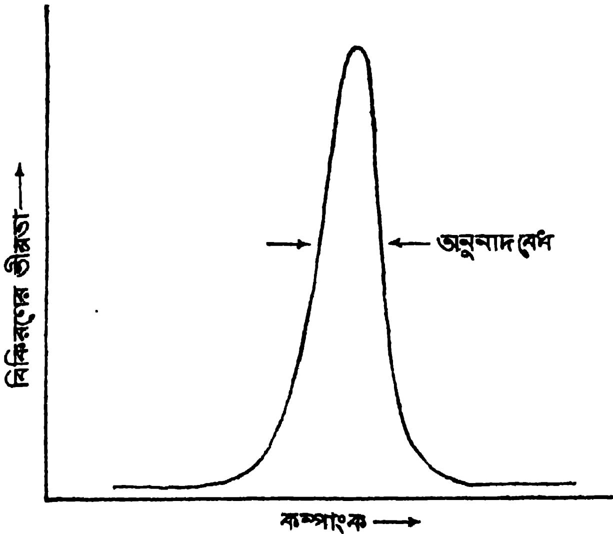
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, কোন নমুনায় সবচেয়ে বেশী শোষিত হতে পারে, এরকম কাঁপনসংখ্যার কাছাকাছি কোন উদ্ভাসী আলো নিজে বিক্ষিপ্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় এসব অনুনাদী রামন রেখা শোষণযোগ্য কাপনসংখ্যার বাইরে পড়বে ও শোষিত না হয়ে ধরা দেবে। এই উপায়ে গাঢ় নীল I_2^+ এর দ্রবণের 10^{-2} থেকে 10^{-4} মোলার ঘনীভবন অবস্থায় শোষণের সম্ভাবনা কম ও মূল রামন রেখার সঙ্গে উপস্বন বা ওভারটোনগুলি সহজেই পাওয়া যায়।

লেসার ও রামন এফেক্টের মিলিত পরীক্ষায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেসব ফল পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় রামন এফেক্ট নিয়ে এই শতাব্দীতে গবেষণার পরিমাণ অন্যান্য যে কোন আবিষ্কারের ফলাফলকে অতিক্রম করবে।

মোসবাওয়ার এফেক্ট

1961 খ্রীষ্টাব্দে মোস্‌বাওয়ার তাঁর আবিষ্কারের জন্য মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর নামানুসারে এই আবিষ্কার মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট নামে পরিচিত।

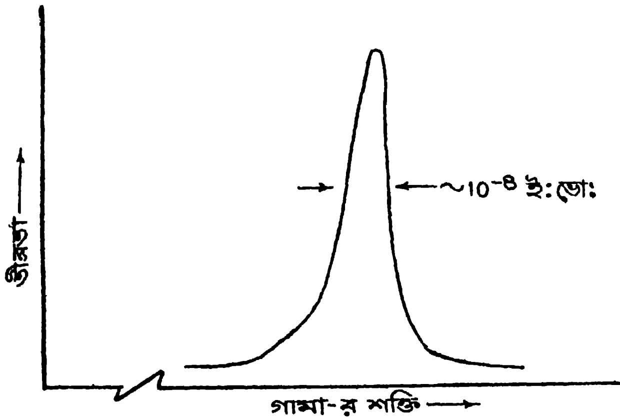
এই আবিষ্কারের তথ্যটুকু বলতে অনুনাদ (resonance) কথাটির বিশদ বিবরণ দিতে হয়। একটি টিউনিং ফর্কের আকার ও উপাদান থেকে দেখা যায় যে, তার একটি বিশেষ কাঁপনসংখ্যা আছে, একটু আঘাতেই তাতে ঐ কাঁপনসংখ্যার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই ফর্কটি যখন শান্ত অবস্থায় থাকে, কাছেপিঠে ঐ কাঁপনসংখ্যার শব্দের উপস্থিতিতে শান্ত ফর্কটি তার কাঁপনসংখ্যার শব্দ উৎপন্ন করে। এই হল অনুনাদ। দুটি শব্দের কাঁপন সংখ্যায় ইতর-বিশেষ থাকলেও অনুনাদ পাওয়া যাবে—তবে শান্ত ফর্কটির সাড়া দেওয়ার মাত্রার পরিবর্তন ঘটবে। শব্দের তীব্রতা ও কাঁপন-



চিত্র 2.20 : অনুনাদ বেধ।

সংখ্যার লেখচিত্র আঁকলে [চিত্র 2.20] অর্ধেক তীব্রতায় কাঁপনসংখ্যার ইতরবিশেষ থেকে এই সাড়া দেবার মাত্রা নির্ধারিত হয়। একে বলা হয় অনুনাদ বেধ (resonance width)। দুটি কাঁপনসংখ্যা যত কাছাকাছি হবে, এই বেধ ততই কমে যাবে।

বেতার তরঙ্গে তীব্রতার মাত্রা Q দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Q হল Quality factor বা গুণমান। তরঙ্গের শক্তি ও তার অনুনাদ বেধের অনুপাত দিয়ে গুণমান প্রকাশ করা হয়। কোন শক্তির মাত্রা যতই নিখুঁতভাবে মাপার চেষ্টা করা যাক্ না কেন, যে জড় পদার্থের উত্তেজনায় তার সৃষ্টি হয়েছে, সেই উত্তেজনার একটি সময়-কাল থাকে। যে শক্তিস্তরে এই উত্তেজনার সঞ্চার তারও সীমিত বেধ আছে। ফলে শক্তির বিকিরণ বেধহীন রেখা না হয়ে একটু মোটা হ'বে। এ হল অনিশ্চয়তাবাদের ফল। ধরা যাক্, পরমাণুর একটি নিউক্লিয়াস্ বাইরের শক্তিতে উত্তেজিত হয়ে 10^{-7} সেকেণ্ডে শান্ত হল ও তার শক্তি 23·8 হাজার ইলেকট্রন ভোল্ট গামা বিকিরণ।



চিত্র 2.21 : স্বাভাবিক বেধ (natural width)। অনিশ্চয়তাবাদের নিয়মে এই বেধ বর্ণালী রেখায় কমান যায় না।

বিকিরণের বেধ $=\dfrac{h \text{ আর্গ-সেঃ}}{2\pi \times 10^{-7} \text{ সেঃ}}$ গামা শক্তি মাপতে ঐ বিকিরণের বেধ হবে 10^{-8} ইলেকট্রন ভোল্ট [চিত্র 2.21] আরও যে সব কারণে এই বেধ বাড়বে তা হল প্রতিঘাত ও ডপ্‌লার এফেক্ট।

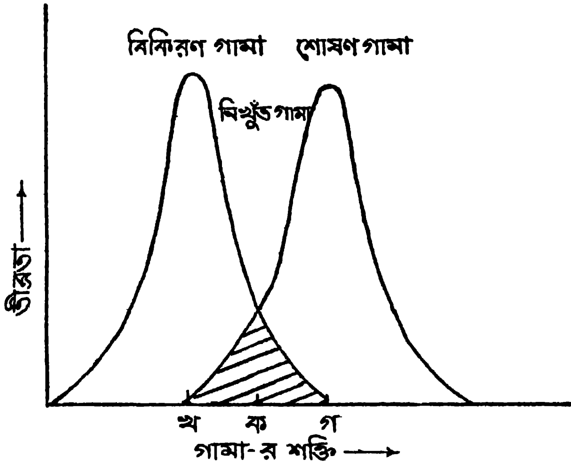
আলোর কথা ধরা যাক্—সোডিয়াম D বর্ণালী রেখার আলো সোডিয়ামে যে প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে, তার অনুনাদ বেধ 10^{-8} ইলেকট্রন্ ভোল্ট। এক ইলেকট্রন্ ভোল্ট শক্তির আলোতে এই বেধ 10^{8} গুণমান দেয়। আলোর এই উঁচু গুণমান লেসারের ক্ষেত্রে 10^{13} পর্যন্ত বাড়ান সম্ভব।

ফোটন যখন যে শক্তি নিয়ে পরমাণু থেকে বেরোয়, তার কিছু অংশ পরমাণুর প্রতিঘাতে নষ্ট হয়। পরমাণুর প্রতিঘাত শক্তি কম তাই আলোর রেখা যথেষ্ট সরু থাকে। গামা-রশ্মির শক্তি আলোর চেয়ে অনেক বেশী। 10^{4} ইলেকট্রন ভোল্টের

গামা বিকিরণের গুণমান হ'বে $10^4/10^{-8} = 10^{12}$ অথবা আরও উঁচু শক্তির গামার বেলায় বেশী। কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। যে পদার্থ থেকে গামা বিকিরণ হয় বা যে পদার্থে তার শোষণ হয় তার নিউক্লিয়াসের ভর থেকে প্রতিঘাত জনিত শক্তি দাঁড়াবে প্রায় 10^{-3} ইলেকট্রন ভোল্ট। কারণ,

$$\text{প্রতিঘাত শক্তি} = \frac{(\text{শক্তি})^2}{2 \times \text{ভর} \times (\text{আলোর গতিবেগ})^2}$$

10^{-3} সংখ্যাটি 10^4 ইঃ ভোঃ শক্তির তুলনায় নগণ্য কিন্তু স্বাভাবিক বেধ 10^{-8} থেকে অনেক গুণ বেশী। ফলে অনুনাদের বেলায় বিকিরণ ও শোষণজনিত গামারশ্মিতে



চিত্র 2.22 : বিকিরণ ও শোষণ জনিত একই গামারশ্মির অনুনাদে পার্থক্য।

যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাবে [চিত্র 2.22]। শোষণের বেলায় প্রতিঘাত শক্তি যোগ হয়ে বেধ বাড়বে। আসল গামা বিকিরণের শক্তির নিখুঁত মান বিকিরণ জনিত নীচু মানের ও শোষণ জনিত উঁচু মানের শক্তির গামা বিকিরণে চাপা পড়ে যাবে।

তাছাড়া, পদার্থের তাপীয় শক্তিতে নিউক্লিয়াসের যে ইতস্তত গতি থাকে, তার ফলে ডপ্‌লার এফেক্টের জন্য কাঁপনসংখ্যায় যেটুকু অপসরণ হবে তাতেও অনুনাদ বেধ বাড়বে। টিন 119 আইসোটোপের 23·8 হাজার ইঃ ভোঃ গামাতে প্রতিঘাত ও ডপ্‌লার বেধ হবে যথাক্রমে $2{\cdot}5 \times 10^{-5}$ ইঃ ভোঃ ও $1{\cdot}6 \times 10^{-2}$ ইঃ ভোঃ।

নীচু তাপমাত্রায় পদার্থকে রেখে দুরকমের বাড়তি বেধই কমান যায়, কিন্তু তাতে মাঝখানের চাপাপড়া নিখুঁত গামার পরিসরও কমে যায়। বরং নিউক্লিয়াসকে উত্তপ্ত করে আসল গামার পরিসর বাড়িয়ে কিছু অংশ অন্ততঃ পাওয়া যাবে। কিন্তু বিকিরণ

ও শোষণ রেখা দুটিকে মিলিয়ে দিতে না পারলে পুরা অনুনাদ তো আর পাওয়া যাবে না।

গামা বিকিরণের এই পটভূমিতে মোস্‌বাওয়ার এক চমকপ্রদ অথচ সহজ পন্থার আবিষ্কার করলেন যাতে প্রতিঘাত ও ডপ্‌লার বেধ নগণ্য হয়ে নিখুঁত অনুনাদ পাওয়া গেল। এতে অবশ্য অনিশ্চয়তাজনিত অনুনাদটুকুই রইল যা কমান যায় না। আলোর চেয়ে গামার শক্তি অনেক বেশী বলেই তাতে প্রতিঘাত ও ডপ্‌লার বেধ বেশী। অনুনাদ সেক্ষেত্রে নিখুঁত অবস্থায় পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মোস্‌বাওয়ার গামা বিকিরণ ও শোষণের উৎস হিসাবে নিলেন ক্রস্ট্যাল বা দানাবাঁধা পদার্থ। ক্রস্ট্যালে পরমাণুগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সাজান—ল্যাটিসে (lattice) যেন দড়ি দিয়ে বাঁধা। ল্যাটিসে পরমাণুর বন্ধন শক্তি প্রতিঘাত শক্তির তুলনায় কিছু কম নয়। এতে গামা বিকিরণ বা শোষণ হলে এই শেষোক্ত শক্তি ল্যাটিসের কম্পনে সব পরমাণুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রতিঘাত শক্তির সবটাই একটি নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে ক্রস্ট্যালের সব নিউক্লিয়াসের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ক্রস্ট্যালের ভর নিউক্লিয়াসের তুলনায় অনেক বেশী, তাই একটি নিউক্লিয়াসে তখন তা নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়।

তাপের প্রভাবে নিউক্লিয়াসগুলির ইতস্ততঃ গতির জন্য যে ডপ্‌লার বেধ, তাও ক্রস্ট্যালে নগণ্য হয়ে পড়ে। কারণ ক্রস্ট্যালে এরকম যথেচ্ছ গতিবিধি থাকতে পারে না এবং তাপীয় শক্তিটুকু ল্যাটিসের কম্পনে সব নিউক্লিয়াসগুলির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

মোসবাওয়ারের পরীক্ষায় যে নিখুঁত অনুনাদ পাওয়া যায়, তার বেধ যে প্রতিঘাত ও ডপ্‌লার এফেক্টে প্রভাবিত হয় নি, তা ঐ বেধের সঙ্কীর্ণতা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু মোস্‌বাওয়ার এফেক্টে এই বেধ এত সঙ্কীর্ণ যে সাধারণ গামা গণক যন্ত্রে তা ধরা দুষ্কর। বিকিরক ও শোষক ক্রস্ট্যালের মধ্যে একটা আপেক্ষিক গতিবেগ দিয়ে নিখুঁত অনুনাদ থেকে গামা রশ্মিটি কতটা সরে এসেছে তা মেপে ক্রস্ট্যালের সাহায্যে যে অনুনাদ পাওয়া গেছে—মোস্‌বাওয়ার তা প্রমাণ করেন। সেকেণ্ডে 10^{-2} সেণ্টিমিটার আপেক্ষিক গতিবেগ ও মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের অনুনাদকে বিনষ্ট করতে পারে। এ থেকে বোঝা যাবে যে, গামারশ্মির নিখুঁত অনুনাদের এই পরীক্ষাটি কত সূক্ষ্ম।

এত সূক্ষ্ম বলেই মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের সাহায্যে অনেক সূক্ষ্মতর পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে। বিকিরণ কোয়ান্টার ভরের উপর মহাকর্ষের প্রভাব আছে প্রমাণ করতে পারলে আইনস্টাইনের $E=mC^2$ সূত্রটি প্রমাণ করা যায়।

ধরা যাক্, বিকিরক ক্রস্ট্যাল থেকে গামারশ্মির কোয়ান্টা ক-দূরত্বে নীচের শোষক

ক্রস্ট্যালে সোজাসুজি নিক্ষিপ্ত হল। তখন কোয়াণ্টার অভিকর্ষ জনিত স্থৈতিকশক্তি তার ভর m ধরে নিয়ে, যে পরিমাণ কমবে তা হল

$$\text{কোয়াণ্টার ভর} \times g \times \text{ক} \; ; \; m = \frac{E}{C^2} \text{ হলে}$$

$$\text{এই পরিমাণ দাঁড়ায় } \frac{\text{কোয়াণ্টার শক্তি} \times g \times \text{ক}}{C^2}$$

g হল অভিকর্ষীয় ত্বরণ।

যে স্থৈতিক শক্তি কমবে তার পরিমাণ পেতে হলে শোষক পদার্থে আপেক্ষিক গতিবেগ দিয়ে নিখুঁত অনুনাদ ফিরিয়ে আনতে হবে। এই পরিমাণ থেকে কোয়াণ্টার ভর পাওয়া যাবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাউণ্ড ও রেব্‌কা মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের সাহায্য নিয়ে 21 মিটার উঁচু থেকে বিকিরণ ছুঁড়ে আইনস্টাইনের সূত্রের সফল পরীক্ষা করেছেন।

মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের সাহায্যে যন্ত্রবিজ্ঞান, নিউক্লিয়ার পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে। গত কয়েক বছরেই এ সম্পর্কে বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—আন্তর্জাতিক সম্মেলনও হচ্ছে। রামন এফেক্টের মত মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট ও পদার্থের ধর্ম নিরূপণে এ শতাব্দীতে এক বিশেষ ভূমিকা নেবে।

বেতার তরঙ্গ ও পরমাণু জগৎ

অণু ও অণুতরঙ্গ

দৃশ্য আলোর বর্ণালী থেকে অণু-পরমাণুর বিভিন্ন অবস্থার ধর্ম ধরা পড়ে। রামন এফেক্টের প্রসঙ্গে অদৃশ্য লাল উজানীর সাহায্যে অণুর স্বরূপ কীভাবে জানা যায় তা আলোচনা করা হয়েছে। 1945 খ্রীষ্টাব্দ থেকে লালউজানী বিকিরণের চেয়ে কম কম্পাংকের বেতার তরঙ্গ দিয়ে পদার্থের স্বরূপ জানা সম্ভব হচ্ছে। 3 মিলিমিটার থেকে 20 সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যের অণুতরঙ্গ (microwave) নিয়ে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গবেষণাগারে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। যেসব অণু-পরমাণুতে কিছু কিছু শক্তিস্তরের পার্থক্য 10^{-4} থেকে 10^{-6} ইলেক্ট্রন ভোল্টের মধ্যে পড়ে সেখানে এই তরঙ্গ তাদের স্বরূপ জানতে সাহায্য করে। এরকম অণুতরঙ্গ কোন গ্যাসের মধ্যে চালিত হলে গ্যাসের অণুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকিরণের কিছু অংশ শোষিত হয়। এরকম শোষণ বর্ণালী থেকে অণুর আয়তন, নির্দিষ্ট আয়তনে অণুর সংখ্যা, অণুগুলির মধ্যে কী পরিমাণ বল সক্রিয় এসব তথ্য সহজে জানা যায়।

অণুর স্পন্দন (vibration) ও আবর্তন (rotation) জনিত শক্তি স্তরগুলির পরিবর্তনে বিকিরণ বর্ণালী পাওয়া যায়। স্পন্দনজনিত বিকিরণ সাধারণতঃ দৃশ্য আলো ও লাল উজানী পর্যায়ে পড়ে, আবর্তনজনিত বিকিরণ লাল উজানী ও অণু-তরঙ্গের শক্তির পাল্লায় আসে। দুটি মিশে থাকলে বর্ণালীটি জটিল হয়। একই পরমাণুতে গড়া H_2, Cl_2 বা N_2 প্রভৃতি সম-অণু শুধু আবর্তনজনিত বর্ণালী বিকিরণ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু CO কার্বন মনোক্সাইডের মত অসম অণু আবর্তনজনিত বিকিরণে সক্ষম। এই বিকিরণ অণুতরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে—তখন অণুতরঙ্গের শোষণ পরীক্ষায় C ও Oর দূরত্ব সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়। COতে এই দূরত্ব $1{\cdot}1\times10^{-8}$ সেঃ মিঃ—এই পরিমাপ অণুতরঙ্গের পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। মেসার প্রসঙ্গে আমরা অ্যামোনিয়া অণুর আবর্তনজনিত শক্তিস্তরের পার্থক্য অণুতরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে—একথা উল্লেখ করেছি। এরকম অনেক উদাহরণ আছে।

একই মৌলিক পদার্থের একাধিক স্থায়ী আইসোটোপ আছে। যেমন ক্লোরিনের দুটি 35 ও 37 ভরসংখ্যা। এই দুটি আইসোটোপের মিশ্রিত আণবিক গ্যাসে ভারী আইসোটোপের স্পন্দন ও স্পিন হাল্কাটির চেয়ে একটু মন্থর বলে অণুতরঙ্গের বর্ণালীতে প্রত্যেক রেখা দুটিতে ভাগ হয়ে যাবে—একটির কম্পাংক অন্যটির চেয়ে কিছু কম। দুটির কম্পাংকের অনুপাত থেকে 35 ও 37 ক্লোরিনের ভরের অনুপাত পাওয়া যাবে। পরমাণু বর্ণালীর সূক্ষ্ম গঠনবিন্যাস বহু ক্ষেত্রেই অণুতরঙ্গের পাল্লায় পড়ে; এই সব বিন্যাসের শক্তিস্তর জানতে অণুতরঙ্গ বিকিরণ সাহায্য করে।

চুম্বকীয় অনুনাদ

সাধারণতঃ পরমাণুর কেন্দ্রীণ থেকে বেতার তরঙ্গের বিকিরণ হয় না। কেন্দ্রীণ বা নিউক্লিয়াসের আধান আছে—তাই তার চুম্বকত্বও আছে। নিউক্লিয়াস তার আপন অক্ষে লাটিমের মত ঘোরে—তাকে আমরা স্পিন বলি। 2.23 চিত্রে লাটিমের এরকম স্পিন ও মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে তার অক্ষের যে চলন হয় সেই চলনের (precession) বৃত্তপথ দেখান হয়েছে (চিত্র ক)। ঠিক একই রকম ঘটে কোন বাইরের চুম্বকক্ষেত্রে যদি নিউক্লিয়াসকে রাখা হয়। স্পিনরত নিউক্লিয়াসের অক্ষ তখন বৃত্তাকারে যে চলনের বৃত্ত রচনা করে তা (খ) চিত্রে দেখান হয়েছে। নিউক্লিয়াসের অক্ষ এই চলনে বিশেষ কয়েকটি দিকে অবস্থান করতে পারে। সেই অবস্থানের সংখ্যা তার স্পিনের উপর নির্ভর করে। স্পিন $s = \frac{a}{2}$ হলে এই অবস্থান $a + 1$ সংখ্যক হতে পারে।

(ক) মাধ্যাকর্ষণ

(খ) চুম্বক ক্ষেত্র

(গ) চুম্বক ক্ষেত্র

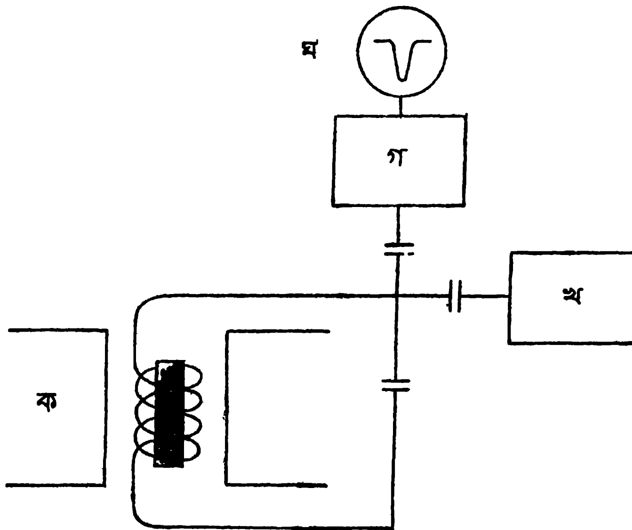
চিত্র 2.23 : (ক) অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে লাটিমের অক্ষের চলন।
(খ) চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে নিউক্লিয়াসের অক্ষের চলন।
(গ) নিউক্লিয়াসের চলনে অক্ষের বিভিন্ন অবস্থান।

(গ) চিত্রে একটি নিউক্লিয়াসের চলনে এরকম অবস্থান দেখান হল। চলনের কম্পাংক

কী হবে তা চুম্বকক্ষেত্রের শক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু নিউক্লিয়াসের অক্ষ কোন কোণে অবস্থান করবে তা চলনের কম্পাংকের উপর নির্ভর করে না। চলনের কম্পাংক বেতার তরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। 1939 খ্রীষ্টাব্দে রাবি এক বিশেষ পরীক্ষায় বিশেষ আকৃতির চুম্বক ও বেতার তরঙ্গের সাহায্যে গ্যাসীয় পরমাণুতে এই চলন কম্পাংক নির্ধারণ করেন। চুম্বক ক্ষেত্রের মান ও চলন কম্পাংক থেকে রাবির পদ্ধতিতে কোন নিউক্লিয়াসের স্পিন ও চুম্বকত্বের অনুপাত পাওয়া যায়। এই পরীক্ষায় যে পরমাণুগুলি চলন কম্পাংকের সমান বেতার তরঙ্গে অনুনাদী হয় সেগুলিই শুধু ধরা পড়ে।

নিউক্লীয় অনুনাদ

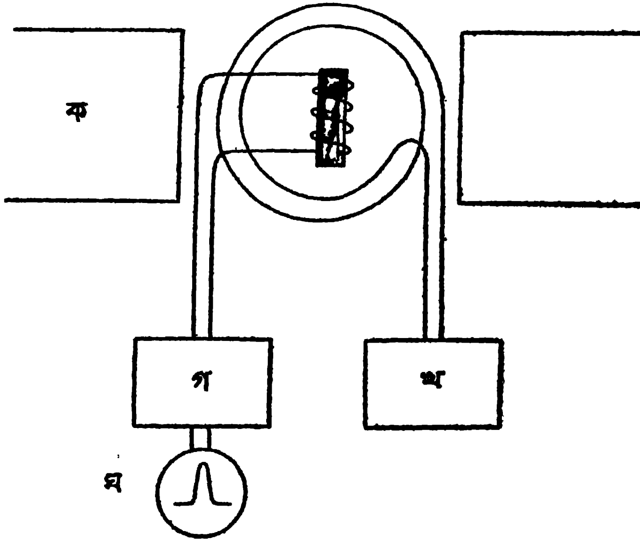
অনুনাদী পরমাণুর পরিবর্তে নিউক্লীয় অনুনাদ পরীক্ষায় অনুনাদ অবস্থায় বেতার তরঙ্গের বিকিরণ বা শোষণ পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষায় একটি স্থির চুম্বকের ক্ষেত্রে একটী আধারে কঠিন বা তরল পদার্থ থাকে। ইলেক্ট্রনগুলির বাড়তি চুম্বক-



চিত্র 2.24 : পার্সেল ও ব্লক এর পরীক্ষা।
ক—চুম্বক ক্ষেত্র, খ—বেতার আন্দোলক, গ—বেতার গ্রাহক,
ঘ—বেতার প্রবাহের শোষণ জ্ঞাপক চিত্র।

ক্ষেত্র যাতে না অসুবিধা ঘটায়, তজ্জন্য অপচুম্বকীয় পদার্থ নেওয়া হয়। পদার্থের নিউক্লিয়াসগুলির অক্ষ তখন চুম্বকক্ষেত্রের দিকে চারদিকে বিভিন্ন অবস্থানে চলন বৃত্তে ঘোরে। পদার্থটি একটি তারের কুণ্ডলীর মধ্যে থাকে। তারের কুণ্ডলীতে বেতার

তরঙ্গের প্রবাহ চুম্বকক্ষেত্রের দিকের সঙ্গে লম্বভাবে প্রবাহিত হয়। চুম্বকক্ষেত্রের মান অনুযায়ী নির্ধারিত চলন কম্পাংকের সঙ্গে বেতার তরঙ্গের কম্পাংক অনুনাদী হলে নিউক্লিয়াস একটি অবস্থান থেকে আর অবস্থানে লাফিয়ে পড়ে। এই দুটি অবস্থানের শক্তির পার্থক্যটুকু বেতার আন্দোলক থেকেই পাওয়া যায়, ফলে বেতার কুণ্ডলীতে ঐ কম্পাংকে প্রবাহের তীব্রতা হ্রাস পায় (চিত্র 2.24)। আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলে একটি গ্রাহক যন্ত্রে অনুরূপ শক্তির কম্পাংকের বেতার তরঙ্গ পাওয়া যায় (চিত্র 2.25)। বিকল্প পরীক্ষায় অনুনাদ অবস্থায় বেতার কুণ্ডলীতে কতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহের ঘাটতি পড়ছে তা মেপেও অনুনাদ নির্ধারিত হয়।



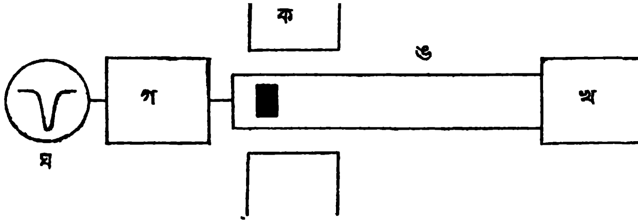
চিত্র 2.25 : ব্লক এর পরীক্ষা।
ক—চুম্বকক্ষেত্র, খ—বেতার আন্দোলক, গ—গ্রাহক যন্ত্র,
ঘ—বেতার প্রবাহের বিকিরণ জ্ঞাপক চিত্র।

এই সব পরীক্ষায় অনুনাদ পেলে নিয়োজিত বেতার তরঙ্গের কম্পাংক থেকে চলন কম্পাংক পাওয়া যাবে। ফলে নিউক্লিয়াসের স্পিন ও চুম্বকত্ব মাপা সহজ হয়। উল্লিখিত পরীক্ষাগুলিতে বায়ুশূন্য কক্ষের প্রয়োজন হয় না, তাই পরীক্ষাগুলি সহজ। তাছাড়া সামান্য পরিমাণ পদার্থ নিয়েও এই পরীক্ষা করা যায়।

উপ-চুম্বকীয় অনুনাদ

উপ-চুম্বকীয় পদার্থের ক্ষীণ চুম্বকত্ব থাকে। বাইরের চুম্বকক্ষেত্রে এই সব পদার্থের শক্তি স্তর তাই বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সব শক্তি স্তরের পার্থক্য নিউক্লিয়াসের

পরিবর্তে ইলেকট্রন থেকেই উৎপন্ন হয়। প্রোটনের মত ইলেকট্রনেরও স্পিন এবং চুম্বকত্ব আছে। তবে এর চুম্বকত্বের পরিমাণ প্রোটন থেকে বেশী। কারণ ইলেকট্রনের স্পিন বা চক্রনগতি প্রোটন থেকে দ্রুততর। প্রোটন থেকে হাল্কা বলে ও চুম্বকত্ব বেশী হওয়ায় বাইরের চুম্বকক্ষেত্রে ইলেকট্রনের অক্ষের চলন দ্রুততর হয়। ফলে এই চলনের কম্পাংক অণুতরঙ্গ পর্যায়ে পড়ে অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় 10000 মেগাসাইক্‌ল্‌স্‌ হতে



চিত্র 2.26 : উপ চুম্বকীয় পরীক্ষা।
ক—চুম্বকক্ষেত্র, খ—অণুতরঙ্গ উৎপাদনকারী আন্দোলক, গ—গ্রাহক যন্ত্র, ঘ—অণুতরঙ্গ শক্তির শোষণ। কাল অংশে নমুনা পদার্থ একটি অণুতরঙ্গবাহী নলে (wave guide) সন্নিবেশিত আছে।

পারে। 2.26 চিত্রে প্রদর্শিত উপ-চুম্বকীয় অনুনাদ পরীক্ষায় উপ-চুম্বকীয় বস্তুর শক্তিস্তরগুলির ধর্ম জানা সম্ভব হয়।

পরমাণু, নিউক্লিয়াস, অণু প্রভৃতির ধর্ম জানতে বেতার ও অণুতরঙ্গ বর্ণালী অনুসন্ধান এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জীববিজ্ঞান ও রসায়নে এই সব পরীক্ষার বহুল প্রয়োগ আছে।

3

কণা ও জড়জগৎ

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেলো
ক্ষণকালের ছন্দ,
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেলো
সেই তারি আনন্দ।

—রবীন্দ্রনাথ

মেসন ও নিউক্লীয় বল

বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানী চোখে আজ পর্যন্ত যে সব মৌলিক কণা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এরা আমাদের পরিচিত। ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি ভরের মেসন কণা বিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এই কণা পরীক্ষাগারে ধরা পড়ার আগে 1935 খ্রীষ্টাব্দে য়ুকাওয়া তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। তখন বিজ্ঞানীরা নিউক্লীয় বল নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। নিউক্লিয়াসে নিউট্রন প্রোটন কীভাবে বাঁধা পড়ে, সেই শক্তির স্বরূপ কী এসব তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সব মতবাদ গড়ে উঠতে থাকে, তার কোনটাই নিউক্লীয় বলের রহস্য সমাধান করতে পারেনি।

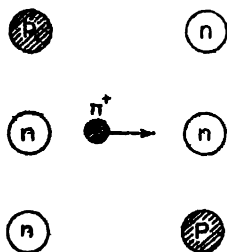
নিউক্লিয়াসে থাকে নিউট্রন ও প্রোটন। দুটি প্রোটনের আধান পজিটিভধর্মী হওয়ায় তাদের বিকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক, আবার একটি বিদ্যুৎহীন নিউট্রন ও একটি প্রোটনের মধ্যে অথবা দুটি নিউট্রনের মধ্যে কোন আকর্ষণ নাই। অথচ নিউক্লিয়াসে প্রত্যেকটি কণিকাই বিপুল শক্তিবলে আবদ্ধ থাকে ; বাইরের কোন প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া এই বাঁধন ভাঙা যায় না। এই বাঁধনের শক্তির উৎস যে বল তার স্বরূপ কি ? পরীক্ষায় দেখা গেল যে, এই বল বৈদ্যুতিক বলের মত দূরপ্রসারী নয়। এর পরিসর অল্প অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের 10^{-18} সেঃ মিঃ আয়তনেই এর অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ। এই বল আবার সংপৃক্তি (saturation)-ধর্মী। কতকগুলি পরমাণু যে ধরনের বলে অণুতে বাঁধা পড়ে, এর ধর্মও ঠিক অনুরূপ ; যেমন মিথেনএর কথা ধরা যেতে পারে। কার্বন পরমাণু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে বেঁধে রাখতে পারে, পঞ্চম হাইড্রোজেনের স্থায়ী জায়গা আর তাতে থাকে না। বৈদ্যুতিক শক্তি কিন্তু সংপৃক্তিধর্মী নয়, কারণ প্রত্যেকটি আধান অন্য আধানগুলির উপর কাজ করে, তাদের সংখ্যা যতই হোক না কেন। নিউক্লীয় বল সংপৃক্তিধর্মী বলে তাতে একটি কণিকা নিউট্রন বা প্রোটন একটিমাত্র কণিকার বাঁধনেই পরিতৃপ্ত। এই সংপৃক্তি ধর্ম ব্যাখ্যা করতে নিউক্লীয় বলকে বিনিময় বল ধরা যায়। দুটি কণা পরস্পরের রূপ বিনিময় করে নিউক্লীয় বলের সৃষ্টি করে। তাই নিউক্লিয়াসে অনবরত প্রোটন নিউট্রনে অথবা নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। ফলে তাদের আধান ও ভর একই থাকে অথচ সংপৃক্তি ধর্মের ব্যাখ্যা করা যায়। অণুতে পরমাণুদের বাঁধনের বলের প্রকৃতির সঙ্গে নিউক্লীয় বলের এই ধর্ম তুলনীয়।

কোয়াণ্টামবাদের সাহায্যে দেখা যায় যে, দুটি বিদ্যুৎকণার মধ্যে যে বৈদ্যুতিক বল তার অস্তিত্ব পরস্পরের ফোটন বিনিময়ের ফলে সম্ভব হয়। অর্থাৎ একটি

ইলেকট্রন অবাহ্যত একটি ফোটন অর্থাৎ আলোর কণা বিকিরণ করে, অন্য ইলেকট্রনটি সেই ফোটন শোষণ করে নেয়। অবাহ্যিক বলার অর্থ হল এই ফোটন বিনিময় বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস হলেও বাইরে ফোটনের অস্তিত্ব দেখা যায় না। নিউক্লিয়াসে ও নিউট্রন-প্রোটন, প্রোটন-প্রোটন-এর মধ্যে অবাহ্যিক মেসন কণার বিনিময়ই নিউক্লীয় শক্তির উৎস। নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন, একটি পজিটিভ মেসন ছেড়ে দিয়ে নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়, নিউট্রন সেই মেসন শোষণ করে প্রোটনে পরিণত হয়। আবার দুটি প্রোটন বা দুটি নিউট্রনের রূপান্তরে বিদ্যুৎহীন মেসনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। নিউট্রন থেকে প্রোটনের রূপান্তরে নেগেটিভ মেসন কণার প্রয়োজন এসে পড়ে। 1935 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ইউকাওয়া ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যবর্তী ভরের মেসন কণার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

ম্যাক্সওয়েলের বিখ্যাত সমীকরণে বিকিরণ ও তড়িৎ শক্তির যে ব্যাখ্যা ছিল, তাতে স্বল্পপরিসর নিউক্লীয় বলের ধর্ম আরোপ করে ক্লিন ও গর্ডন নতুন সমীকরণ তৈরি করেন। তাতে দেখা গেল যে, নিউক্লীয় বলের উৎস বিনিময়শীল কম্পিত মেসন কণার ভর ইলেকট্রনের প্রায় 200 গুণ হবে।

এই সমীকরণের সূত্র ধরে খুঁজে দেখা হল মেসনের সত্যি কোন অস্তিত্ব আছে কিনা? মেসনের উৎস হিসেবে নভোরশ্মি (cosmic rays)-কে বেছে নেওয়া হল। দ্রুত ইলেকট্রনের সংঘাতে বস্তুদেহ থেকে যেমন রঞ্জেনরশ্মির বিকিরণ হয়, নভোরশ্মির সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের কোন নিউক্লীয়াসের সংঘাতেও হয়ত মেসন উৎপন্ন হচ্ছে। 1936 খ্রীষ্টাব্দে অ্যাণ্ডারসন ও নেডার মায়ার নভোরশ্মিতে মেসনের অস্তিত্ব মেঘকক্ষের ছবিতে আবিষ্কার করেন। মেঘকক্ষে একখণ্ড সীসা রেখে নভোরশ্মির ছবিতে দেখা গেল যে, ঐ রশ্মির ইলেকট্রন সীসা ভেদ করতে পারে নি, অথচ কিছু কণা যেন সীসা ভেদ করেছে। তাদের গতিপথ ইলেকট্রনের পথ থেকে চওড়া। চুম্বকক্ষেত্রে মেঘ-কক্ষ রেখে দেখা গেল যে, এই সব কণিকার গতিপথ দুই বিপরীত দিকে বেঁকে যায়। ফলে প্রমাণ হল এরা পজিটিভ বা নেগেটিভ দুরকমের হতে পারে। চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি ও মেঘকক্ষে এদের গতিপথের বক্রতার সম্পর্ক থেকে এসব কণিকার ভরবেগ পাওয়া যায়; তা থেকে এইসব কণার তৎকালীন গতিবেগ হিসেব করে দেখা গেল যে এদের ভর ইলেকট্রনের প্রায় 210 গুণ। এরা মিউ মেসন (μ-meson)। নীচু খনির মধ্যেও এদের সাক্ষাৎ মেলে। মিউ মেসন নিউক্লীয় বলের উৎস হলে, বায়ু-

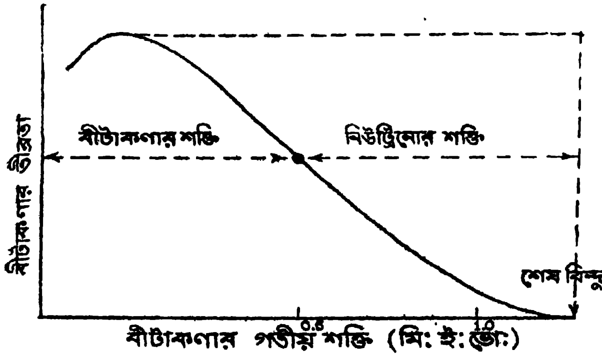


চিত্র 3.1: একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন π^+ মেসনের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব বিনিময় করে।

মণ্ডলের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে এদের প্রতিক্রিয়ায় এত দূর পথ এদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাহলে নিউক্লীয় বলের উৎস কি অন্য কোন কণা? 1947 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিস্টলের বিজ্ঞানীদল এরকম ভারী পাই (π) মেসন কণার সন্ধান পেলেন। ফোটোগ্রাফিক প্লেটে বিশেষ অবদ্রব মাখিয়ে নভোরশ্মি থেকে এই কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল। এর গড় আয়ুষ্কাল 10^{-8} সেকেণ্ডের মত, ভর ইলেকট্রনের প্রায় 276 গুণ। পাই মেসন মিউ মেসনে রূপান্তরিত হয়।

1948 খ্রীষ্টাব্দে বার্কলের সাইক্লোট্রনে 380 Mev আলফা কণা বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত করে পজিটিভ ও নেগেটিভ পাই মেসন উৎপাদিত হল। বার্কলের সিনক্রোটনে উৎপাদিত 330 Mev রঞ্জেনরশ্মি কোন পদার্থে আঘাত করে 70 Mev গামা রশ্মি পাওয়া যায়। এই গামা রশ্মি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এরা জুড়ি বেঁধে চলে অর্থাৎ কোন কণার বিনাশে এর উৎপত্তি। এই কণা বিদ্যুৎহীন পাই মেসন—এদের ভর π^+ বা π^- এর মত হলেও গড় আয়ুষ্কাল কম। আজকাল কণা ত্বরণ যন্ত্রে মেসন সহজেই উৎপন্ন করা যায়। রেখাকার ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে হফ্স্ট্যাডার প্রায় এক বিলিয়ন ভোল্ট ইলেকট্রন দিয়ে মেসন যে নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত তা প্রমাণ করেছেন।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আল্‌ফা, বীটা ও গামার স্বতঃবিকিরণ হয়। বীটাকণা ইলেকট্রন অথবা পজিট্রন। নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন বা পজিট্রন থাকে না—তাহলে বীটাকণার উৎস কোথায় ? নিউক্লিয়াসে একটি নিউট্রন যদি প্রোটনের রূপ নেয়, তখন এই স্থায়ী রূপান্তরের ফলে ইলেকট্রন সৃষ্টি হয় আর তা নিউক্লিয়াসে থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রোটন নিউট্রনে পরিণত হলে পজিট্রন বেরোয়। এতে বিদ্যুৎ আধানের নিত্যতা বজায় থাকে। মেসনের মাধ্যমে বিনিময় ক্রিয়ার মত এই তেজস্ক্রিয়া অবাহ্যিক নয়। বীটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ইলেকট্রন বা পজিট্রন অবিরাম ধারায় বেরিয়ে আসে। এইসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বভাবতঃই অস্থায়ী। নির্গত বীটা কণাগুলির শক্তি ও গতিবেগ সমান নয়। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, এসব কণা হয়ত বেরুবার পথে কিছু শক্তি হারিয়ে ফেলে। পরীক্ষায় দেখা যায় এ ধারণা ঠিক নয়। এলিস্‌ ও উস্টার বীটা তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম ই নিয়ে পরীক্ষা করলেন—এতে গামা রশ্মি নেই বললেই চলে। এই পরীক্ষায় একটি সীসার বাক্সে রেডিয়াম ই রেখে সীসার দেয়ালে তাপমাত্রা ও রেডিয়াম ই-র তাপমাত্রা মাপা হল। নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে আসতে যদি বীটা কণা কিছু শক্তি হারিয়ে



চিত্র 3.2 : বীটা কণার গতীয় শক্তির সঙ্গে তীব্রতার সম্পর্ক। কালো গোলকচিহ্নিত বীটাকণা কত শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে আর অদৃশ্য নিউট্রিনোর শক্তিই বা কত তা দেখানো হয়েছে।

থাকে তবে তা রেডিয়াম ই-র তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেবে। এই তাপের মোট পরিমাণকে নির্গত বীটা কণার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে নির্গত সবচেয়ে শক্তিশালী বীটা কণার শক্তির সঙ্গে মিলে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই ভাগফল দাঁড়াল বীটা কণাগুলির গড়

শক্তির পরিমাণ। তাহলে কি বীটা কণাগুলি নিউক্লিয়াস থেকেই ভিন্ন গতিবেগ পায়? না, তাও নয়। তা যদি হত তাহলে বিভিন্ন শক্তির বীটা কণার বর্ণালীর বিশেষ বিশেষ রেখা পাওয়া যেত। কিন্তু এই বর্ণালী অবিরাম। বিভিন্ন সংখ্যার সব শক্তির বীটা কণাই এই বর্ণালীতে রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি শক্তির বীটা কণা থেকে যাদের শক্তি কম, তাদের এই কমতি শক্তি কে কেড়ে নেয়—দীর্ঘদিন এ প্রশ্নের সমাধান হয়নি। পউলি নিউট্রিনো নামে একটি প্রায়-ভরহীন নিরপেক্ষ মৌলিক কণার অস্তিত্ব দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করেন। সব বীটা কণাই নিউট্রিনো সঙ্গে নিয়ে বেরোয়—কমতি শক্তিটুকু নিউট্রিনোর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এখন তেজস্ক্রিয়া-মুক্ত নিউট্রনের বেলায় নীচের মত দাঁড়ায়ঃ

নিউট্রন $(n)\rightarrow$প্রোটন $(p)+$ইলেকট্রন $e^{-}+$ নিউট্রিনো (ν)

সঙ্গত কারণেই একটি কণা নিউট্রন থেকে তিনটি কণার উৎপাদন সম্ভব নয়। কণা ও বিপরীত কণার সংখ্যার সমতা থাকবে—সে প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। তাই সঙ্গের নিউট্রিনোটি হল বিপরীত কণা অ্যাণ্টিনিউট্রিনো $(\bar{\nu})$ অর্থাৎ

$$n\rightarrow p+e^{-}+\bar{\nu}$$

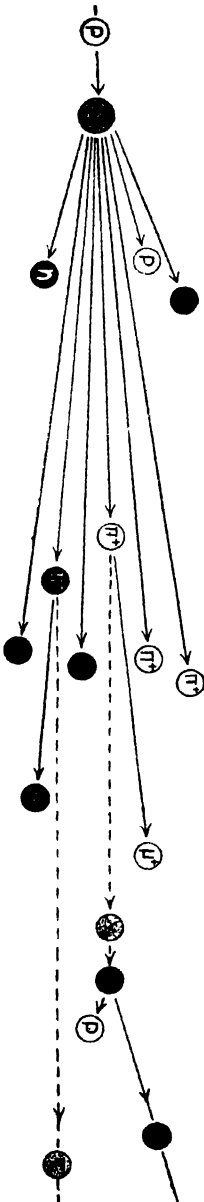
পজিট্রনের বেলায়

প্রোটন $(p)\rightarrow$ নিউট্রন $(n)+$ পজিট্রন $(e^{+})+$ নিউট্রিনো (ν)

সবচেয়ে শক্তিশালী বীটার বেলায় নিউট্রিনো বা অ্যাণ্টিনিউট্রিনো শক্তি হয় সবচেয়ে কম। বীটা ও নিউট্রিনো বা অ্যাণ্টিনিউট্রিনোর শক্তি মিলে সর্বোচ্চ শক্তি বজায় রাখে। নিউট্রিনো প্রায়-ভরহীন বলে তার ভেদশক্তি বেশী, তাই এলিস্ ও উস্টারের পরীক্ষায় সীসার দেয়ালে নিউট্রিনো শোষিত হয় না, ফলে এদের শক্তি-জনিত তাপ পরীক্ষায় পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

নিউট্রিনোর অস্তিত্বকে আরো দৃঢ় করেছে কৌণিক ভরবেগের (angular momentum) নিত্যতার নিয়ম। নিউট্রন বা প্রোটনের স্পিন $\frac{1}{2}$। নিউক্লিয়াসের প্রোটন নিউট্রনসমষ্টি জোড় সংখ্যা হলে স্পিন হবে পূর্ণসংখ্যা, আর বিজোড় হলে স্পিন হবে অর্ধসংখ্যাযুক্ত। বীটা কণার অর্থাৎ ইলেকট্রনের স্পিন $\frac{1}{2}$, নিউক্লিয়াসে নিউট্রন প্রোটনসমষ্টি বীটা নির্গমনে একই থাকায় তার স্পিনের হ্রাস পূর্ণসংখ্যক হওয়াই উচিত। বীটা কণার স্পিন $\frac{1}{2}$ ও নিউট্রিনোর স্পিন $\frac{1}{2}$ ধরে নিলে তবেই এরকম তেজস্ক্রিয়ায় স্পিনের নিত্যতা বজায় থাকে। নিউট্রিনো মতবাদের সমর্থনে এ হল আর একটি বড় প্রমাণ।

বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে বন্দুকটি পিছনের দিকে প্রতিঘাত পায়। গুলির ভরবেগ অবশ্যই এই প্রতিঘাত ভরবেগের সমান। কিন্তু বন্দুকের ভরগুলির চেয়ে বেশী, তাই তার গতিবেগ সামান্য। নিউটনের এই সূত্রটি বীটা নির্গমনের বেলায়ও



চিত্র 3.3 : বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে ν_μ ও $\bar{\nu}_\mu$-এর উৎপাদন।

খাটবে। বীটা কণা বেরুলে নিউক্লিয়াসও প্রতিঘাত পায়। ক্রেন ও হালপার্ন মেঘকক্ষে রেডিও ফসফরাস নির্গত ইলেকট্রনের গতিপথ ও প্রতিঘাতপ্রাপ্ত ফসফরাস নিউক্লিয়াসের গতিপথের ছবি তুলে গণনায় দেখেন যে ইলেকট্রনের তুলনায় নিউক্লিয়াসের প্রতিঘাত বেগ অনেক বেশী। এ থেকে বোঝা যায় বিদ্যুৎহীন নিউট্রিনো মেঘকক্ষে ধরা পড়েনি, তার গতিবেগও অজানা থেকে গেছে। তাই নিউক্লিয়াসের বাড়তি প্রতিঘাত বেগ নিউট্রিনোর হারানো শক্তি দিয়েই শুধু সামঞ্জস্য করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির নিত্যতা থেকে নিউ-ক্লিয়াস ও বীটা কণার ভর জানা থাকলে নিউট্রিনোর ভরও জানা যায়। এরকম পরীক্ষা যথেষ্ট ত্রুটিহীন না হলেও নিউট্রিনোর ভর সম্পর্কে যে আভাস দেয় তাতে তা ইলেকট্রনের 20 ভাগের একভাগ হতে পারে।

অস্থায়ী পাই মেসন মিউমেসন ও নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়। মিউমেসনও অস্থায়ী। এদের রূপান্তরেও নিউট্রিনো উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে সব নিউট্রিনোর প্রকৃতি বীটা নিউট্রেনো থেকে আলাদা, তাই এদের মিউনিউট্রিনো বলা হয়। মেসন ও তেজস্ক্রিয়ার রূপান্তর নীচের মত প্রকাশ করা যায়:

$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \; ; \quad \pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

আর বীটা নিউট্রিনোর বেলায় দেখা যায়:

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$$
$$p \to n + e^+ + \nu_e$$

মিউ নিউট্রিনো ও ইলেকট্রন নিউট্রিনো আর তাদের বিপরীত কণা মিলে চারটি ν_μ, $\bar{\nu}_\mu$, ν_e, $\bar{\nu}_e$ কণাই প্রায়-ভরহীন, আধানহীন; কিন্তু ν_μ থেকে ν_e বা ν_e থেকে ν_μ উৎপন্ন করা যায় না।

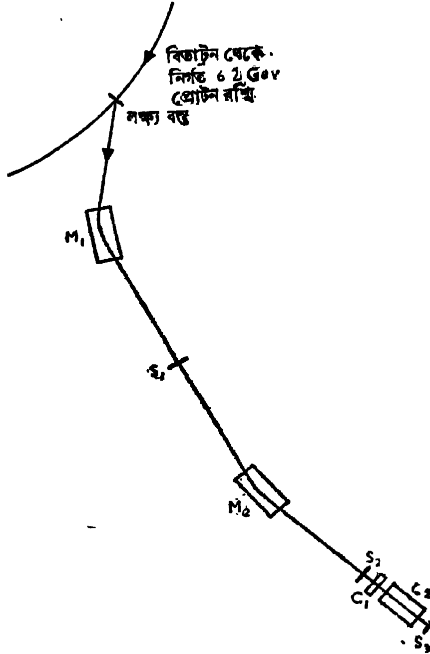
ব্রুকহাভেনের 33 বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট ত্বরণ যন্ত্রে নীচের প্রতিক্রিয়ায় গণনানুযায়ী হারে মিউমেসন উৎপন্ন হয়:

$$\nu_\mu + p \to \mu^+ + n$$
$$\nu_\mu + n \to \mu^- + p$$

কিন্তু $\nu_\mu + p \rightarrow e^+ + n$ অথবা $\nu_\mu + n \rightarrow e^- + p$ এরকম প্রতিক্রিয়া কখনও ঘটে না। তার কারণ ν_μ ν_e থেকে পৃথক কণা বলেই ν_μ এর প্রতিক্রিয়ায় ইলেকট্রন উৎপন্ন হয় না।

ব্রুকহ্যাভেন 15 Gev প্রোটনের আঘাতে বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রন π^- ও π^+ উৎপাদন করে—তাদের ক্ষয়ে মিউ নিউট্রিনোর জন্ম হয়। মিউ-নিউট্রিনো (অথবা অ্যাণ্টি নিউট্রনো) কখনও কখনও নিউট্রন (অথবা প্রোটনের) সঙ্গে ক্রিয়ায় মিউমেসনের সৃষ্টি করে। 3.3 চিত্রে এই পদ্ধতিতে ν_μ এর উৎপাদন দেখান হল। এভাবে উৎপাদিত ν_μ দিয়ে তার ধর্ম পরীক্ষা করা যায়।

ডির‍্যাক্ বিপরীত কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইলেক্ট্রন-এর বিপরীত পজিট্রন আবিষ্কার হওয়াতে ডির‍্যাকের তত্ত্ব প্রমাণিত হল। আইনস্টাইনের জড় ও শক্তির তুল্যমূল্যতার নিয়ম থেকে দেখা যায় যে ইলেক্ট্রনের ভর আধামিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোল্ট শক্তির সমতুল। তাই এক মিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোল্টের বেশী



চিত্র 3.4 : অ্যান্টিপ্রোটন উৎপাদনের যান্ত্রিক পদ্ধতি। M_1, M_2 বিক্ষেপী (deflecting) চুম্বক, দুটি বিক্ষেপী চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে ফোকাসকারী চুম্বক ও তেজস্ক্রিয়ানিরোধী আবরণ থাকে, তা চিত্রে দেখানো নাই। S_1, S_2, S_3 সিন্টিলেশন কাউন্টার, C_1, C_2 শেরেনখভ কাউন্টার। C_1 থাকে বিষমাপতনে অর্থাৎ অ্যান্টিপ্রোটন ছাড়া অন্য কণিকার সন্ধান দেয়। C_2, S_1, S_2 সমাপতনে অ্যান্টিপ্রোটন সন্ধানী।

কোন গামারশ্মির কোয়াণ্টা থেকে ইলেক্ট্রন পজিট্রনের জুড়ির আবির্ভাব ঘটে—আবার এরূপ জুড়ির বিনাশে অনুরূপ শক্তির বিকিরণ হয়। প্রোটনের ভর 936 Mev

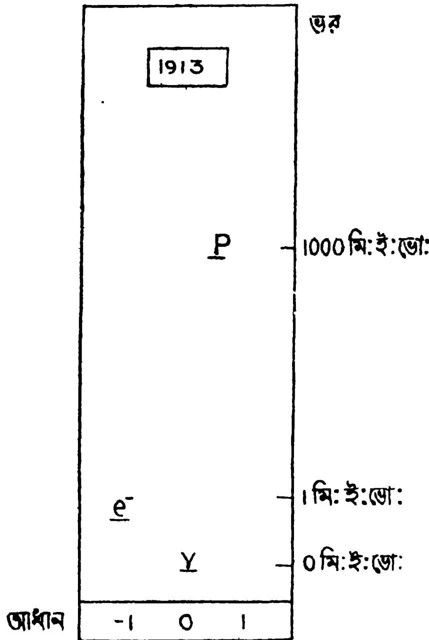
সমতুল, তাই তার বিপরীত কণা অ্যান্টিপ্রোটন উৎপাদনের জুড়ি গঠনে প্রায় 2000 Mev শক্তির গামার প্রয়োজন।

1955 খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণাগারে চেম্বারলেন ও সেগ্রে 6·2 Gev শক্তির বিভাট্রন থেকে নির্গত প্রোটনের সঙ্গে তামার সংঘাত ঘটিয়ে অ্যান্টিপ্রোটন আবিষ্কার করেন*। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরকম সংঘাতে অন্তত 60টি অ্যান্টিপ্রোটনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কারণ অ্যান্টিপ্রোটনের সঙ্গে অন্য ধরনের হাজার হাজার কণা থাকে। তাঁরা এমন একটি বিশদ ব্যবস্থায় পরীক্ষাটির পরিচালনা করেন যাতে অন্য কণা থেকে পৃথক করে অ্যান্টিপ্রোটন চেনা যায়। এই আবিষ্কারের জন্য চেম্বারলেন ও সেগ্রে 1959 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ে অ্যান্টিপ্রোটন যে কোন পজিটিভ নিউক্লিয়াসে শোষিত হয়। 1965 খ্রীষ্টাব্দে শক্তি থেকে জুড়িগঠন প্রক্রিয়ায় প্রোটন ও অ্যান্টিপ্রোটন উৎপাদন প্রথম সম্ভব হয়। প্রোটন থেকে নিউট্রনের রূপান্তরের কথা আগেই বলা হয়েছে। অ্যান্টিপ্রোটন কি তবে অ্যান্টিনিউট্রনে রূপান্তরিত হতে পারে? পজিট্রন ইলেকট্রনের বিপরীত কণা, তাদের আধানও বিপরীত। কিন্তু বিদ্যুৎহীন নিউট্রন ও তার বিপরীত কণা অ্যান্টিনিউট্রনের পার্থক্য কোথায়? এই পার্থক্য হল তাদের স্পিন বিপরীতমুখী। অবশ্য সবকণা বিপরীত কণার বেলায় এই নিয়ম দেখা যায়। অ্যান্টিডয়েটরন, অ্যান্টিহিলিয়াম আইসোটোপ্‌ও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাই বিপরীত বস্তু বা বিপরীত জগৎ এখন খুব অলীক কল্পনা নয়।

মৌলিক কণা

ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও মেসন প্রভৃতি যেসব কণার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি—এদের বলা হয় মৌলিক কণা। এদের কেউ কেউ স্থায়ী নয়। জড় ও শক্তির পরস্পর রূপান্তর থেকে এসব মৌলিক কণার স্থির ভরের (rest mass) শক্তি-তুল্যমূল্যতার নির্দিষ্ট মান আছে। 1913 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলিক কণা ইলেকট্রন, প্রোটন ও গামা কোয়াণ্টার এই মান 3.5 চিত্রে দেখান হয়েছে।



চিত্র 3.5 : 1913 খ্রীষ্টাব্দে মৌলিক কণা বলতে যা বোঝাত ও তাদের স্থির ভর।

মৌলিক কণাগুলির ভর খুব কম বলেই এসব কণাতে জড়ের তরঙ্গধর্ম সহজে বোঝা যায়। এদের গতিবেগ যত বেশী হয়, তরঙ্গদৈর্ঘ্যও তত কমতে থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম যে কাজে লাগান হয় তা আগেই বলা হয়েছে। এক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত ইলেকট্রনের শক্তি বাড়িয়ে তার

তরঙ্গদৈর্ঘ্য এত ছোট করা যায় যে, এরকম মাইক্রোস্কোপে একটি বড় অণুও আলাদা-ভাবে ধরা পড়ে।

কণার গতিবেগ ও তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মোটামুটি হিসেব থেকে দেখা যায় যে পরমাণুতে সীমাবদ্ধ কণার গতিবেগ সাধারণতঃ 10^{-8} সেণ্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেশী নয়। কণাত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমিয়ে 10^{-14} সেণ্টিমিটার, এমনকি অদূর ভবিষ্যতে 10^{-16} সেণ্টিমিটারও করা যেতে পারে।

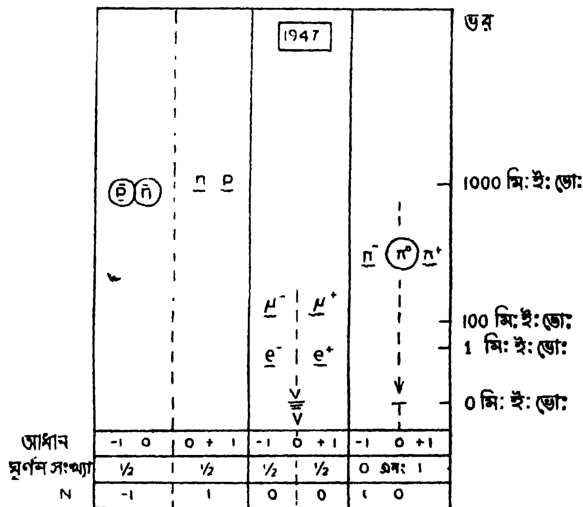
1900 খ্রীষ্টাব্দে পরমাণুবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছিল আর 1930 খ্রীষ্টাব্দে নিউক্লীয় বিজ্ঞানের শুরু। নিউট্রন প্রভৃতি মৌলিক কণার আবিষ্কারে তার অগ্রগতির সূচনা হল। 1932 খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হল ইলেকট্রনের বিপরীত কণা পজিট্রন। 3.6 চিত্রে 1933 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলিক কণার মোটামুটি

আধান	0	1	-1	0	1	0
ঘূর্ণন সংখ্যা	½		½			1

চিত্র 3.6 : 1933 খ্রীষ্টাব্দে আধান, স্পিন অর্থাৎ ঘূর্ণন সংখ্যা এবং স্থির ভরসহ আবিষ্কৃত ν, $\bar{\nu}$ সহ মৌলিক কণা।

আভাস পাওয়া যাবে। 3.7 চিত্রে 1947 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলিক কণা ও যেগুলি আবিষ্কৃত হয়নি তা বৃত্তের মধ্যে দেখানো হয়েছে। আধান সংযুগ্ম সমতার (charge conjugation symmetry) ধারণা তখন সবে জন্ম নিয়েছে। গণিত-ভিত্তিক এই ধারণায় কণা ও বিপরীত কণা মিলিতভাবে নিত্যতার একটি নিয়ম বজায় রাখে। চিত্রের তিনটি স্তম্ভের মধ্যে বিন্দু রেখা দিয়ে কণা ও বিপরীত কণার

দর্পণ ছায়া দেখানো হয়েছে। π^0 ও γ নিজেরাই তাদের বিপরীত কণা। π, μ, n মৌলিক কণা অস্থায়ী, আবার e^-, e^+, ν এসব কণা স্থায়ী। অস্থায়ী কণা স্থায়ী ছোট ছোট কণায় ভেঙে পড়ে। ν, $\bar{\nu}$, γ কণার ভর নেই, এদের আরো ছোট কণায় ভেঙে পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। e^+ বা e^- কণার আধান বাড়তে বা কমতে



চিত্র 3.7 : 1947 খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত মৌলিক কণার বর্ধিত সংখ্যা যার নিউক্লীয় আধান সংখ্যা N = নিউট্রন + প্রোটন – অ্যান্টিনিউট্রন-অ্যান্টিপ্রোটন।

পারে না তাই এই কণিকাগুলিও স্থায়ী। তবে প্রোটন স্থায়ী কেন ? কেন প্রোটন একটি ইলেকট্রন ও একটি ফোটনে ভেঙে পড়ে না ? তার কারণ এরকম বিক্রিয়ায় নিউক্লিয়ন আধান সংখ্যা N এর নিত্যতা বজায় থাকে না। N হল নিউক্লিওন কণাসমষ্টি অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রোটন বিযুক্ত অ্যান্টিনিউট্রন ও অ্যান্টিপ্রোটনের সমান।

মৌলিক কণার আধুনিক রূপ

1947 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মৌলিক কণার এই সব আবিষ্কারে তেমন কোন জটিল প্রশ্ন ছিল না। পরে ম্যাঞ্চেস্টারে রচেস্টার ও বাট্‌লার মেঘকক্ষে এমন দুটি ছবি পান যাতে মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তাধারা দেখা দেয়। কোন বিদ্যুৎহীন মৌলিক কণা থেকে উপজাত এসব কণা ইলেকট্রন থেকে 1000 গুণ ভারী। 1949 খ্রীষ্টাব্দে পাওয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা ইমালসনের ছবিতে ভারী τ টাউ মেসনের সন্ধান পেলেন—যা তিনটি মেসনে ভেঙে পড়ে। এদের বলা হয় অপরিচিত

(strange) কণা। নভোরশ্মি ছাড়া ত্বরণযন্ত্রেও এসব কণা পাওয়া যায়। 3.8 চিত্রে 1961 পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোট 30টি মৌলিক কণা দেখানো হল।

ভর

	অ্যান্টি বেরিয়ন	বেরিয়ন	লেপটন	অ্যান্টি লেপটন	বোসন
	$\bar{\Xi}^{0}$ $\bar{\Xi}^{-}$	Ξ^{-} Ξ^{0}	1961		
	$\bar{\Sigma}^{-}$ $\bar{\Sigma}^{0}$ $\bar{\Sigma}^{+}$	Σ^{-} Σ^{0} Σ^{+}			
	$\bar{\Lambda}^{0}$	Λ^{0}			
1000 মি: ই:ভো:	$\bar{p}$ $\bar{n}$	n p			
					K^{-} K^{0} $\bar{K}^{0}$ K^{+}
					π^{-} π^{0} π^{+}
			μ^{-}	μ^{+}	
100 মি: ই:ভো:			e^{-}	e^{+}	
1 মি: ই ভো:					
0 মি: ই: ভো:			ν	$\bar{\nu}$	γ
আধান	−1 0 +1	−1 0 +1	−1 0	0 +1	−1 0 +1
ঘূর্ণন সংখ্যা	1/2	1/2	1/2	1/2	0 এবং 1
N	−1	1	0	0	0
l	0	0	1	−1	0

চিত্র 3.8 : 1961 খ্রীষ্টাব্দে মৌলিক কণার রূপ। l হল লেপ্টন সংখ্যা।

এদের তিনটি শ্রেণী—বেরিয়ন-অ্যান্টিবেরিয়ন; লেপটন-অ্যান্টিলেপটন; বোসন। প্রত্যেক শ্রেণীতে বিন্দুরেখার দুটিকে কণা ও বিপরীত কণা দেখানো হয়েছে। বৃত্তাঙ্কিত কণাগুলি তখনও অনাবিষ্কৃত—পরে অবশ্য সেগুলির আবিষ্কার হয়েছে।

মৌলিক কণার উৎপাদনে, তাদের সংঘাতজনিত বিক্রিয়ায় তাদের গতিবিধি ও ধর্মের যে সব নিত্যতা বজায় থাকে, তার কিছু আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। বিক্রিয়ার আগে ও পরে ভরবেগ, কৌণিক ভরবেগ বা স্পিন, ভর তুল্যমূল্য শক্তিসহ গতীয় ও স্থৈতিক শক্তি এসবের নিত্যতা বজায় থাকে। তাছাড়া আরও কিছু নিত্যতার নিয়ম আছে। যেমন বৈদ্যুতিক আধান; যে কোন বিক্রিয়ায় আধান নিত্য থাকে, যেমন ঃ

$$p^{+}+p^{+}\rightarrow p^{+}+p^{+}+\pi^{0}$$

এই বিক্রিয়ার বাঁয়ে ও ডাইনে আধান সংখ্যা সমান আছে তাই বিক্রিয়াটি ঘটতে পারে অথবা

$$p^{+}+p^{+}\rightarrow p^{+}+p^{+}+\pi^{+}+\pi^{-}$$

এই বিক্রিয়াও সম্ভব, কারণ এতে আধানের নিত্যতা বজায় থাকে। কিন্তু একটি কাল্পনিক বিক্রিয়া

$$p^+ + p^+ \nrightarrow p^+ + p^+ + \pi^+$$

কখনই ঘটতে পারে না—কারণ এখানে আধানের নিত্যতা বজায় থাকছে না। এই প্রসঙ্গে আধান সংযুগ্ম সমতা বা charge conjugation-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আধান সংযুগ্ম ক্রিয়া হল একটি কণার বৈদ্যুতিক আধানের চিহ্ন উল্টে দেওয়া। কণাটি যদি বিদ্যুৎহীন হয় আর যদি তার আভ্যন্তরীণ আধানের কোন গঠনবিন্যাস থাকে, এই ক্রিয়ায় তার ঐ বিন্যাসটি বিপরীত হয়ে যায়। যেমন, নিউট্রনের কেন্দ্রে একটি প্রোটন আছে ধরে বাইরে π^- মেসনের আবরণ কল্পনা করা হয়। আধান সংযুগ্মী নিউট্রন এর কেন্দ্র হবে অ্যান্টিপ্রোটন ও বাইরে π^+। আসলে তখন এর আসল রূপ হল অ্যান্টিনিউট্রন। তাই আধান সংযুগ্ম ক্রিয়া হল কণাকে বিপরীত কণায় রূপান্তর।

এখন ইলেকট্রন ও প্রোটন-এর বিক্রিয়ায় এ দুয়ের গতি যে তড়িৎচুম্বকীয় বল দিয়ে নির্ধারিত হয়, পজিট্রন ও অ্যান্টিপ্রোটনের গতির বেলায়ও সেই বলের নিয়মই খাটবে। এর অর্থ হল আধান সংযুগ্ম ক্রিয়াতে সাধারণ বিক্রিয়ার ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু তখন যদিও কণাগুলি বিপরীত কণায় পরিণত হয়।

আর একটি নিত্যতার নিয়ম হল বেরিয়ন ও লেপটন সংখ্যার নিত্যতা কোন বিক্রিয়ায় বজায় থাকে। এখানে স্পিন সম্পর্কে আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। স্পিনের একক হল $h/2\pi$, h = প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা। পার্থিব অণু-পরমাণু বা মৌলিক কণা সব কিছুরই স্পিন এই এককের অর্ধসংখ্যার বা পূর্ণসংখ্যার গুণফল হ'বে। যেসব মৌলিক কণার স্থিরভর শূন্য নয় ঐ এককে তাদের স্পিন $\frac{1}{2}$, π ও K মেসনের স্পিন 0, 1, নিউক্লিয়াস, পরমাণু বা অণুর অথবা নতুন কিছু মেসনের (ω, ρ) স্পিন 1, 0 অথবা বেশী। ভরহীন কণাদের ভেতর নিউট্রিনোর স্পিন $\frac{1}{2}$, ফোটনের 1, গ্র্যাভিটনের হওয়া উচিত 2; 1, 0 বা পূর্ণসংখ্যক স্পিনের কণা—ফোটন গ্র্যাভিটন এবং π, K এক বা একাধিক সংখ্যায় সৃষ্টি বা ধ্বংস হতে পারে অবশ্য সেই বিক্রিয়ায় যদি অন্য নিত্যতাবাদগুলি বজায় থাকে। পর্যাপ্ত শক্তি থাকলে একটি প্রোটন আর আর একটি প্রোটনকে আঘাত করে নীচের বিক্রিয়ায় একটি π^+ সৃষ্টি করতে পারে :

$$p + p \rightarrow n + p + \pi^+$$

অবশ্য যদি এই বিক্রিয়ায় মোট শক্তি, ভরবেগ ও কৌণিক ভরবেগ এসবের নিত্যতা বজায় থাকে।

অন্য সব মৌলিক কণা নিউট্রিনো, মিউমেসন, নিউক্লিওন ও হাইপেরণ তাদের সংখ্যার নিত্যতা বজায় রাখে। এদের একটি শ্রেণী ν, $\bar{\nu}$, μ^+, μ^-, e^-, e^+ হল লেপটন (lepton=light weight), নিউক্লয়ন, হাইপেরন এরা হল বেরিয়ন শ্রেণীর (baryon=heavy weight)। কোন বিক্রিয়ায় লেপটন বিযুক্ত অ্যাণ্টিলেপটনের সংখ্যার নিত্যতা বজায় থাকে। বেরিয়ন বিযুক্ত অ্যাণ্টিবেরিয়ন সংখ্যার নিত্যতাও বজায় না থাকলে সেই বিক্রিয়াও অচল। নিউক্লিয়ন p, n এবং হাইপেরণ Λ^0, Σ^+, Σ^-, $\Sigma^0 \Xi^-$ এবং Ξ^+ এসব বেরিয়নগোষ্ঠীর ; এদের বিপরীত কণাগুলি অ্যাণ্টিবেরিয়ন।

$\Lambda^0 \rightarrow p^+ + \pi^-$ বিক্রিয়াটি সম্ভব কারণ বেরিয়ন Λ^0 ডাইনে আর একটি বেরিয়ন p-তে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন দিকেই অ্যাণ্টিবেরিয়ন নেই-তাই বেরিয়ন বিযুক্ত অ্যাণ্টিবেরিয়ন সংখ্যা এই বিক্রিয়ায় নিত্য রয়েছে। কিন্তু

$\Lambda^0 \rightarrow \bar{p} + \pi^0$ বিক্রিয়াটি অচল কারণ দুদিকের বেরিয়ন অ্যাণ্টিবেরিয়ন সংখ্যার পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে -2।

লেপটনের বেলায় $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu + \bar{\nu}$ বিক্রিয়া চলতে পারে, μ^+ অ্যাণ্টিলেপটন -1 ডানদিকে $(-1)+(-1)+(+1)=-1$ হওয়ায় লেপটনের নিত্যতা বজায় থাকে। কিন্তু $\mu^+ \rightarrow e^+ + v + v$ বিক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ দুদিকের লেপটন সংখ্যার পার্থক্য $+2$।

$\bar{\nu} + p \rightarrow n + e^+$ বিক্রিয়ায় লেপটন সংখ্যার নিত্যতা বজায় থাকে বলে তার সম্ভাবনা $\bar{\nu} + n \rightarrow p + e^-$ থেকে অন্ততঃ হাজার গুণ বেশী।

আবার এমন দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন $n \rightarrow \pi^+ + e^-$ এবং $p \rightarrow \pi^0 + e^+$ এই দুটি ক্রিয়াই অচল কারণ বেরিয়ন বা লেপটন্ কোন সংখ্যারই নিত্যতা এই দুটি বিক্রিয়ায় বজায় থাকে না। এরকম বিক্রিয়া ঘটে না বলেই p বা n থেকে নিউক্লিয়াস গড়ে উঠতে পারে এবং অণুপরমাণুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়।

বিভিন্ন পরীক্ষায় লেপটন ও বেরিয়ন সংখ্যার নিত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে বেরিয়নের সংখ্যার নিত্যতা এত সুপরীক্ষিত যে সাধারণ পদার্থে নিউট্রন বা প্রোটন ইলেকট্রন পজিট্রন ও পাইমেসনে ভেঙে পড়ে না। নিউক্লিয়নের আধান সংখ্যার নিত্যতা থেকে প্রোটনের ইলেকট্রন ও ফোটনে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাও নেই, তা আগেই বলা হয়েছে।

মুক্ত নিউট্রন যে প্রোটন, ইলেক্ট্রন ও অ্যাণ্টিনিউট্রিনোতে পরিণত হয়, তাতে লেপটন সংখ্যার নিত্যতা অবশ্যই বজায় থাকে।

বুদ্‌বুদ্‌ কক্ষের হাইড্রোজেনের সঙ্গে মৌলিক কণার সংঘাতে যে সব বিক্রিয়া ঘটে তাতেও সবরকমের নিত্যতাবাদের নিয়ম বজায় থাকে। এরকম কয়েকটি বিক্রিয়া দেখান হল :

$$\bar{p} + p \rightarrow \Lambda^0 + \Lambda^0$$
$$\Lambda^0 \rightarrow \pi^- + p$$
$$\bar{\Lambda}^0 \rightarrow \pi^+ + \bar{p}$$
$$\bar{p} + p \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^- + \pi^-$$

মৌলিক কণার স্বরূপ

মৌলিক কণাগুলির আবিষ্কারের পর তাদের আকার ও ধর্ম নিয়ে অনেক তথ্যই প্রকাশ পেল। 1951-52 খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় দেখা গেল অতি উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণিকার সংঘাতে প্রচুর অপরিচিত মৌলিক কণার সৃষ্টি হয়। এদের আকার প্রায় 10^{-10} সেণ্টিমিটার আর যে সব কণিকার সংঘাতে এদের সৃষ্টি, তাদের গতিবেগ আলোর কাছাকাছি অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় 3×10^{10} সেণ্টিমিটার। ফলে দেখা যায় প্রায় 10^{-23} সেকেণ্ডের মত সময়ের মধ্যে যে সংঘাত ঘটে তাতেই এসব কণিকা উৎপন্ন হয়। এই সব কণিকার গড় আয়ুষ্কাল 10^{-10} সেকেণ্ড। এ সময় যথেষ্ট অল্প হলেও সংঘাত সময়ের তুলনায় তা প্রায় 10^{13} গুণ বেশী। একই মৌলিক কণার সৃষ্টি ও ক্ষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সময় ও শক্তির এই বিপুল ব্যবধান যথেষ্ট রহস্যময়। এর সমাধানে বলা যায় যে, এই সব মৌলিক কণার সৃষ্টির সময় অনেকগুলি কণার এক সঙ্গে জন্ম হয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে তীব্র বিক্রিয়ায় জড়িত—এমনকি সহজাত অন্যান্য কণিকার সঙ্গেও। কিন্তু এদের ক্ষয়ের বিক্রিয়া ক্ষীণ। 1নং সারণীতে বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ ও আপেক্ষিক তীব্রতা দেখানো হয়েছে। নিউক্লীয় শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা পাইমেসন সৃষ্টির বিক্রিয়া তীব্র ; কিন্তু π থেকে মিউমেসন সৃষ্টি একটি ক্ষীণ বিক্রিয়া।

সারণী 1

বিক্রিয়া	আপেক্ষিক তীব্রতা
তীব্র (নিউক্লীয়)	1
তড়িৎ চুম্বকীয়	$\sim 10^{-2}$
ক্ষীণ	$\sim 10^{-13}$
মহাকর্ষ	$\sim 10^{-38}$

এই সব অপরিচিত কণার একসঙ্গে জন্ম নেওয়ার নিয়ম থেকে আর একটি নিত্যতাবাদের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হল অপরিচয়ের (strangeness) সংখ্যার (S) নিত্যতা। লেপটন, ফোটন প্রভৃতির বেলায় অপরিচয়ের সংখ্যা নির্ধারণ সম্ভব না হলেও অন্যান্য মৌলিক কণার অপরিচয়ের এই সংখ্যা নির্ধারিত। যেমন পাইমেসন, নিউক্লীয়ন এদের বেলায় এই সংখ্যা 0, K^+ এর $+1$, Σ এর -1 ইত্যাদি। এই সংখ্যার নিত্যতা বজায় থাকে বলেই

$$\pi^+ + p \rightarrow \Sigma^+ + K^+$$

বিক্রিয়াটি সম্ভব হয় কিন্তু $\pi^+ + p \not\rightarrow \Sigma^+ + \pi^+$ বিক্রিয়াটি অচল, কারণ এতে অপরিচয়ের সংখ্যায় -1 পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু অপরিচিত কণার ক্ষয়ের ক্ষীণ বিক্রিয়ায় এই নিত্যতা বজায় থাকে না।

ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েলের মতবাদ থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়ার খুঁটিনাটি আমাদের অজানা নয়। মহাকর্ষ বড় বড় জ্যোতিষ্কের বেলায় খাটলেও মৌলিক কণার ক্ষেত্রে তা ক্ষীণ। মহাকর্ষ, তীব্র, ক্ষীণ ও তড়িৎচুম্বকীয় বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক বলগুলি সম্পর্কে আমাদের যে সব ধারণা রয়েছে, তাদের সমন্বয় সম্ভব হলে বিশ্বের স্বরূপ জানা যাবে।

মৌলিক কণা সম্পর্কীয় যে সব নিত্যতাবাদের নিয়ম আমরা আলোচনা করেছি; তা থেকে কিছুটা পৃথক অথচ স্পিনের মতই মৌলিক কণাগুলির একটি ধর্ম 'আইসোটোপিক স্পিন' শুধু তীব্র বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলিক কণার বেলায় খাটে।

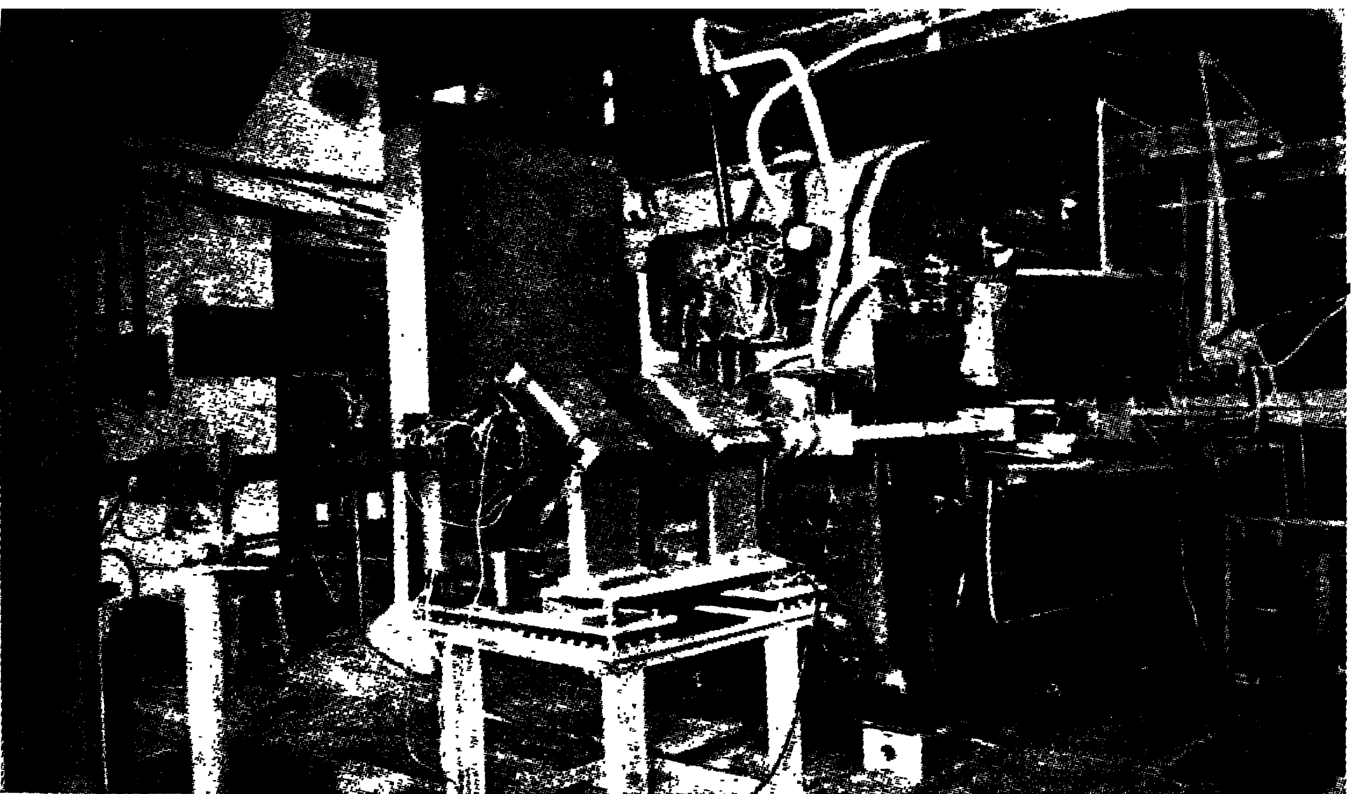
কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে জানা যায় যে, সাধারণ স্পিন s সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করলে, s স্পিনের মৌলিক কণার $2s+1$ সংখ্যক অবস্থান থাকতে পারে। লেপটন কণার $s=\frac{1}{2}$ বলে তার স্পিন দুরকমের হতে পারে $(2\times\frac{1}{2}+1)$; $+\frac{1}{2}$ ওপরের দিকে স্পিন অথবা $-\frac{1}{2}$ নীচের দিকে। অনুরূপভাবে আমরা প্রোটনের কাল্পনিক আইসোটোপিক স্পিন উপরের দিকে ও নিউট্রনের নীচের দিকে ধরতে পারি। একই মৌলিক পদার্থের যেমন একাধিক আইসোটোপ থাকে, নিউক্লিয়নের দুটি রূপ নিউট্রন এবং প্রোটনও এভাবে আইসোটোপিক স্পিন দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এই স্পিন I হলে $2I+1$ সংখ্যক অবস্থান দেখা যাবে। নিউক্লিয়নের বেলায় $I=\frac{1}{2}$। অর্থাৎ প্রোটন $+\frac{1}{2}$ ও নিউট্রন $-\frac{1}{2}$ আইসোটোপিক স্পিন হবে। Λ^0 কণার আইসোটোপিক স্পিন 0, তাই তার একটি কণাই দেখা যায়। π মেসনের আইসোটোপিক স্পিন 1, তাই $2\times1+1=3$টি মেসন রয়েছে π^+, π^- ও π^0। তীব্র বিক্রিয়ায় সাধারণ স্পিনের মত আইসোটোপিক স্পিনেরও নিত্যতা বজায় না থাকলে বিক্রিয়াটি ঘটতে পারবে না। এই নিত্যতাবাদের নিয়ম তাই তীব্র বিক্রিয়ার বেলায় শুধু খাটবে।

নিত্যতাবাদের অর্থ হল অপরিবর্তনীয়তা। কোন বস্তুর গতিবেগ থাকলে, তার যে সরলরেখায় সরণ হয়, দেশের স্থানাংক সমান্তরাল ও থার পরিবর্তনেও সেই বস্তুর ভরবেগ নিত্য থাকবে। বস্তুর কৌণিক ভরবেগ দুরকমের হ'তে পারে, (এক), কোন বাইরের অক্ষের চারদিকে তার আবর্তন গতি থাকতে পারে ও (দুই), তার নিজের অক্ষের চারদিকে তার চক্রন বা ঘূর্ণন গতি হতে পারে। প্রথমটিকে আমরা বলি কক্ষীয় গতি ও দ্বিতীয়টিকে বলি স্পিন। এই দুটি নিয়ে মোট কৌণিক ভরবেগ কোনও বস্তুর থাকলে, তার গতির অক্ষ সমান্তরাল-এর পরিবর্তে যদি $90°$ বা ঐ রকম কোণে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তবে ঐ বস্তুর মোট কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা বজায় থাকে। দেশের পরিবর্তনে বস্তুর রৈখিক ও কৌণিক ভরবেগ অপরিবর্তনীয়—আর এই থেকেই ভরবেগের নিত্যতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। কোন পরীক্ষায় দুটি কণার সংঘাতের নির্দিষ্ট সময়ের পরে তাদের পরস্পর দূরত্ব, কৌণিক গতি ইত্যাদির যে ফল পাওয়া যাবে, অন্য সময়ে সেই পরীক্ষায়ও একই ফল পাওয়া যাবে। সময়ের ভিত্তিতে পরিবর্তন ঘটলেও সরণের এই অপরিবর্তনীয়তা থেকে শক্তির নিত্যতাবাদের জন্ম। অবশ্য শক্তির মাপকাঠিতে ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতাও বিবেচনা করতে হ'বে। যেমন $K^0 \not\rightarrow \pi^+ + \pi^- + \pi^0 + \pi^0$ এই বিক্রিয়াটি ঘটতে পারে না, কারণ K^0 এর স্থিরভরের শক্তি চারটি π এর ঐ শক্তির চেয়ে কম। 100 Mev গতীয় শক্তির π^- দিয়ে $\pi^- + p^+ \not\rightarrow 2\pi^0 + n$ বিক্রিয়া একই কারণে ঘটতে পারে না, যদিও $\pi^- + p^+ \rightarrow \pi^0 + n$ বিক্রিয়া ঘটা সম্ভব।

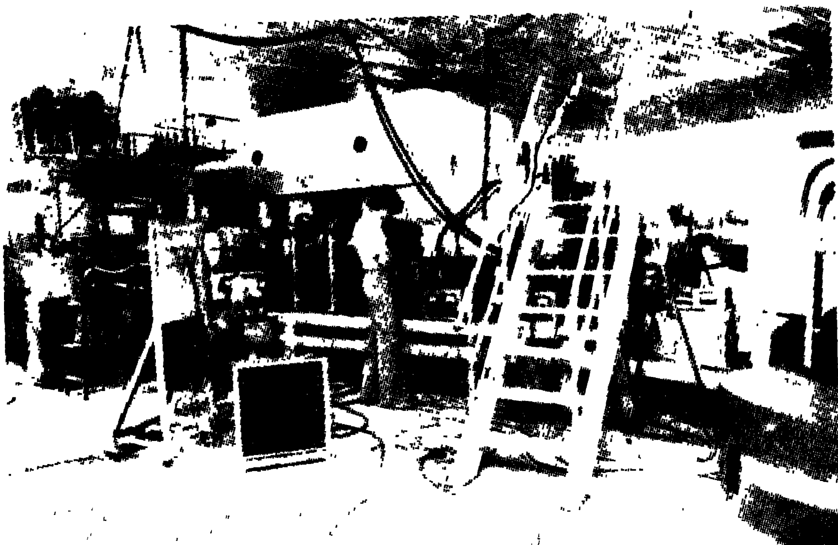
দেশ ও কালের যে পরিবর্তনে ভরবেগ ও শক্তির নিত্যতা প্রতিষ্ঠিত তা অবিরাম বলা যেতে পারে—কারণ যে কোন মানের পরিবর্তন দিয়ে এদের নিত্যতা পরীক্ষা করা যায়। আধানের নিত্যতার বেলায় অবিরাম কিছু পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে না, তাই গেজ্ পরিবর্তনেও (gauge transformation) আধানের নিত্যতা বজায় থাকে। গেজ্ বলতে আমরা 'মাপকাঠি' কথাটি ব্যবহার করতে পারি। আধান সংযুগ্মতায় কণা বিপরীত কণার অপরিবর্তনীয়তার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু কিসের পরিবর্তনে লেপটন ও বেরিয়ন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে, তা আজও অজানা রয়েছে। আইসোটোপিক স্পিন ও অপরিচয়ের সংখ্যার নিত্যতা থাকে যথাক্রমে আইসোটোপিক স্পিন দেশ ও অপরিচয়ের দেশের পরিবর্তনে। সাধারণ দেশ বা space-এর ধারণা থেকে এদের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

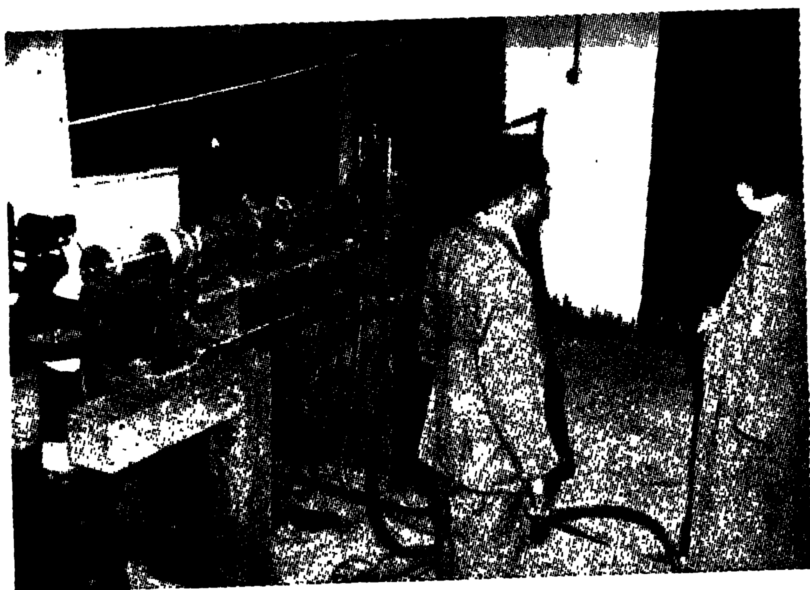
দেশ ও কালের অবিরাম পরিবর্তনে ভরবেগ ও শক্তির নিত্যতার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু এরকম অবিরাম পরিবর্তনের বদলে যদি দেশ বা কালের স্থানাংক উল্টে দেওয়া যায় তবে তার ফল বিক্রিয়ায় কি প্রভাব বিস্তার করবে? ধরা যাক্, ঘড়ির কাঁটা উল্টে দেওয়া গেল—সময় তখন সামনে না এগিয়ে পিছু হঠছে। বিক্রিয়ার



1. সাহা ইন্‌স্টিট্যুটের 4 Mev প্রোটন সাইক্লোট্রন



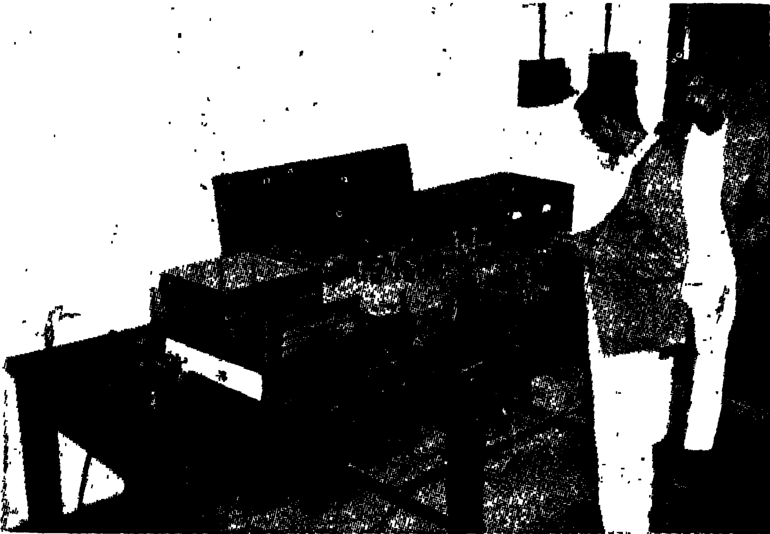
2. বিধান নগরস্থিত ভাবা গবেষণা কেন্দ্রের সাইক্লোট্রন



3. সাহা ইন্‌স্টিট্যুটে নি মত ভারতের প্রথম ইলেকট্রনমাইক্রোস্কোপ । াশে গ.বষণাগার পরিদর্শনরত মাদাম ইরিনকুরী জোলিও এবং অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ।



4. সাহা ইন্‌স্টিট্যুটে নির্মিত ককক্রফ্‌ট ওয়ালটন কণাত্বরক।



5. সাহা ইন্‌স্টিট্যুটে চল্লিশের দশকে নির্মিত ভারতের প্রথম গাইগার কণাসন্ধানী যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক বিদ্যুৎবর্তনী।



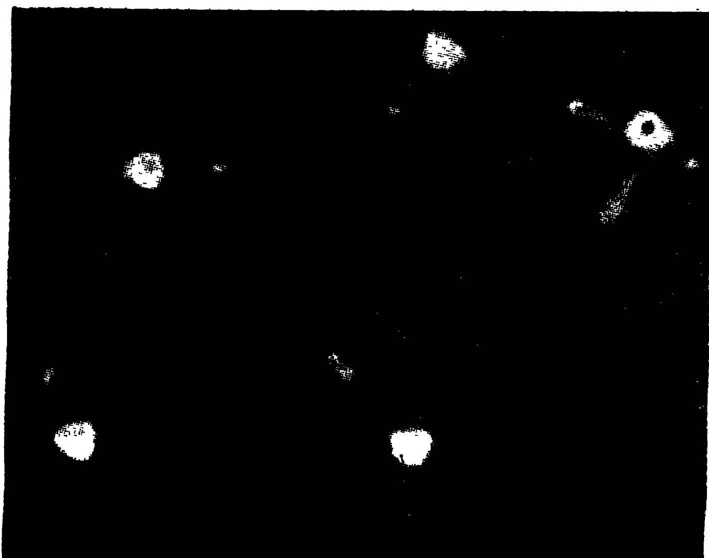
6. প্রিজম্ লেসার রশ্মির প্রতিসরণ। লেসার রশ্মি কত সরু হতে পারে এই পরীক্ষাটি তার নিদর্শন।



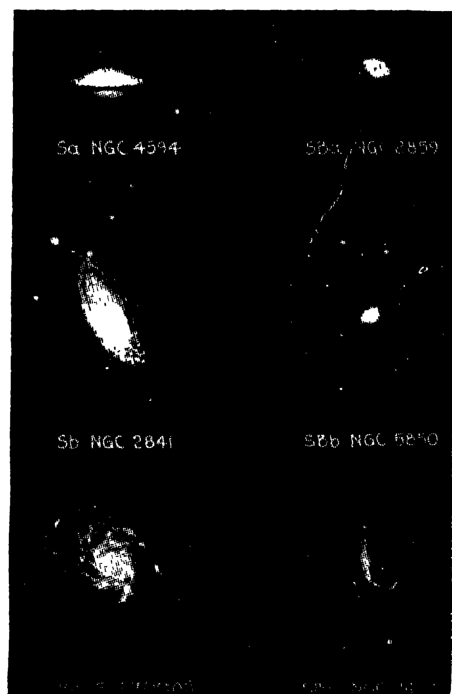
7. 100 মাইক্রোওয়াট্ শক্তির ক্ষুদে He-Ne লেসার।



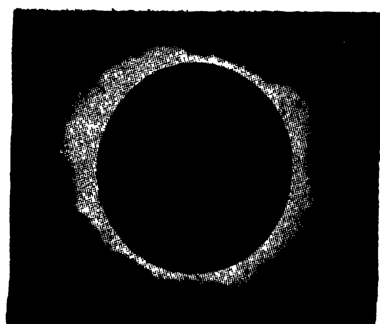
8. সাহা ইন্‌স্টিট্যুটে তৈরি বিশেষ ধরনের ম্যাসস্পেকট্রোমিটার যন্ত্র



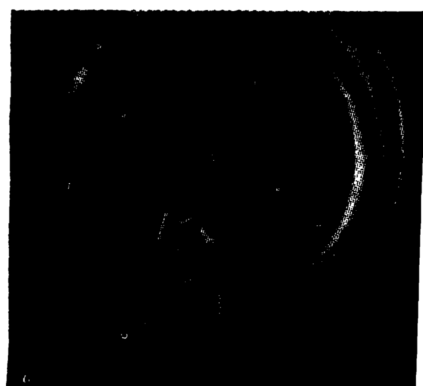
9. মাথা ও লেজওয়ালা কলেরা ভাইরাস



10. বিভিন্ন শ্রেণীর কুণ্ডলিত ছায়াপথ।



11. পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় দৃষ্ট কোরোনার চিত্র।



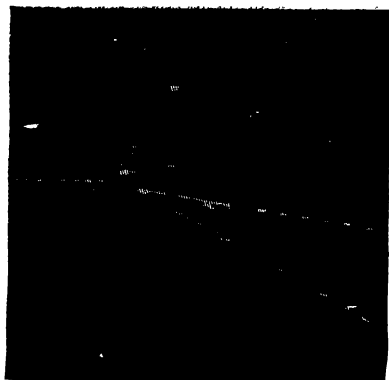
12. সাধারণ মেঘকক্ষে রেডিয়াম থেকে নির্গত আলফা কণার গতিপথের আলোকচিত্র।



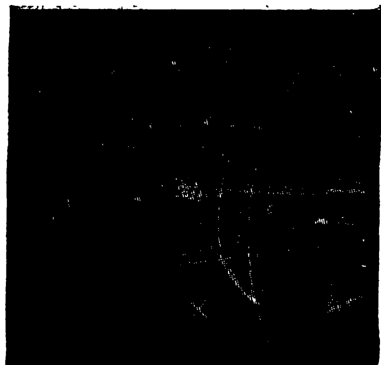
13 ইমাল্সনে বিক্রিয় র চিত্র।



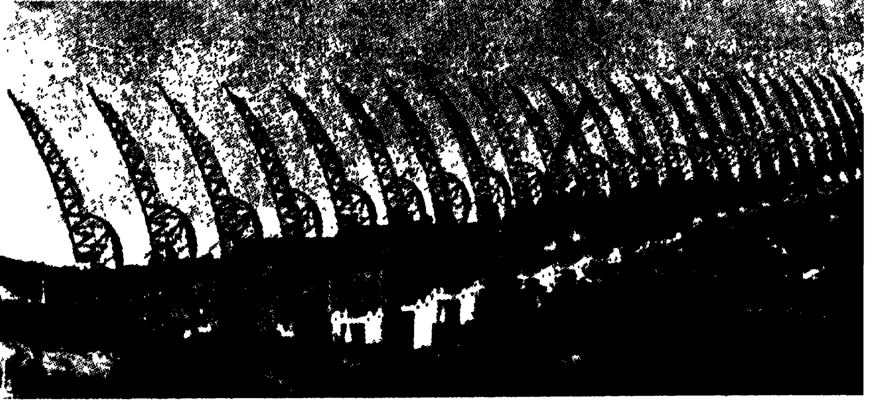
14 ব্যাপন মেঘকক্ষে মৌলিক কণার চিত্র।



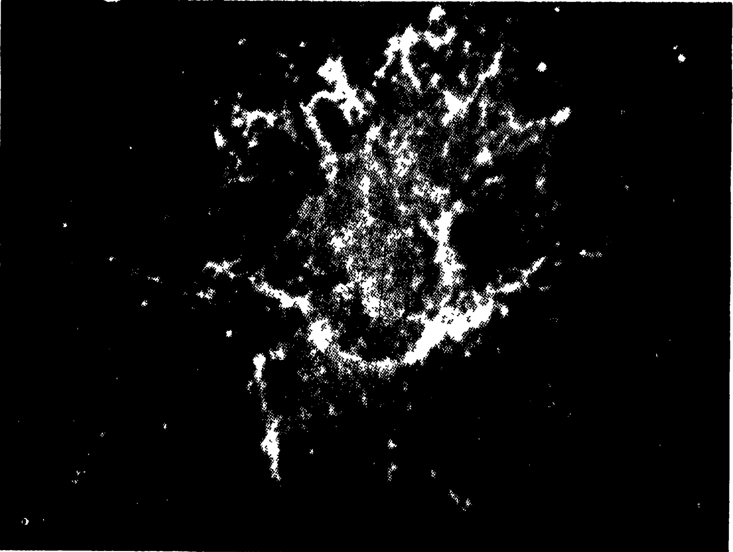
15. স্ফুলিঙ্গ কক্ষে বিক্রিয়ার চিত্র।



16. তরল হাইড্রোজেন বুদ্বুদ কক্ষে মৌলিক কণা অবলোপের চিত্র



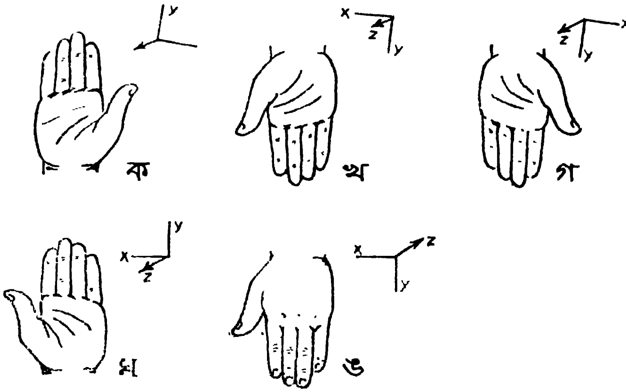
17. উট্‌কামণ্ডের 530 মিটার দীর্ঘ শক্তিশালী বেতার দূরবীণ।



18. ক্র্যাব্‌ নীহারিকা

শেষে যে কণাগুলির সৃষ্টি হল, সময়ের বৈপরীত্যের নির্দিষ্ট মানের বিরতিতে বিক্রিয়ার আরম্ভ হয়েছিল যে সব কণা দিয়ে, তাদের কি ফিরে পাওয়া যাবে ? তাদের গতিও কি উল্টো হবে ? হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত নানা রকম পরোক্ষ পরীক্ষায় এই সিদ্ধান্তই ঠিক-যে, সময়ের বৈপরীত্যে বিক্রিয়ারও বৈপরীত্য ঘটে। এরকম সমতা (symmetry)র পেছনে যে ধর্মের নিত্যতা বজায় থাকে, তা সহজ কোন নামে প্রকাশ করা যায় না।

সময়ের স্থানাংক t একটি মাত্রা দিয়েই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু দেশের স্থানাংক x, y, z এই তিনটি মাত্রা দিয়ে দেখান হয়—অর্থাৎ দেশ ত্রিমাত্রিক, সময়ের মত এক-মাত্রিক নয়। দেশের স্থানাংক উল্টে দিলে কি ঘটবে ? মৌলিক কণার বিক্রিয়া



চিত্র 3.9 : স্থানাংকের পরিবর্তনে বাম ও ডাইনের পরিবর্তনীয়তা।

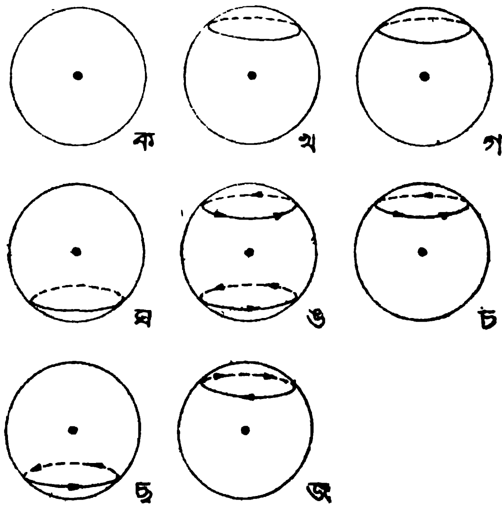
সম্পর্কে এই প্রসঙ্গ আলোচনার আগে নিজের হাত দিয়ে পরীক্ষা করা যাক্ না কেন ? 3.9(ক) চিত্রে যে ডান হাতটি দেখা যাচ্ছে, x ও y স্থানাংক উল্টে দিলে চিত্রটি হবে 3.9(খ) এর মত। হাতটি তখনও ডান হাতই আছে। z অক্ষে 180° ঘুরিয়ে নিলে আবার ঐ ডান হাতই (ক) চিত্রের অবস্থানে এসে যাবে। দেশের পরিবর্তনে স্পিনের নিত্যতার নিয়ম থেকে এ ঘটনা আমাদের অজানা নয়। দুটি স্থানাংক উল্টে দিয়ে সেই নিয়মই আবার নতুন করে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু 3.9(ক) চিত্রে যদি একটি স্থানাংক y উল্টে দেওয়া যায়, তবে (গ) চিত্রের মত দেখা যাবে যেন যাদুবলে ডান হাতটি বাঁ হাত হ'য়ে গেছে। 180° ঘুরিয়েও তা আর ডান হাত করা যাবে না। (গ) চিত্রটি যেন (ক) চিত্রের দর্পণ ছায়া। একটির পরিবর্তে x, y, z তিনটি স্থানাংকই যদি উল্টে দেওয়া যায় তবে (ঙ) চিত্রটি পাওয়া যাবে ; তাও (ক) চিত্রের দর্পণ ছায়া অর্থাৎ বাঁ হাত। 180° ঘুরিয়ে (ঘ) চিত্রের মত

বাঁ হাতের আর একটি অবস্থান পাওয়া যাবে, কিন্তু (খ) চিত্রের মত ডান হাত আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

হাত থেকে আরও সহজ জ্যামিতির চিত্র হল একটি গোলক। সব স্থানাংক উল্টে দিয়ে একটি গোলকের ধর্ম থেকে তার সমতা থাকছে কিনা বিবেচনা করা যায়, আমরা সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারি।

3.10(ক) চিত্রে একটি গোলক ও তার কেন্দ্রে একটি বিন্দু দেখা যাচ্ছে। তার কেন্দ্র দিয়ে আমরা গোলকটিকে যদি এমন ভাবে উল্টে দিই যে তার ভেতরটা বাইরে ও বাইরেটা ভেতরে উল্টে পড়ে। গোলকটিতে এমন কোন চিহ্ন নেই যে, আমরা এরকম উল্টে দেওয়ার পর দুটি গোলকের কোন পার্থক্য দেখতে পাব। তখনও



চিত্র 3.10 : গোলকে বৈপরীত্য সমতা।

গোলকটি (ক) চিত্রের মতই দেখাবে। গোলকের মেরুতে 3.10(খ) চিত্রের মত বৃত্ত আঁকা থাকলে এবং তাতে ঐ রকম একটি বৃত্ত নিম্নার্ধেও যদি থাকে বৃত্তগুলির সমতা থাকার ফলে উল্টে দেবার পর তখনও কোন পরিবর্তন চোখে পড়বে না। 3.10(গ) চিত্রের মত একদিকে যদি একটি বৃত্ত থাকে, তখন গোলকটি আগের মত উল্টে দিলে উপরের বৃত্তটি নীচে এসে যাবে [3.10(ঘ)]। শূন্যদেশে তো দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকতে পারে না। গোলকটিকে এখন উপর-নীচ উল্টে দিয়েই 3.10(গ) চিত্রে ফিরে আসা যাবে অথবা নিজের মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে পা উপরের দিকে রাখলে 3.10(ঘ) চিত্রের গোলকটিই 3.10(গ) চিত্রের মত দেখাবে। তাহলে

দেখা যাচ্ছে গোলকের বেলায় শুধু একটি অসম চিহ্নই যথেষ্ট নয়, যা দিয়ে গোলকের পরিবর্তন ঘটান যায় এবং সেই পরিবর্তন স্থানাংক পরিবর্তনে ঘটেছে এরকম প্রমাণ করা সম্ভব হয়।

এখন 3.10(ঙ) চিত্রের মত বৃত্ত দুটিতে তীর চিহ্ন দেওয়া থাকলেও একই অবস্থা ঘটবে।

এখন 3.10(চ) চিত্রটি দেখা যাক্। এখানে গোলকে একটি বৃত্ত তীরচিহ্নিত আছে। এই অসম গোলকটি ভেতর-বাহির উল্টে দিলে 3.10(ছ) চিত্র এর মত একই দিকে তীরচিহ্ন নিয়ে বৃত্তটি গোলকের নীচের দিকে এসে যাবে। 3.10(গ) ও 3.10(ঘ) চিত্রের বেলায় আমরা দেখেছি শুধু উপরনীচ উল্টে দিয়ে দুটি চিত্রের সমতা আছে দেখানো যায়। এখন 3.10(ছ) চিত্রটি একই ভাবে উল্টে দেখা যাক্। তখন আমরা যে 3.10(জ) চিত্রটি পাব তাতে কিন্তু হতাশ হতে হ'বে। 3.10(ছ) চিত্রের উল্টোদিকে তখন তীর চিহ্নটির দিক্ও উল্টে যাবে। আমরা অবিকল (ছ) চিত্র আর ফিরে পাব না।

গোলকের ভেতর-বাইর স্থানাংক পুরোপুরি উল্টে দেওয়ার পরিবর্তন তখনই চোখে পড়বে, যখন তাতে একটি শুধু অসম বৃত্ত চিহ্নই নয়, তার ঘূর্ণনের গতির দিকটিও নির্দিষ্ট থাকবে।

মৌলিক কণার বেলায় যে সব বিক্রিয়া আছে, 3.10(ক) থেকে (চ) চিত্রের মত স্থানাংক পরিবর্তনে সমতা বজায় থাকে দুটি ক্ষেত্রে তা হল তড়িৎ চুম্বকীয় ক্রিয়া ও তীব্র বিক্রিয়া। এই সমতা বজায় থাকা বা স্থানাংক পরিবর্তনে সমতার অপরিবর্তনীয়-তার পিছনে যে নিত্যতাবাদের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, তা' হল 'প্যারিটির নিত্যতা'।

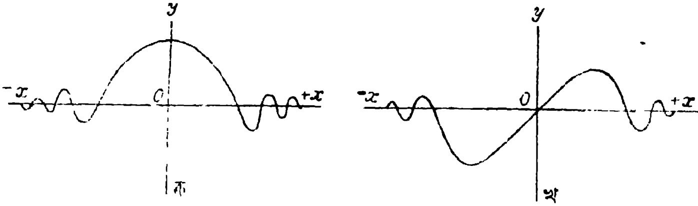
প্যারিটি দু রকমের হতে পারেঃ সম (even) বা অসম (odd)। কোন বিক্রিয়ার আগে ও পরে একই রকমের প্যারিটি সম অথবা বিপরীত হলে অসম হ'বে এই হল নিয়ম।

সম ও অসম প্যারিটির কিছু আভাস পাওয়া যায় ওয়েভ ফাংশন ψ এর সাহায্যে। ψ^2 হল কোন কণার ত্রিমাত্রিক দেশে অবস্থানের সম্ভাবনা। জড় কণার ভরবেগ mv হলে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $\lambda = \frac{h}{mv}$, h = প্ল্যাঙ্কের নিত্য সংখ্যা।

কোনও কণা r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে বাঁধা থকলে সেই কণিকার n পূর্ণসংখ্যক তরঙ্গ এই বৃত্তে থাকতে পারে অর্থাৎ তখন $\lambda = \frac{2\pi r}{n}$, $2\pi r$ হল বৃত্তের পরিধি। এরকম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কণার তখন ভরবেগ $\frac{nh}{2\pi r}$ আর কৌণিক ভরবেগ $\frac{nh}{2\pi}$। ত্রিমাত্রিক দেশে কণার তরঙ্গধর্ম থেকে প্যারিটির পরিচয় পাওয়া যাবে।

1.9 চিত্রে যথাক্রমে $n=3$ ও 8 এরকম দুটি কণার বৃত্তপথে তরঙ্গ দেখানো আছে। $n=3$ কক্ষে বৃত্তের ব্যাস তরঙ্গের যে দুটি বিন্দু স্পর্শ করেছে, তার একটি বৃত্তের বাইরে ও অপরটি ভিতরে। এদের যথাক্রমে + ও – চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যায়। $n=8$ কক্ষে ঐ ব্যাস যে বিন্দু দুটিতে স্পর্শ করে তারা হয় + অথবা –। তাই n-এর সংখ্যা অর্থাৎ কক্ষে আবদ্ধ তরঙ্গ সংখ্যা অসম হলে প্যারিটিও অসম হ'বে। $n=8$ কক্ষে n ও প্যারিটি দুইই সম।

অণুপরমাণুতে আবদ্ধ কণা বৃত্ত বা উপবৃত্তাকার পথে তরঙ্গাকারে যে বিচরণ করে তাতেই শুধু প্যারিটির প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ নয়। কোন বিক্রিয়ায় যে মুক্ত কণা অংশ নেয় বা বিক্রিয়ার পরে যে সব কণার সৃষ্টি হয়, তাদের ওয়েভ ফাংশনের ত্রিমাত্রিক দেশে সমতাধর্ম থেকে প্যারিটি সম বা অসম নির্ণয় করা যায়। 3.11 চিত্রে কাল্পনিক



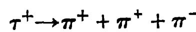
চিত্র 3.11 : স্থানাংকে ওয়েভ ফাংশনের (ক) সমতা ও (খ) অসমতা।

উদাহরণ দিয়ে কণার সম ও অসম ওয়েভ ফাংশন কেমন হ'বে তা দেখানো হয়েছে। এই উদাহরণ অবশ্য প্যারিটি প্রসঙ্গে পর্যাপ্ত নয়—শুধু প্যারিটির ধারণা পেতে সাহায্য করতে পারে।

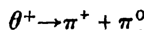
মুক্ত কণারও সম বা অসম প্যারিটি আছে। +1 অথবা সম প্যারিটি হল লেপ্‌টন ও বেরিয়নের, –1 বা অসম প্যারিটি হল ফোটন ও মেসনের। স্পিনের মত প্যারিটিও কণা চিহ্নিতকরণের একটি উপায়।

কোন বিক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস থেকে অসম প্যারিটির কোন কণা, যেমন ফোটন ইত্যাদি বেরোলে নিউক্লিয়াসের প্যারিটির পরিবর্তন ঘটে।

τ^+ ও θ^+ একই ধর্মের K^+ মেসন। এই অস্থায়ী মেসনের ক্ষয় একটি ক্ষীণ বিক্রিয়া। নীচের বিক্রিয়ায় মেসন দুটি ভেঙে যায়ঃ



$$\tau^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^-$$

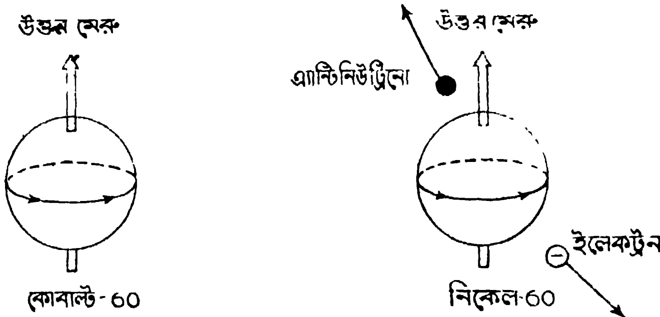


$$\theta^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^0$$

π মেসনের প্যারিটি অসম—একথা আগেই বলা হয়েছে। তা হলে τ মেসনের রূপান্তরে তিনটি মেসনের প্যারিটি মিলিতভাবে অসমই হ'বে। অথচ θ^+ মেসনের

রূপান্তরে দুটি মেসনের মিলিত প্যারিটি অবশ্যই সম হ'বে। τ^+ ও θ^+ যদি একই ধর্মী K^+ মেসন হয় তবে তাদের প্যারিটিতে অসামঞ্জস্য কেন ? তার কারণ হিসাবে ইয়াং ও লী প্রমাণ করেন যে ক্ষীণ বিক্রিয়ায় প্যারিটির নিত্যতা বজায় থাকে না। 1957 খ্রীষ্টাব্দে এজন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান।

τ ও θ মেসনের জীবনকাল খুব কম তাই এদের সাহায্যে ইয়াং ও লীর তত্ত্ব পরীক্ষা করার অসুবিধা আছে। বরং বীটা বিকিরণের মত ক্ষীণ বিক্রিয়া দিয়ে এর সত্যতা যাচাই করা যায়। ইয়াং ও লীর পরামর্শে তাঁর সহকর্মীরা কোবাল্ট-60 নিউক্লিয়াসের বীটা বিকিরণের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব প্রমাণ করেন। কোবাল্ট নিউক্লিয়াসে বীটা ও অ্যান্টিনিউট্রিনো যাতে এলোমেলো না ছড়িয়ে পড়ে তাই কোবাল্ট উৎস চুম্বক ক্ষেত্রে অতিশীতল আধারে রাখা হয়। তাতে কোবাল্ট নিউক্লিয়াসগুলি সারিবদ্ধ হয়ে থাকে। দুদিনের পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে কোবাল্ট-60র বীটা বিকিরণের



চিত্র 3.12 : কোবাল্ট-60 থেকে ইলেকট্রন্ ও অ্যান্টিনিউট্রিনো নির্গমনে অসমতা—প্যারিটির অনিত্যতা প্রমাণ করে। 3.10(জ) দ্রষ্টব্য।

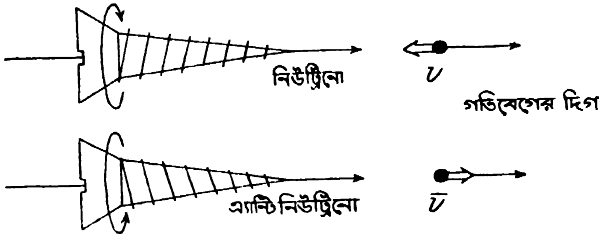
ক্ষীণ বিক্রিয়ায় অ্যান্টিনিউট্রিনো নিউক্লিয়াসের উত্তরমেরু দিয়ে ও ইলেকট্রন দক্ষিণমেরু দিয়ে বেরোনা পছন্দ করে (3.12 চিত্র)। নিউক্লিয়াসের উত্তর ও দক্ষিণমেরু অবশ্য কাল্পনিক, তবে নিউক্লিয়াসের স্পিনের গতির দিকে ডান হাতের আঙুলগুলি সমান্তরালে চালালে বুড়ো আঙুল উত্তরমেরু নির্দেশ করে। দক্ষিণমেরু অবশ্যই তার বিপরীত। কোবাল্টের পরীক্ষায় ইলেকট্রন ও অ্যান্টিনিউট্রিনোর অসম নির্গমন থেকে দেখা গেল ক্ষীণ বিক্রিয়ায় প্যারিটির নিত্যতা বজায় থাকে না।

প্যারিটির নিত্যতা বজায় না থাকার এরকম অনেক উদাহরণ আছে।

নিউট্রিনোর স্থির ভর নেই কিন্তু স্পিন আছে। নিউট্রিনোর স্পিনের গতি তার নিজের গতির উল্টোদিকে ; 3.13 চিত্রের বাঁদিকে পেঁচানো স্ক্রু-এর মত। আর

অ্যাণ্টিনিউট্রিনোর স্পিন ডানদিকে পেঁচান স্ক্রু-এর মত নিজের গতির দিকেই তার স্পিনের গতি। নিউট্রিনোর জন্ম ক্ষীণ বিক্রিয়া থেকে। ডানদিকে পেঁচানো নিউট্রিনো কেন হয় না তার উত্তরে শুধু বলা হয় যে অনিত্য প্যারিটির ক্ষীণ বিক্রিয়ায় বুঝি শুধু বাঁদিকে পেঁচানো নিউট্রিনোর সৃষ্টি হয় আর ডানদিকে পেঁচান হয় অ্যাণ্টিনিউট্রিনোর।

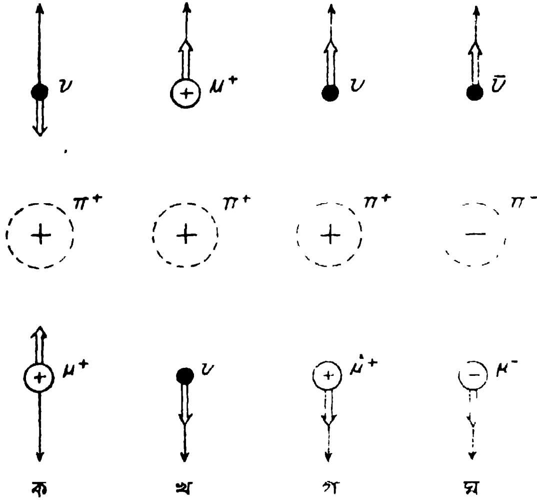
এখন যদি আধান সংযুগ্ম ক্রিয়াকে C ও স্থানাংক বৈপরীত্যে প্যারিটির ক্রিয়াকে P অক্ষরে অভিহিত করা যায়, তবে C ও P-এর আলাদা ক্রিয়ার পরিবর্তে CP দুটি



চিত্র 3.13 : পেঁচ কাটা স্ক্রুব বাঁ ও ডানমুখী পেঁচের সঙ্গে নিউট্রিনো অ্যাণ্টিনিউট্রিনোর তুলনা।

ক্রিয়া এক সঙ্গে ব্যবহার করলে, তবেই ক্ষীণ বিক্রিয়ায় প্যারিটির নিত্যতা বজায় থাকে, যেখানে শুধু P ক্রিয়াতে প্যারিটি মনে হয় অনিত্য। π^+ এর উদাহরণ থেকে দেখা যাবে CP একযোগে ক্ষীণ বিক্রিয়াতেও অপরিবর্তনীয়। 3.14(ক) চিত্রে ক্ষীণ বিক্রিয়ায় π^+ থেকে μ^+ ও নিউট্রিনো কীভাবে ক্ষয় পায়, তা দেখানো হয়েছে। P এর ক্রিয়ায় (খ) চিত্রটি পাওয়া যাবে। 180° ঘুরিয়ে দিলে (খ) চিত্র (গ) এর মত দেখাবে। গতির দিক ও অবস্থান (খ) চিত্রে μ^+ ও ν দুয়ের বেলায় বিপরীত কিন্তু তাদের স্পিনের দিক সেই একমুখীই আছে। [গোলকের উদাহরণের 3.10 চিত্রের (চ) থেকে (ছ) পরিবর্তন দ্রষ্টব্য।] (গ) চিত্রে দেখা যাচ্ছে নিউট্রিনো ডানদিকে পেঁচান স্ক্রুর মত আচরণ করছে—এ অবস্থার সম্ভাবনা ঘটতে পারে না। নিউট্রিনোর বাঁদিকে পেঁচান স্ক্রুর মত গতি হ'বে তাই স্বাভাবিক। এখন 3.14 (গ) চিত্রে যদি আধান সংযুগ্ম বা C ক্রিয়ার প্রয়োগ করা যায়, তবে দেখা যাবে [চিত্র 3.14 (ঘ)] π^+, π^--এ, μ^+, μ^- এ ও ν, $\bar{\nu}$ এ পরিণত হ'য়েছে। এখন $\bar{\nu}$-এর ডানদিকে পেঁচানো স্ক্রুর মত ব্যবহার অস্বাভাবিক নয়। CP মিলিত ক্রিয়ায় দেখা গেল প্যারিটির নিত্যতা বজায় থাকছে। π^- এর ক্ষয় π^+ এর অনুরূপ, দুয়ের জীবনকালও এক।

তড়িৎ চুম্বকীয়, মহাকর্ষ ও তীব্র বিক্রিয়াজনিত বল আলাদাভাবে C ও P ক্রিয়ায় অপরিবর্তিত থাকে। CP-এর গুণিত ক্রিয়ায় ক্ষীণ বলও অপরিবর্তনীয়। সব জানা বলই CP-এর অধীনে নিত্য। এমন যদি কোন অজানা বল থাকে যা CP ক্রিয়ায়ও পরিবর্তিত হয়, তবে এরকম ভাবতে পারা যায় যে, ঐ বল CPT-এর গুণিত ক্রিয়ায় অপরিবর্তনীয় থাকবে। T হল সময় বৈপরীত্য (Time reversal) ক্রিয়া। এখন পর্যন্ত T ও CP ক্রিয়ায় যুক্তভাবে নিত্য নয় এরকম বিক্রিয়ার



চিত্র 3.14 : π^+ মেসনের ক্ষয় উদাহরণ থেকে প্যারিটি ও আধান যুক্তভাবে নিত্যতার সম্ভাবনা। যুগ্ম তীরচিহ্ন কণার গতির স্পিনের দিকনির্দেশ করে।

সন্ধান 1964 খ্রীষ্টাব্দে একবার পাওয়া গিয়েছিল। তার ফলে সময় বৈপরীত্য সমতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। কিন্তু সবরকম পরীক্ষায় তো সময় বৈপরীত্য সমতা বজায় থাকে। তা বাতিল এককথায় করা যায় না। এই সংকট এড়াতে হলে পঞ্চম একটি বলের সম্ভাবনা দেখা যায়—যা মহাকর্ষ বল থেকেও ক্ষীণতর। এরকম বল থাকলে তার ক্রিয়াকলাপও খুঁজে পেতে হ'বে। 1965 খ্রীষ্টাব্দে অনেক অনুসন্ধানেও এরকম কোন বলের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সময় বৈপরীত্য সমতা নিয়ে সমস্যাটি থেকে গেছে—আপাতত চারটি বল নিয়েই সব বিক্রিয়া সীমাবদ্ধ।

সারণী 2

বিক্রিয়ায় সমতা ও নিত্যতা

	তীব্র	তড়িৎ চুম্বকীয়	ক্ষীণ
ঘূর্ণনগতি বা স্পিন	সমতা বজায় থাকে	সমতা বজায় থাকে	সমতা বজায় থাকে
রৈখিক গতি	ঐ	ঐ	ঐ
আইসোটোপিক	ঐ	সমতা বজায় থাকে না	সমতা বজায় থাকে না
কণা বিপরীত কণা	ঐ	সমতা বজায় থাকে	ঐ
সময় বৈপরীত্য	ঐ	ঐ	ঐ
আধান	নিত্যতা বজায় থাকে	নিত্যতা বজায় থাকে	নিত্যতা বজায় থাকে
বেরিয়ন	ঐ	ঐ	ঐ
লেপটন	—	ঐ	ঐ
অপরিচয়	নিত্যতা বজায় থাকে	ঐ	নিত্যতা বজায় থাকে না
প্যারিটি	ঐ	ঐ	ঐ

সারণী 3

প্রধান মৌলিক কণা গোষ্ঠীর শ্রেণীভেদে ধর্ম

ক্রমিক সংখ্যা প্রতীকচিহ্ন ও নাম	আধান	স্থির ভর (মিঃ ইঃ ভোঃ)	স্পিন (s)	আইসোটোপিক স্পিন সংখ্যা (1)	অপরিচয়ের সংখ্যা (S)
বেরিয়ন					
1 Ξ^- জাইমাইনাস্	$-e$	1319	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-2
2 Ξ^0 জাই জিরো	o	~1311	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-2
3 Σ^- সিগ্‌মা মাইনাস্	$-e$	1996	$\frac{1}{2}$	1	-1
4 Σ^0 সিগ্‌মা জিরো	o	1192	$\frac{1}{2}$	1	-1
5 Σ^+ সিগ্‌মা প্লাস	$+e$	1190	$\frac{1}{2}$	1	-1
6 λ ল্যাম্‌ডা	o	1115	$\frac{1}{2}$	0	-1
7 n নিউট্রন	o	940	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
8 p প্রোটন	$+e$	938	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
বোসন					
9 K^0 কে জিরো	o	498	0	$\frac{1}{2}$	$+1$
10 K^+ কে প্লাস্	$+e$	494	0	$\frac{1}{2}$	$+1$
11 π^+ পাই প্লাস্	$+e$	140	0	1	0
12 π^0 পাই জিরো	o	135	0	1	0
13 γ ফোটন	o	0	1	—	0

ক্রমিক সংখ্যা প্রতীক চিহ্ন ও নাম	আধান	স্থির ভর (মিঃ ইঃ ভোঃ)	স্পিন (s)	আইসোটোপিক স্পিন সংখ্যা (I)	অপরিচয়ের সংখ্যা (S)
লেপটন					
14 μ^- মিউমাইনাস্	–e	106	$\frac{1}{2}$	—	—
15 e^- ইলেকট্রন	–e	0.511	$\frac{1}{2}$	—	—
16 ν নিউট্রিনো	o	0	$\frac{1}{2}$	—	—

সারণী 3 (আরও কয়েকটি ধর্ম)

ক্রমিক সংখ্যা (উপরের অংশ দ্রষ্টব্য)	গড় জীবনকাল (সেকেণ্ড)	উপজাত কণা	বিপরীত কণা প্রতীক চিহ্ন	নাম
1	2×10^{-10}	$\pi^-+\lambda$	$\overline{\Xi}^+$	অ্যাণ্টিজাইপ্লাস্
2	$\sim 2\times10^{-10}$	$\pi^0+\lambda$	$\overline{\Xi}^0$	অ্যাণ্টিজাইজিরো
3	$\sim1{\cdot}6\times10^{-10}$	π^-+n	$\overline{\Sigma}^+$	অ্যাণ্টিসিগ্মাপ্লাস্
4	$\sim 10^{-20}$	$\gamma+\lambda$	$\overline{\Sigma}^0$	অ্যাণ্টিসিগ্মা জিরো
5	$\sim0{\cdot}8\times10^{-10}$	π^++n π^0+p	$\overline{\Sigma}^-$	অ্যাণ্টিসিগ্মা মাইনাস্
6	$2{\cdot}5\times10^{-10}$	π^-+p π^0+n	$\overline{\lambda}$	অ্যাণ্টিল্যামডা
7	1×10^3	$e^-+\overline{\nu}+p$	$\overline{n}$	অ্যাণ্টিনিউট্রন
8	স্থায়ী	—	$\overline{p}$	অ্যাণ্টিপ্রোটন
9	1×10^{-10} 6×10^{-8}	$\pi^++\pi^-$ $\pi^0+\pi^0$	$\overline{K}^0$	অ্যাণ্টিকেজিরো
10	$1{\cdot}2\times10^{-8}$	μ^++v $\pi^++\pi^0$	K^-	কেমাইনাস্
11	$2{\cdot}6\times10^{-8}$	$\mu^++\nu_\mu$	π^-	পাইমাইনাস্
12	$<10^{-15}$	$\gamma+\gamma$	π^0	পাইজিরো
13	স্থায়ী	—	γ	ফোটন
14	$2{\cdot}26\times10^{-6}$	$e^-+\nu_\mu+\nu_\mu$	μ^+	মিউপ্লাস
15	স্থায়ী	—	e^+	পজিট্রন
16	স্থায়ী	—	$\overline{\nu}$	অ্যাণ্টিনিউট্রিনো

3 নং সারণীতে সন্নিবেশিত মৌলিক কণার তালিকা ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছে—নতুন নতুন কণার আবিষ্কারে। এখন পর্যন্ত শূন্য স্পিনের আটটি মেসন দেখা গেছে : $\pi^+, \pi^-, \pi^0, K^+, \bar{K}^-, K^0, \bar{K}^0, \eta_0$. একক স্পিনের রয়েছে নয়টি : $\rho^+, \rho^-, \rho^0, \phi^0, \omega^0, K^{*+}, K^{*-}, k^{*0}, \bar{K}^{*0}$.

0 স্পিনকণার $(2\times0+1=1)$ একটি করে অবস্থান থাকবে তাই এই আটটি মেসনের অবস্থানসংখ্যা 8 ; 1 স্পিনের কণার $(2\times1+1=3)$ তিনটি করে অবস্থান থাকতে পারে তাই নয়টি মেসনের অবস্থান সংখ্যা দাঁড়ায় $9\times3=27$। সব মেসনগুলি মিলিয়ে $8+27=35$ সংখ্যা, $6\times6=36$টি বর্গক্ষেত্র সাজালে তত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী 35টি কণার জন্যই সংকুলান হতে পারে, একটি বাদ যাবে।

এখন বেরিয়ন গোষ্ঠীর কণাদের কথায় আসা যাক। $\frac{1}{2}$ স্পিনের আটটি বেরিয়ন হল $n, p, \Sigma^+, \Sigma^-, \Sigma^0, \Lambda^0, \Xi^0, \Xi^-$. $\frac{3}{2}$ স্পিনের দশটি বেরিয়ন হল $\Delta^{2+}, \Delta^+, \Delta^-, \Delta^0, \Sigma^+, \Sigma^0, \Sigma^-, \Xi^+, \Xi^0, \Omega^-$, $(2s+1)$ সূত্র দিয়ে এদের মোট অবস্থান সংখ্যা $8\times2+10\times4=56$.

এ ছাড়াও যেসব ক্ষণস্থায়ী কণা দেখা গেছে, তাদের স্থায়িত্ব এত কম যে তাদের অনুনাদ (resonance) কণা নামে অভিহিত করা হয়। উপরের বেরিয়ন ও মেসনগোষ্ঠীর শ্রেণীর সারণী 3এ তাদের স্বীকৃতি দেওয়া চলে না।

এখন প্রশ্ন উঠেছে এসব মৌলিক বেরিয়ন ও মেসনকণা কি মৌলিক অথবা তাদের কোন আভ্যন্তরীণ গঠনের উপাদান আছে ? বিজ্ঞানী গেলম্যান্ ও জোয়াইগ্ যে ক্যুআর্ক তত্ত্ব খাড়া করেছেন তাতে তিনটি আদিমকণা ক্যুআর্ক (quark) দিয়ে এসব মৌলিককণা গঠিত। ক্যুআর্কের আধান ইলেক্ট্রনের আধান $4{\cdot}8\times10^{-10}$ কুলম্ব এর ভগ্নাংশ। এই তিনটি ক্যুআর্কের অ্যাণ্টি-ক্যুআর্কও থাকবে। এদের ভর প্রোটনের কয়েকগুণ। একটি প্রোটন তৈরি করতে যে তিনটি ক্যুআর্কের $(p'p'n')$ প্রয়োজন তাদের মিলিত ভর প্রোটনের প্রায় 30 গুণ। এই ভরের শতকরা প্রায় 97 ভাগ প্রোটন তৈরির শক্তিতে খরচ হয়ে যায়। দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন নিয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস্ তৈরিতে কণিকাগুলির ভরের প্রায় $0{\cdot}7$ ভাগ মাত্র শক্তিতে রূপান্তরিত হয়—আর ক্যুআর্ক থেকে প্রোটন তৈরিতে এই শক্তির প্রায় 140 গুণ শক্তির ভর থেকে রূপান্তর এক বিস্ময়কর ঘটনা। পর পৃষ্ঠার সারণীতে তিনটি ক্যুআর্কের পরিচয় দেওয়া হল।

ক্যুআর্ক	বৈদ্যুতিক আধান	বেরিয়ন সংখ্যা	অপরিচয়ের সংখ্যা	স্পিন
p'	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{2}$
n'	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{2}$
λ'	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{1}{3}$	-1	$\frac{1}{2}$

ভারী মৌলিক কণার কয়েকটি কী ভাবে ক্যুআর্ক দিয়ে গঠিত হয়েছে, নীচে তা দেখান হল ঃ

$$p=p'p'n', \quad n=p'n'n', \quad \pi^+=p'\bar{n}',$$
$$K^\circ=\bar{n}'\lambda', \quad \bar{K}^\circ=\bar{\lambda}'\,n' \quad \pi^-=\bar{n}'p'$$

ক্যুআর্কের মত এত বেশী ভরের তুল্য শক্তি উৎপাদন করার মত ত্বরণ যন্ত্র না থাকায় ক্যুআর্কের অস্তিত্ব আছে কি না তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

1974 খ্রীষ্টাব্দে অতি শক্তিশালী ত্বরণ যন্ত্রে e^-e^+ এর বিলোপে একটি নতুন কণার সন্ধান পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে ψ, তার ভর 3·1 Bev অর্থাৎ প্রোটনের প্রায় সাড়ে তিন গুণ। আবার e^+e^- কণার গতিশক্তি বাড়িয়ে ψ এর উত্তেজিত অবস্থারও সন্ধান পাওয়া গেছে—এ রকম উত্তেজিত ψ এর ভর 3·64 ও 4·1 Bev। পরমাণুতে উত্তেজনায় ইলেকট্রন যেভাবে $n=1$ কক্ষ থেকে $n=2,3$ এসব কক্ষে লাফিয়ে উঠে, ψ কণার অভ্যন্তরে কি সে রকম কিছু ঘটছে? আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতা নিয়ম অনুযায়ী উত্তেজিত পরমাণুর ভর বাড়বে। যেমন হাইড্রোজেনের বেলায় $n=1, 2$ এবং 3 কক্ষে হাইড্রোজেনের পরমাণুর ভর হবে যথাক্রমে 938·7374, 938·7476, 938·7495 Mev. দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যাটি প্রথম ও দ্বিতীয় থেকে যথাক্রমে ·0122 ও ·0019 Mev বেশী। তুলনায় ψ এর ভূমিস্তর থেকে প্রথম উত্তেজিত অবস্থার পার্থক্য 540 Mev ও এই অবস্থা থেকে দ্বিতীয় উত্তেজনার মান 460 Mev বেশী। হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনের বন্ধনশক্তির চেয়ে মৌলিক কণায় ক্যুআর্কের বন্ধনশক্তি কত তীব্র তা এ থেকে অনুমান করা যাবে।

ψ কণার আবিষ্কারে চতুর্থ আর একটি ক্যুআর্কের অস্তিত্ব মানতে হয় তা হল চার্মড ক্যুআর্ক c। $c\bar{c}$ মিলে ψ ও তার উত্তেজিত অবস্থার কণা পাওয়া যাবে। এই চারটি ক্যুআর্ক-এর বিভিন্ন যোগাযোগে নতুন নতুন মেসন ও বেরিয়ন উৎপাদন অসম্ভব নয়।

1977 খ্রীষ্টাব্দে 400 Bev প্রোটন ও নিউক্লিয়াসের সংঘাতে 9·5 Bev ভরের একটি কণার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে—তার উপাদান সম্ভবত আর এক ধরনের ক্যুআর্ক। তাই ক্যুআর্কের সংখ্যা এখনই সীমিত করা যাচ্ছে না।

হাল্কা লেপটন কণা হল ইলেকট্রন, মিউমেসন ও দু রকমের নিউট্রিনো আর তাদের বিপরীত কণা। ফোটন ধরলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় নয়। 1975 খ্রীষ্টাব্দে e^-e^+ বিক্রিয়ায় 1·8 Bev জুড়ি ভারী লেপ্‌টন পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। তা হলে লেপ্টন সংখ্যাও যে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে তাও নিশ্চিত নয়। লেপ্‌টন ও ক্যুআর্ক—এই মিলে কি কণা ও জড়জগৎ ? ঠিক এই মুহূর্তে তাই যেন শেষ কথা বলে মনে হচ্ছে। ক্যুআর্ক তো আজও পরীক্ষাগারে ধরা পড়ে নি।

তাই মনে হয় জড় জগতের আসল স্বরূপের ওপর এখনও যে যবনিকা রয়েছে তা সরে যায়নি—ভবিষ্যৎই এই প্রশ্নের উত্তর দিবে।

ষট্‌কোণচক্র ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ

মৌলিক কণাগুলির একটি লক্ষ্যণীয় ধর্ম হল তাদের স্থায়িত্ব। সব মেসনই অস্থায়ী, কিন্তু 1 স্পিনের মেসন গোষ্ঠী এত অস্থায়ী যে তাদের কণা না বলে অনুনাদ (resonance) বলা হত। বেরিয়ন গোষ্ঠীর $\frac{3}{2}$ স্পিনের দশটি কণার বেলায়ও তাই। সৃষ্টির পরেই তীব্র বিক্রিয়ায় তাদের ক্ষয় হয়—এই ক্ষয় থেকে যে সব কণার জন্ম হয় তারা আপেক্ষিকভাবে বেশী স্থায়ী হলেও ক্ষীণ বা তড়িৎ চুম্বকীয় ক্রিয়ায় তাদেরও রূপান্তর ঘটে।

আপেক্ষিকতাবাদ দিয়ে নিঃসম্পর্কীয় দেশ ও কালের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। xyz স্থানাংক বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক দেশের সঙ্গে কালের t মাত্রা যোগ করে চতুর্মাত্রিক দেশ দিয়ে জড় জগতের মূল্যায়ন পদার্থ বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এরকম আর একটি অভিনব আবিষ্কার হল—সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় দুটি ধর্ম আধান ও অপরিচয়ের সংখ্যার সম্পর্ক দিয়ে ক্যুআর্ক থেকে মৌলিক কণার সৃষ্টিরহস্য উদ্ভাবন।

প্রথমেই বেরিয়ন গোষ্ঠীর 8টি মৌলিক কণা ধরা যাক্। 3.15 (ক) চিত্রে ষট্‌কোণচক্রে (Hexagonal array) এই কণাগুলি দেখানো হল। অনুভূমিক অক্ষে কেন্দ্রের O স্থানাংক থেকে ডান দিকে বৈদ্যুতিক আধান পজিটিভ, বাঁ দিকে নেগেটিভ। অন্য অক্ষে অতি আধান সংখ্যা Y দিয়ে অপরিচয়ের সংখ্যা বোঝা যাবে। ঐসঙ্গে আইসোটোপিক স্পিনও দেওয়া হয়েছে। 3.15(খ) চিত্রে স্থায়ী মেসন গোষ্ঠী 3.15(গ) চিত্রে অস্থায়ী মেসন গোষ্ঠীর অষ্টমূর্তি ষট্‌কোণচক্রে এবং অবশিষ্ট অস্থায়ী বেরিয়ন গোষ্ঠীকে 3.15(ঘ) চিত্রে একটি ত্রিভুজে দশমূর্তিতে দেখান হল। অতি আধান সংখ্যা Y=অপরিচয় সংখ্যা S+বেরিয়ন সংখ্যা B। মেসনের বেলায় $Y=S$।

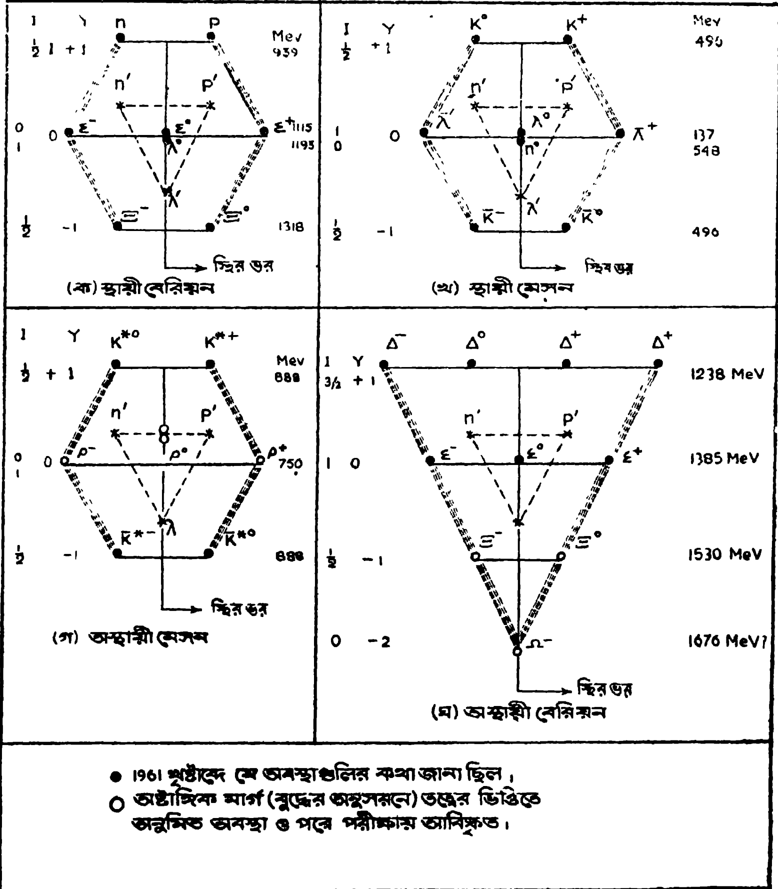
উল্লিখিত ত্রিভুজ ও ষড়ভুজের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাবে যে, এভাবে মৌলিক কণাগুলিকে সাজিয়ে তাদের আধান ও অপরিচয়ের সংখ্যার একটি মৌলিক সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে—যদিও এ দুটি আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয়।

1961 খ্রীষ্টাব্দে গেল্‌ম্যান্ ও নীম্যান্ এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অষ্টাঙ্গিক মার্গ (eight-fold way) মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। নামটি অবশ্য বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে নেওয়া। তাঁদের সূত্র হল একটি সহজ সমীকরণ

$$3 \times 3 = 9 = 8 + 1$$

মৌলিক কণার বেলায় বাঁয়ের অংশ হল তিনটি মৌলিক কণার বা ক্যুআর্কের মিলনের সম্ভাবনার পরিমাণ ও ডানদিকের অংশটি বাইরে প্রকাশের সংখ্যা।

হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে বিষয়টি সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রোটনের স্পিন $(+\frac{1}{2})$ অথবা $(-\frac{1}{2})$, ইলেকট্রনের বেলায়ও তাই। $2\times2=4$টি অবস্থানের এই স্পিনযুক্ত প্রোটন ও ইলেকট্রন যখন হাইড্রোজেন তৈরি করে, তখন পরমাণুর স্পিন দাঁড়ায় 1 অথবা দুটি কণার স্পিন বিপরীতমুখী হলে পরমাণুর স্পিন হবে 0।



চিত্র 3.15 : (ক) বেরিয়ন অষ্টমূর্তি (octet) চক্র, (খ) মেসন অষ্টমূর্তিচক্র, (গ) অস্থায়ী মেসন অষ্টমূর্তিচক্র, (ঘ) অস্থায়ী বেরিয়ন্ দশমূর্তি (decuplet) চক্র।
অতি আধান (hypercharge) সংখ্যা Y হল বহুমূর্তি (supermultiplet) কণার গড় আধানের দ্বিগুণ। এই সংখ্যা দিয়ে অপরিচয় বোঝান সহজ।
অপরিচয়ের সংখ্যা S ও বেরিয়ন সংখ্যা B হলে $Y=S+B$, মেসনের বেলায় $Y=S$
চিত্রে আইসোটেপিক স্পিন I ও Y তথা অপরিচয়ের সংখ্যার সঙ্গে আধানের সম্পর্ক দেখান হয়েছে।

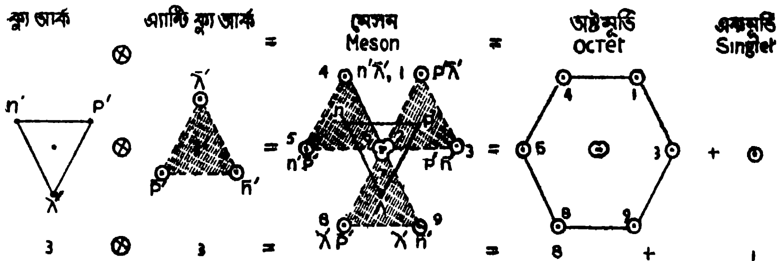
0 স্পিনে পরমাণুটি $2 \times 0 + 1 = 1$টি অবস্থানে থাকতে পারে, এ অবস্থাকে একমূর্তি (singlet) বলা হয়। আবার 1 স্পিনে তার অবস্থান হতে পারে $2 \times 1 + 1 = 3$ যা ত্রিমূর্তি (triplet) নামে অভিহিত হয়। ফলে হাইড্রোজেন পরমাণু $3 + 1 = 4$টি অবস্থানে থাকতে পারে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের আলাদা আলাদা অবস্থানের সংখ্যা স্পিন অনুযায়ী 2×2 ছিল। হাইড্রোজেন পরমাণুতে তা হল $3+1$। ফলে এই সমীকরণ প্রমাণ হয় যে,

$$2 \times 2 = 4 = 3 + 1$$

পরমাণুর এই সহজ উদাহরণ থেকে ক্যুআর্ক দিয়ে মৌলিক কণা সৃষ্টির প্রসঙ্গে আসা যাক্।

3টি ক্যুআর্ক ও 3টি এ্যান্টি-ক্যুআর্ক নিয়ে 3.16 চিত্রে আমরা দেখতে পাই

$$3 \times 3 = 9 = 8 + 1$$



চিত্র 3.16 : ক্যুআর্ক ও অ্যান্টি-ক্যুআর্ক যোগে মেসনেব অষ্টমূর্তি (octet) ও একমূর্তি (singlet) গঠনের সম্ভাব্যতা।

মেসনের বেরিয়ন সংখ্যা 0, তাই ক্যুআর্ক ও অ্যাণ্টি-ক্যুআর্কের মিলনে তাদের সৃষ্টি। এই চিত্রে p' ও n', $\bar{p}'$ ও $\bar{\lambda}'$ এর সমবায় p' কেন্দ্রিক ত্রিভুজে 1, 2, 3 বিন্দু দিয়ে দেখান হয়েছে। n' কেন্দ্রিক ত্রিভুজে 4, 5, 6 বিন্দুতে n' ও অ্যাণ্টি-ক্যুআর্কের সমবায় দেখা যাবে। λ' কেন্দ্রিক অনুরূপ ত্রিভুজের 7 বিন্দু আগের দুটি ত্রিভুজের 2 ও 6 বিন্দুর উপর পড়ে। গেলম্যান্ ও নীম্যান্ দেখিয়েছেন যে, এই 9টি বিন্দুর আটটি বাস্তবে অষ্টমূর্তিতে (octet) দেখা যায়। অন্যটি একমূর্তি (singlet) মেসন। এই একমূর্তি P মেসনও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বেরিয়নের বেলায় একই পদ্ধতিতে শুধু তিনটি ক্যুআর্ক দিয়ে $3 \times 3 \times 3 = 27$টি অবস্থার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। এই সম্ভাবনা থেকে বাইরে একটি একমূর্তি, দুটি অষ্টমূর্তি ও একটি দশমূর্তি (decuplet)-র কণিকা গোষ্ঠী দিয়ে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$3 \times 3 \times 3 = 27 = 1 + 8 + 8 + 10$$

বেরিয়নের যথাক্রমে আটটি ও দশটির গোষ্ঠী ষট্‌কোণ চক্রে দেখান যায় (3.15 চিত্র)—ক্যুআর্কের মিলনে তাদের কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে তা নীচের সারণীতে দশটির গোষ্ঠীর জন্য দেখা যাবে। বন্ধনীতে যথাক্রমে আধান ও অপরিচয়ের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। 3.15(ঘ) চিত্র দ্রষ্টব্য।

Δ^{2+} $p'p'p'$ $(+2, 0)$ Δ^{+} $p'p'n'$ $(+1, 0)$ Δ^{0} $p'n'n'$ $(0, 0$ Δ^{-} $n'n'n'$ $(-1, 0)$

Σ^{+} $p'p'\lambda'$ $(+1, -1)$ Ξ^{0} $p'\lambda'\lambda'$ $(0, -2)$ Σ^{0} $p'n'\lambda'$ $(0, -1)$ Ξ^{-} $n'\lambda'\lambda'$ $(-1, -2)$ Σ^{-} $n'n'\lambda'$ $(-1, -1)$

Ω^{-} $\lambda'\lambda'\lambda'$ $(-1, -3)$

তাদের ভরের তুল্যমূল্য যে শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক লাইনে পার্থক্য যথাক্রমে 147, 145 ও 146 Mev। উপরের ক্যুআর্ক যে ভাবে সাজানো, তাতে দেখা যায় যে, p' ও n' ক্যুআর্কের ভর প্রায় সমান, কিন্তু λ' ক্যুআর্ক এদের চেয়ে প্রায় 146 Mev তুল্য বেশী ভারী।

ঠিক একই ভাবে অষ্টমূর্তি বেরিয়নের বেলায় ক্যুআর্কের সমবায়ের আটটি বিন্যাস দেখানো যেতে পারে।

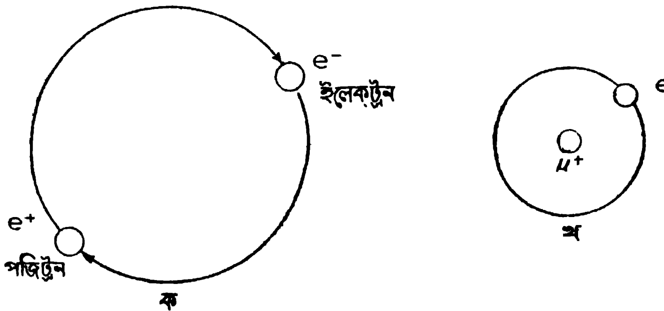
অষ্টাঙ্গিক মার্গ মতবাদ যে ক্যুআর্কের ভিত্তিতে মৌলিক কণা গোষ্ঠীর অতি-বহু মূর্তিতত্ত্বের (supermultiplet) সৌধ গড়ে তুলেছে তা নয়, এই মতবাদ দিয়ে কণার ভর ও রূপান্তর প্রণালী ব্যাখ্যা করা যায়। নিঃসন্দেহে এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হিসেবে গেলম্যান্‌ এই মতবাদের জন্য 1969 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

ক্যুআর্কের অস্তিত্ব আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এর আবিষ্কারে একদিন জড় জগতের মৌলিকতম উপাদান ধরা পড়বে।

পজিটিভ নিউক্লিয়াস ও নেগেটিভ ইলেকট্রন তড়িৎ-চুম্বকীয় বলে বাঁধা পড়ে পরমাণুর সৃষ্টি করে। প্রোটন ও ইলেকট্রন দুটি কণার সমবায়ে গড়া হাইড্রোজেন পরমাণু জড়ের পরমাণুর সহজ নিদর্শন। মৌলিক পদার্থের জানা পরমাণু ছাড়াও কিছু আজব পরমাণু রয়েছে যাদের আচরণ সাধারণ পরমাণুর মত কিন্তু গঠনবিন্যাস বিচিত্র। এসব আজব পরমাণুর উপাদান অস্থায়ী মৌলিক কণা, তাই এদের আয়ুও সীমিত।

পজিট্রনিয়াম ও মিউওনিয়াম

আজব পরমাণুর একটি উদাহরণ হল পজিট্রনিয়াম। হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রোটনের পরিবর্তে একটি পজিট্রন তার জায়গা দখল করলে পজিট্রনিয়ামের সৃষ্টি হয়। পজিট্রনিয়াম কোন মৌলিক পদার্থ নয়—অথচ তার শক্তিস্তরগুলি হাইড্রোজেনের মানের অর্ধেক। পজিট্রনিয়াম অস্থায়ী, সহজেই তাদের বিলয়ে গামারশ্মির উদ্ভব হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর মত পজিট্রনিয়াম গঠনে পজিট্রনের ও ইলেকট্রনের



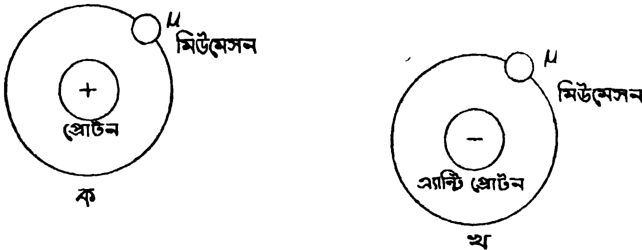
চিত্র 3.17 : (ক) পজিট্রনিয়াম (খ) মিউওনিয়াম।

স্পিন যখন ভিন্নমুখী তখন তাকে প্যারাপজিট্রনিয়াম বলা হয়। এর গড় আয়ু $1{\cdot}2\times10^{-10}$ সেকেণ্ড। দুটি গামা কোয়াণ্টার সৃষ্টিতে প্যারাপজিট্রনিয়ামের বিলয় ঘটে। পজিট্রন, ইলেকট্রনের স্পিন সমান্তরাল অবস্থায় যে অর্থোপজিট্রনিয়াম তৈরি হয় তার গড় আয়ু প্যারার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশী। তিনটি গামা কোয়াণ্টার সৃষ্টিতে এদের বিলুপ্তি ঘটে।

মিউওনিয়াম আর এক আজব পরমাণু। অস্থায়ী এই পরমাণুতে হাইড্রোজেনের প্রোটনের জায়গা দখল করে থাকে μ^+। মিউওনিয়ামের সাহায্যে পরমাণু বিজ্ঞানের কয়েকটি নিত্যসংখ্যা সূক্ষ্মতরভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। এই পরমাণুর আচরণ যেন হাইড্রোজেনের একটি হাল্কা আইসোটোপের মত। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেনের ভূমিকা সম্পর্কে মিউওনিয়াম অনেক তথ্য দিতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে মিউওনিয়াম-রসায়নবিজ্ঞান গবেষণার একটি নতুন ও উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

মেসিক পরমাণু

π^- ও μ^- এ দুটি মৌলিক কণা হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রনের জায়গা দখল করে আজব পরমাণু তৈরি করতে পারে। π^- ইলেক্ট্রন থেকে প্রায় 273 গুণ ভারী, তাই π^- দিয়ে যে মেসিক পরমাণু সৃষ্টি হয়, তার প্রথম কক্ষের



চিত্র 3.18 : (ক) মেসিক পরমাণু (খ) বিপরীত মেসিক পরমাণু।

ব্যাসার্ধ হাইড্রোজেনের চেয়ে 273 গুণ ছোট। এই পরমাণুকে উত্তেজিত করতে ইলেক্ট্রনের চেয়ে 273 গুণ শক্তির প্রয়োজন হবে।

কণাত্বরণ যন্ত্রে উৎপন্ন মেসন কোন লক্ষ্যবস্তুর উপর পড়ে তার ইলেক্ট্রনের সঙ্গে সংঘাতে মন্দীভুত হয় এবং ঐ পদার্থে বাঁধা পড়ে যায়। তখন ঐ π^- বা μ^- ইলেক্ট্রনকে সরিয়ে তার জায়গা দখল করে। প্রথমেই মেসন প্রায় $n = 30$ এর কক্ষে ধরা পড়ে তারপর 10^{-11} সেকেণ্ড সময়ে মেসনটি নীচের কক্ষে নেমে আসে। ধাপে ধাপে অন্য কক্ষগুলি ছুঁয়ে তাকে আসতে হয়। ফলে কক্ষের অনুযায়ী শক্তির এক্সরশ্মির বিকিরণ হয়। এই এক্সরশ্মি থেকে পরমাণুর ধর্ম জানা যায়। হাইড্রোজেন পরমাণু যেখানে অতিবেগুনি বা দৃশ্য আলো বিকিরণ করে, মেসিক পরমাণু থেকে অনুরূপ কক্ষের পরিবর্তনে এক্সরশ্মি পাওয়া যায়।

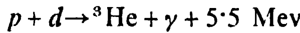
মিউওনীয় পরমাণু নিউক্লিয়াসের গঠনবিন্যাস সম্পর্কে অনেক তথ্য দিতে পারে। নিউক্লিয়াসে প্রোটনের আধান কীভাবে ছড়িয়ে আছে, তা এসব পরমাণু

থেকে জানা যায়—কারণ μ^- প্রোটনের আধানজনিত তড়িৎচুম্বকীয় বিক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়, নিউক্লীয় বল সম্পর্কে তার কোন সংবেদন থাকে না। অথচ পরমাণুর নীচের কক্ষে μ^-, ইলেক্ট্রনের চেয়ে নিউক্লিয়াসের অনেক কাছে প্রায় তার ভেতরে এসে পড়ে। ফলে μ^- দিয়ে প্রোটনের গঠনবিন্যাস সহজে ধরা পড়ে।

মিউওনীয় অণু

একটি μ^- দুটি নিউক্লিয়াসে বাঁধা পড়ে আজব অণু তৈরি করে যেমন $(p\mu^-p)^+$, $(p\mu^-d)^+$, $(d\mu^-d)^+$। আজব এসব অণু সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কথা হল μ এর ভর ইলেক্ট্রনের চেয়ে বেশী, তাই নিউক্লিয়াস দুটি μ^- এর প্রভাবে নিউক্লীয় বলের প্রভাবের দূরত্বের মধ্যে এসে পড়ে। ফলে $(p\mu^-d)^+$ অণুতে নিউক্লীয় সংযোজনক্রিয়া কুলম্ববাধা অতিক্রম করার মত শক্তি ছাড়াও ঘটতে পারে।

ডয়েটরন নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে বিকর্ষণজনিত কুলম্ববাধা আছে, তা এড়িয়ে নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়ায় শক্তি আহরণ করতে প্লাজমা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। আজব অণু দিয়ে বাইরের শক্তি ছাড়াই নীচের সংযোজন ক্রিয়া ঘটতে পারে :



$$p + d \rightarrow {}^3\text{He} + \gamma + 5{\cdot}5 \text{ Mev}$$

অবশ্য এ ধরনের বিক্রিয়ার এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পাইওনীয় পরমাণু

পাইমেসন ও নিউক্লিয়নের মধ্যে যে তীব্র বলের বিক্রিয়া ঘটে, তাতে μ^- ও প্রোটনের আজব পরমাণুর শক্তিস্তরগুলির শক্তির মান অনায়াসে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু পরীক্ষায় যেসব এক্সরশ্মি পাওয়া যায়, সেগুলির সঙ্গে গণনার ফলের গরমিল দেখা যায়। তবু আজব পরমাণু থেকে অন্তত পাইমেসনের ভর নির্ভুলভাবে মাপা যায়। পাইওনীয় পরমাণু থেকেই প্রথম জানা গেল যে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয়নগুলি সুসমভাবে ছড়িয়ে নেই। নিউক্লিয়াসের পৃষ্ঠদেশে প্রোটন থেকে নিউট্রনই বেশী ছাপিয়ে উঠেছে। K^- মেসন দিয়ে যে কেওনীয় পরমাণু পাওয়া যায় তা থেকে এই পৃষ্ঠদেশের এমনকি নিউট্রন-প্রোটন অনুপাতও ধরা পড়ে। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হলেও কেউ কেউ বলেন নিউক্লিয়াসের পৃষ্ঠদেশে বুঝি শুধু নিউট্রনেরই রাজত্ব।

সিগমীয় ও অ্যান্টিপ্রোটনীয় পরমাণু

χ^+, Σ^+, অ্যান্টিপ্রোটন $\bar{p}$ এসব মৌলিক কণা দিয়েও আজব পরমাণু যেমন $\chi^- - p$, $\Sigma^- - p$, ও $\bar{p} - p$ প্রভৃতি তৈরি হতে পারে। $\chi^- - p$ পরমাণুর

অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বটে কিন্তু 1970 খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকেঁনটোস্ ও তাঁর সহকর্মীরা $\Sigma^- - p$ পরমাণু আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীদের আশা $\Sigma^- - p$ পরমাণু দিয়ে নিউক্লিয়াসের পৃষ্ঠদেশের সীমান্তটি আরো ভালোভাবে জানা যাবে এবং Σ^- এর চুম্বকীয় ভ্রামকের মান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাবে। CERN-এর প্রোটন সিন্-ক্রোটন-এর সাহায্যে অ্যাণ্টিপ্রোটনীয় পরমাণু পাওয়া গেছে। সীগমীয় ও অ্যাণ্টিপ্রোটনীয় পরমাণুর শক্তিস্তরে এক্সরশ্মি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। অ্যাণ্টিপ্রোটনীয় পরমাণুতে প্রোটন ও অ্যাণ্টিপ্রোটনের স্পিন ভিন্নমুখী থাকে বলে বিকীর্ণ এক্সরশ্মি দ্বিমূর্তিতে (doublet) দেখা যায়। এই পরমাণুর সাহায্যে সুসমতা তত্ত্ব (symmetry principle) যাচাই করার সুযোগ আছে এবং তা' পরীক্ষা করা হচ্ছে। সিগ্‌মীয় পরমাণুতে পরমাণুটি ভারী বলে এক্সরশ্মির এই দ্বিমূর্তি সহজেই পাওয়া যাবে। এই পরমাণু দিয়েও নিউক্লিয়াসের পৃষ্ঠদেশের স্বরূপ আরো ভালোভাবে জানা সম্ভব হ'বে।

χ^- এর ভর Σ^- এর চেয়ে দশগুণ বেশী আর Ω^- প্রায় চল্লিশ গুণ। χ^- ও Ω^- যথেষ্ট দুর্লভ। আজ পর্যন্ত হয়ত সর্বসাকুল্যে 10000টি χ^- ও মাত্র 25টি Ω^- কণাত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া গেছে এবং তারা বুদ্‌বুদকক্ষে ধরা পড়েছে। ভবিষ্যতে এসব কণিকা যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া গেলে এদের আজব পরমাণুরও সাক্ষাৎ মিলতে পারে। নিউক্লিয়াসের স্বরূপ নির্ণয়ে এদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য হবে সন্দেহ নাই।

আজব নিউক্লিয়াস

আজব পরমাণু থেকে যেসব এক্সরশ্মি বেরোয়, তাদের কিছু কিছু গামারশ্মি পর্যায়ে পড়লেও পরমাণুর বিকিরণ বোঝাতে তাদের এক্সরশ্মি বলে অভিহিত করা হয়।

পাইওনীয় ও মিউওনীয় পরমাণুতে মেসন তার নীচের শক্তিস্তর থেকে সহজেই নিউক্লিয়াসে ঢুকে পড়তে পারে। তখন মেসনের গতীয় শক্তিতে নিউক্লিয়াস উত্তেজিত হয়ে যে গামা বিকিরণ করে, তা ধরা সম্ভব হয়েছে—যদিও পরমাণুর গামা পর্যায়ের এক্সরশ্মি থেকে এ জাতীয় গামারশ্মি আলাদা করে ধরা যথেষ্ট কঠিন।

সব আজব পরমাণুই অস্থায়ী। তবু অল্প জীবনকালের অস্তিত্বের মধ্যে এরা [illegible] তথ্য দিয়ে যায়, যাতে নিউক্লিয়াসের অনেক খুঁটিনাটি ধর্ম জানা সম্ভব হয়।

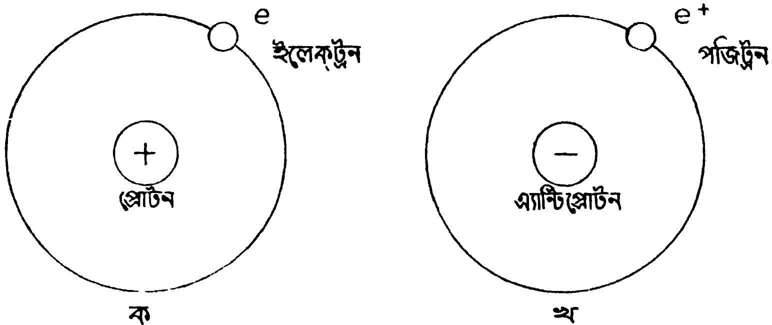
[illegible]ওন কণা নিউক্লিয়াসে ঢুকে পড়লে একটি নিউট্রনের সঙ্গে তার বিক্রিয়ায় নিউট্রনটি একটি Λ° হাইপেরনে (lambda hyperon) পরিণত হতে পারে। তখন এই নিউক্লিয়াস একটি আজব হাইপারনিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এরকম

^{4}He নিউক্লিয়াসে থাকে দুটি প্রোটন, একটি নিউট্রন ও একটি হাইপেরন Λ°। এসব হাইপারনিউক্লিয়াস দিয়ে নিউক্লীয় বলের ধর্ম আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

পউলির নিয়ম অনুযায়ী একই শক্তিস্তরে একরকমের দুটি কণা এক অবস্থায় থাকতে পারে না। ^{3}H ট্রাইটনে থাকে একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। ^{4}H নিউক্লিয়াস গড়ে উঠে না, কারণ ^{3}H-তে দুটি নিউট্রনের স্পিন ভিন্নমুখী, বাড়তি তৃতীয় নিউট্রন সেখানে অন্য দুটির যে কোন নিউট্রনের সমান্তরাল স্পিন নিয়ে টিকতে পারবে না। অবশ্য সেই নিউট্রন অন্য শক্তি স্তরে ঠাঁই পেলে একটি উত্তেজিত নিউক্লিয়াস পাওয়া যেতে পারে—তার আয়ু হবে ক্ষণিক। কিন্তু এই তৃতীয় কণাটি নিউট্রন না হয়ে যদি Λ° হয় তবে পউলির নিয়ম না ভেঙেও একই শক্তিস্তরে অন্য দুটি নিউট্রনের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারবে—কারণ Λ° নিউট্রন থেকে আলাদা ভিন্ন মৌলিক কণা। এরকম ^{4}H এমনকি ^{5}He হাইপারনিউক্লিয়াস গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

আজব অণু পরমাণু, আজব নিউক্লিয়াস মৌলিক কণা সম্পর্কীয় পদার্থ বিজ্ঞানের এমন একটি নতুন দিক—যা উচ্চশক্তি পদার্থ বিজ্ঞানকে (high energy physics) নিউক্লীয় ও পরমাণু বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করেছে। তাই এখন নতুন নতুন উচ্চশক্তির কণাত্বরক থেকে প্রচুর মৌলিক কণা সৃষ্টির দিকে বিজ্ঞানীদের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এসব মৌলিক কণা দিয়ে গড়া আজব অণু-পরমাণু ভবিষ্যতে জড়জগতের অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান দিতে পারে।

প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি নিয়ে আমাদের পার্থিব জগৎ। এ জগতের রীতিনীতি বিজ্ঞানের চোখে অনেকটা ধরা পড়েছে। কিন্তু এ জগতের উল্টোজগৎ আছে কি? বিপরীত কণা আবিষ্কারের পর এ প্রশ্ন উঠেছে। এ জগতে পজিট্রনের দেখা কদাচ পাওয়া যায়—এ জগতের অণু-পরমাণুর গঠনবিন্যাসে তার কোন ভূমিকাও নেই। তবু নভোরশ্মি থেকে বা কোন কোন কৃত্রিম আইসোটোপ (যেমন ^{22}Na) থেকে আমরা পজিট্রন পাই। ইলেকট্রনের মত পজিট্রন দিয়ে বিপরীত জড়জগৎ সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, বিপরীত নিউক্লিয়াস

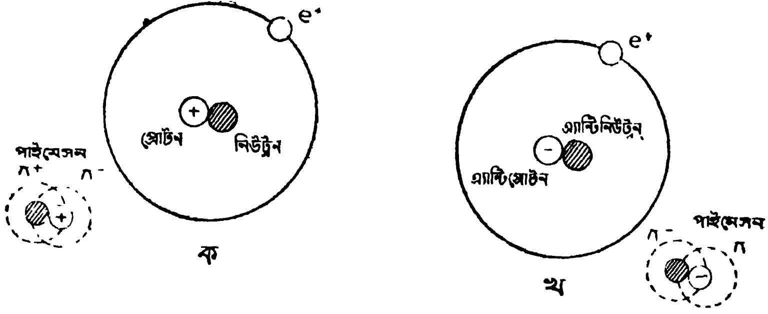


3.19 : (ক) হাইড্রোজেন ও (খ) অ্যান্টি-হাইড্রোজেন (?) পরমাণু।

গড়ে উঠতে পারে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। অ্যান্টিপ্রোটন, অ্যান্টিনিউট্রন আবিষ্কারের পর এ সম্ভাবনা বাড়ল। এখন কি আমরা এমন এক জগতের কল্পনা করতে পারি যেখানে পরমাণুতে আছে পজিট্রন আর তার নিউক্লিয়াস অ্যান্টিপ্রোটন ও অ্যান্টিনিউট্রন দিয়ে গড়া। আমাদের জগতের নিউক্লীয় বল কি এরকম বিপরীত জগতের নিউক্লিয়াসের বেলায়ও খাটবে। অ্যান্টিডয়েটরন ও অ্যান্টিহিলিয়াম নিউক্লিয়াস আবিষ্কৃত হওয়ার পর নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে যে, উল্টোজগৎ কিছু কল্পনার রাজ্য নয়—একই বল বিপরীত জগতের পরমাণু তৈরিতে নিশ্চয়ই সক্ষম।

আমাদের জগতের ইলেকট্রন যে ভূমিকা নিয়েছে, বিপরীত জগতে পজিট্রনেরও সেই ভূমিকা হবে। সেখানে ইলেকট্রনকেই সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। ইলেকট্রনিকস্-এর পরিবর্তে পজিট্রনিকস্ হ'বে সেখানে যন্ত্রপাতির উপাদান।

প্রোটন ও নিউট্রনের সাক্ষাৎ পেতে সেখানে বিভাট্রনের সাহায্য নিতে হবে। বিপরীত জগতের অধিবাসীরা আমাদের পৃথিবীর কাল্পনিক চিত্র হয়ত আঁকতে



3.20 : (ক) ডয়েটরন ও (খ) অ্যান্টি ডয়েটরন (?) পরমাণু

পারবে. আমরাও বিপরীত জগতের ছবি শুধু কল্পনাই করতে পারব। মুখোমুখি হওয়ার চিন্তা করা যাবে না, তাহলে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে।

বিপরীত কণা থেকে মহাকর্ষ বল নিয়ে নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নিউক্লীয় বল দিয়েই না হয় উল্টো নিউক্লীয়াস তৈয়ার হল—কিন্তু দুটি বিপরীত বৃহদাকার পদার্থের বেলায় মহাকর্ষ কীরকম কাজ করবে ? শক্তির রূপান্তরে কোন্ শক্তি বলে প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন জুড়ির সৃষ্টি হয় ? সে শক্তির স্বরূপ কি ? সে বল নিশ্চয়ই তড়িৎচুম্বকীয় নয়—কারণ সে বলে পজিটিভ ও নেগেটিভ কণায় আকর্ষণ হতে পারে, বিকর্ষণ নয়। তবে কি মহাকর্ষ বল জুড়ি গঠনে কোন ভূমিকা নেয় ? আমাদের জগতে মহাকর্ষের ভূমিকা হল শুধু আকর্ষণের—পদার্থ ও বিপরীত পদার্থের বেলায় তার ভূমিকা কি উল্টে যায় অর্থাৎ তা বিকর্ষণ ঘটাতে পারে ? তাহলে তো উল্টো বস্তু নিউটনের নিয়ম অগ্রাহ্য করে আকাশে উঠবে।

বড় আকারের বিপরীত পদার্থ পাওয়া গেলে না হয় সে পরীক্ষা করা যেতো। তবে বিপরীত পদার্থ নিয়ে যদি বিপরীত কোন জগৎ থাকে তবে সেখানকার মহাকর্ষ বল হয়ত আমাদের জগতের মত সেখানে কাজ করবে। কিন্তু আমাদের জগতেই যেসব বিপরীত কণা ধরা পড়ছে, আমাদের নিয়মকানুনের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে নিতে না পারলে নিয়মগুলির যথার্থতা বোঝা যাবে না।

আমাদের জগতের পদার্থকে যদি পজিটিভ ভরের ধরা যায়, তাহলে উল্টোবস্তুর মত নেগেটিভ ভরের কোন পদার্থ থাকতে পারে কি ? ধরে নেওয়া যাক্, আমাদের বিজ্ঞানের চলতি নিয়মেই এরকম পদার্থ আছে। মহাকর্ষ বল তখন এ দুয়ের মধ্যে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণের প্রভাব নিয়ে আসবে। কারণ যে মহাকর্ষীয় বল

দুটি পদার্থের গুণফলের অনুপাতী. একটি নেগেটিভ বলে স্বভাবতই গুণফল নেগেটিভ হয়ে বিকর্ষণ বোঝাবে। কিন্তু উল্টোপুরাণ বলবে অন্য কথা। নেগেটিভ ভর যেহেতু পজিটিভ ভরের বিপরীত. তাতে মহাকর্ষের প্রভাবও উল্টা হবে।

ধরা যাক্, পজিটিভ ভরের বাঁয়ে নেগেটিভ ভর রাখা হল। মহাকর্ষ বল পজিটিভ ভরের ক্ষেত্রে চলতি নিয়ম মেনে পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণের জন্য আরও ডাইনে ছুটবে। উল্টোভর মহাকর্ষজনিত বিকর্ষণ কিন্তু মানবে পজিটিভ ভরের উল্টো নিয়মে ; ফলে ছুটবে ডাইনে পজিটিভ ভরের দিকে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে যদি পজিটিভ ভরের পিছনে নেগেটিভ ভর এরকম ধাওয়া করে, তবে তো বিনা আয়াসে বিপুল গতিবেগ পাওয়া যাবে। গতির সঙ্গে গতীয় শক্তি এভাবে বেড়ে চললে, শক্তির নিত্যতাবাদ কি আর বজায় থাকবে ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই থাকবে, পজিটিভ ভর যত ছুটবে তার শক্তি যেমন বাড়বে, নেগেটিভ ভর ছুটলে তার শক্তি হবে নেগেটিভ অর্থাৎ কমবে—ফলে মোট শক্তি থাকবে নিত্য।

পজিটিভ ভর মহাকর্ষ বলে নেগেটিভ ও পজিটিভ ভরকে কাছে টানে, আর দুটি নেগেটিভ ভর উভয়কে দূরে ঠেলে দেয়। পজিটিভ ভর ও নেগেটিভ ভরে যদি একই আধান থাকে, তাহাল নেগেটিভ ভর পজিটিভ ভরের পেছনে ছুটবে। দুয়ের আধান উল্টো হলে, আর বৈদ্যুতিক বল যদি মহাকর্ষের চেয়ে বেশী হয়, তবে পজিটিভ ভর নেগেটিভ ভরের পিছনে তাড়া করবে।

আমাদের জগতে নেগেটিভ ভর টিকে থাকার বাধা হল এরকম ভর থাকলে, সব পজিটিভ ভরই নেগেটিভ ভরে পরিণত হবে ও বিপুল শক্তির সৃষ্টি করবে। তাতে আমাদের জগৎ টিকে থাকবে না।

আমাদের জগতে নেগেটিভ ভর থাকতে না পারলেও বিশ্বের কোথায়ও কি তার অস্তিত্ব থাকতে পারে ? সম্প্রতি কোয়াসার (Quasar) শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ নেগেটিভ ভরের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। মহাকর্ষ বলের উৎস সন্ধানে আইনস্টাইন বলেছেন দেশ ও কালের বক্রতাই মহাকর্ষের উৎস। এই সূত্র থেকে বলা যায়, কোয়াসারে দেশকালের বক্রতা একটু অন্যরকম, সেখানে মহাকর্ষ বল বেশী তীব্র। এই তীব্রতায় নেগেটিভ ভর উৎপন্ন হতে পারে। মহাকর্ষ তরঙ্গ ভর থেকে জন্মায়, পদার্থ তার উপর চেপে চলাচল করতে পারে। পজিটিভ ভর থেকে নেগেটিভ ভরের উৎপত্তি হলে যে শক্তির উদ্ভব হবে, তা যদি মহাকর্ষ শক্তির তরঙ্গ হয়, তবে আমরা একটা সমাধানে আসতে পারি। কোয়াসারের তীব্র উষ্ণতা ও পদার্থের ঘনত্ব তার কণিকাগুলিকে যে গতিবেগ দেয়, তাতে সৃষ্টি হয় মহাকর্ষ তরঙ্গের। অবশ্য পজিটিভ বা নেগেটিভ ভরের যে কোনটি মহাকর্ষ তরঙ্গের উৎস হতে পারে, কিন্তু এই তরঙ্গের শক্তি হবে

পজিটিভ আর পজিটিভ ভরই শুধু এই তরঙ্গের মাধ্যমে চলাফেরা করতে পারবে। এখন ধরা যাক্ 10 গ্র্যাম পজিটিভ ভর মহাকর্ষ তরঙ্গে যে শক্তি বিকিরণ করল, তার ভর তুল্যমূল্য হল 6 গ্র্যাম—অবশেষ রইল 4 গ্র্যাম। কিন্তু 10 গ্র্যাম পজিটিভ ভর যদি 12 গ্র্যাম তুল্যমূল্য শক্তি বিকিরণ করে, তবে তার অবশেষ হবে 2 গ্র্যাম নেগেটিভ ভর। এখন এই নেগেটিভ ভর যদি 4 গ্র্যাম তুল্যমূল্য শক্তি বিকিরণ করে, তবেই নেগেটিভ ভর পজিটিভ ভরে পরিণত হত। কিন্তু কোন ভরই এমন মহাকর্ষ শক্তি বিকিরণ করে না, যার শক্তি নেগেটিভ। বরং 2 গ্র্যাম নেগেটিভ ভর আরও 4 গ্র্যাম তুল্য মহাকর্ষ তরঙ্গ পাঠালে নেগেটিভ ভর আরও নেগেটিভ (−6 গ্র্যাম) হয়ে পড়বে। এভাবে ভর যতই নেগেটিভ হবে, তার গতিবেগও ক্রমশ কমে আসবে—কারণ তার শক্তির মাত্রাও যে বেশী নেগেটিভ হয়ে পড়ছে।

কোয়াসারের কেন্দ্র থেকে যে মহাকর্ষ তরঙ্গ বাইরের দিকে বিপুল পজিটিভ শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসছে—সেই শক্তির ঘাটতি পূরণ হ'চ্ছে কেন্দ্রে নেগেটিভ ভরের সৃষ্টিতে। পজিটিভ ভর মহাকর্ষের টানে কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে, আবার অন্য পদার্থের চাপে পড়ে কিছুটা ভাসবার চেষ্টা করছে। নেগেটিভ ভরের গতিও মহাকর্ষের জন্য কেন্দ্রের দিকে—কিন্তু তার ভেসে থাকার দিকটা উল্টো অর্থাৎ কোয়াসারের কেন্দ্রের দিকে। ফলে কোয়াসারের কেন্দ্রে পজিটিভ ও নেগেটিভ ভর মিলে শূন্য ভরের সৃষ্টি করছে। কোয়াসারের দেহ তাই বিচিত্র, তার কেন্দ্রাঞ্চল ভরহীন, বাইরের দিকে রয়েছে পজিটিভ ভর। কোয়াসার থেকে যতই প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হ'চ্ছে ততই তার কেন্দ্রে নেগেটিভ ভরের সঞ্চয় বাড়ছে।

কোয়াসারের কেন্দ্র থেকে নেগেটিভ ভর ঠেলে বাইরে আসতে পারে না, তাই আমরা নেগেটিভ ভর দেখতে পাই না। কিন্তু যতই শক্তির বিকিরণ হয়, বাইরের দিকে নেগেটিভ ভর বেড়ে কোয়াসারের ভরহীন কেন্দ্রাঞ্চল ফেঁপে ওঠার কথা। বেশী ফেঁপে উঠলে জ্যোতিষ্কটি ভেঙে পড়তে পারে। তখন কি নেগেটিভ ভর দেখা যাবে? তখন মহাকাশের ভেতর দিয়ে অন্য জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে তাকে অবিলম্বে ঢুকে পড়তে হবে সেই জ্যোতিষ্কের কেন্দ্রে, বাইরে থাকা সম্ভব নয়। মহাকর্ষ বলের কাছে নেগেটিভ ভরের পরস্পর বিকর্ষণই শুধু সম্ভব, তাই নতুন একটি নেগেটিভ ভরের জ্যোতিষ্ক কখনই গড়ে উঠবে না।

মহাকাশে ক্ষণিক অবস্থানের সময় নেগেটিভ ভর যদি পজিটিভ ভরের কাছে এসে যায়, তবে পজিটিভ ভর আরও বেগে ছুটে চলবে। এখন এই পজিটিভ ভর আমাদের জগতে এসে পড়লে সৃষ্টি হবে নভোরশ্মির। আমাদের গবেষণাগারে যে নভোরশ্মি ধরা পড়েছে, তার উৎস যে নেগেটিভ ভর নয়—একথা আমরা বলতে পারি না।

উল্টো ভরের বা উল্টো পরমাণুর উল্টোজগৎ যেখানেই থাকুক না কেন, তা চিরদিনই থাকবে আমাদের নাগালের বাইরে। উল্টো ভরের দেশে গেলে তাড়া খেয়ে ছুটে পালিয়ে আসতে হবে, আর উল্টো পরমাণুর দেশে পাওয়া যাবে সাদর সম্ভাষণ—অবশ্য তার সমাপ্তি ঘটবে বিনাশে।

তাই চাঁদে, মঙ্গল বা শুক্রগ্রহে পাড়ি জমানোর কথা আনন্দে ভাবতে পারেন—কিন্তু উল্টোজগৎ সম্বন্ধে একটু সাবধান হতে হবে বৈকি !

একমেরু চুম্বক

বিজ্ঞানে কোনো কিছুই আজব নয়। পরীক্ষায় আজব কিছু ঘটনার সন্ধান পেলে তত্ত্ব দিয়ে বিজ্ঞান তার যাচাই করে। আবার তত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন কিছু পাওয়া গেলে পরীক্ষায় তা পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। একমেরু চুম্বক (magnetic monopole) এরকম একটি উদাহরণ। ডির‍্যাকের তত্ত্বে জানা যায়, বিদ্যুতের যে রকম ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি মৌলিক কণা আছে, চুম্বকেরও সেরকম চৌম্বককণা থাকবে। উত্তর বা দক্ষিণমেরু-বিশিষ্ট মুক্ত একমেরু চুম্বক থাকা স্বাভাবিক। অথচ এরকম পদার্থের অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না। তড়িৎ ও চুম্বকত্ব—এদের সম্পর্ক নিবিড় হলেও একটি জায়গায় এদের বেশ অমিল দেখা যায়। আধানবিশিষ্ট কণার গতি থেকে চুম্বকত্বের জন্ম। এরকম কণা সোজাসুজি তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন করে—কিন্তু চুম্বকত্ব উৎপাদন যেন কিছুটা গৌণ ব্যাপার।

মৌলিক কণার আলোচনায়, নিত্যতাবাদের নিয়মগুলির পেছনে সুসমতা বজায় রাখার যে ঝোঁক পার্থিব প্রকৃতির স্বভাবজাত মনে হয়, এক্ষেত্রে তার যেন ব্যতিক্রম ঘটছে। তা না হলে দেখা যেত চুম্বককণা থেকে চুম্বকক্ষেত্র ও তার গতি থেকে তড়িৎক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছে। আধানের মত চুম্বককণারও সুসমতা থাকা উচিত। ইলেকট্রন যেরকম তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ বা শোষণ করতে পারে, চুম্বককণারও সেরকম ধর্ম থাকা প্রয়োজন। ফোটন থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জুড়ি তৈরি হয়—সেরকম উত্তর ও দক্ষিণ একমেরু চুম্বকের জুড়িগঠন হবে না কেন?

কোন পদার্থের একটি তলে পজিটিভ ও অন্য তলে নেগেটিভ আধান স্থায়ী-ভাবে থাকতে পারে না। পদার্থের উপর তড়িৎক্ষেত্রের আরোপ হলে তার পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটন-সমষ্টি বিপরীতদিকে কিছুটা সরে যায়। তড়িৎক্ষেত্র তুলে নিলে তারা আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। কিন্তু এরকম পদার্থ আছে যাতে পজিটিভ ও নেগেটিভ আধান আর নিজের জায়গায় ফিরে না। এর নাম ইলেকট্রেট। হিভী সাইড এরকম পদার্থের কল্পনা করেছিলেন, 1925 খ্রীষ্টাব্দে ইগুচি তা কার্যত আবিষ্কার করেন। রজন মিশ্রিত কার্নাউবাওয়াক্স জাতীয় পদার্থে পজিটিভ ও নেগেটিভ আধানের এরকম স্থায়ী মেরুর সৃষ্টি হয়—এদের বলা হয় ইলেকট্রেট। অবশ্য দ্বিমেরু স্থায়ী ম্যাগনেট বা চুম্বক সহজেই যেমন তৈরি করা যায়, ইলেকট্রেট সেই তুলনায় অবশ্যই বিরল। একক আধানের মুক্ত ইলেকট্রন প্রোটন সহজেই পাওয়া যায়—কিন্তু একমেরু চুম্বক দুর্লভ।

1975 খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইস্ ও সার্ফ ও হাউস্টন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওসবোর্ণ ও পিনুসকি দাবী করেন যে তাঁদের পাঠানো বেলুনে উপরের আকাশে একমেরু চুম্বকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। এই বেলুনে ছিল কিছু ফিল্ম, প্লেট ও লেক্সান পাত। লেক্সান পাত একরকম প্ল্যাস্টিক, যাতে উচ্চশক্তির কণা ধরা পড়ে তাদের গতিপথ চিহ্নিত করে যায়। প্লেটগুলি এমালসন মাখানো, এতেও এরকম কণা ধরা পড়ে। 33টি লেক্সান পাতে এমন কণার দেখা পাওয়া গেছে যার পরমাণু সংখ্যা 125-এর বেশী অর্থাৎ তা একটি অতিভারী মৌলিক পদার্থ। তা ছাড়া এই কণার গতিবেগ দেখা গেছে আলোর 0·92 গুণ থেকেও বেশী। এরকম আজব কণা না হয়ে চিহ্নিত পদার্থটি একমেরু চুম্বক হতে পারে যার কোয়াণ্টাম তড়িৎ আধানের একক e থেকে 137 গুণ বেশী এবং গতিবেগ আলোর প্রায় অর্ধেক, ভর প্রোটনের 600 গুণেরও বেশী। ডির‍্যাকের মতবাদে চুম্বকের কোয়াণ্টাম e এর $\frac{137}{2}$ হওয়ার কথা, তাছাড়া এই পদার্থটি যদি একটি একমেরু চুম্বক হয়, তবে তার জুড়িটি কোথায় ? এসব তর্ক উঠে অবশ্য একমেরু চুম্বক আবিষ্কারের দাবি নস্যাৎ হয়ে গেছে। এখনও তার অস্তিত্ব নাগালের বাইরে।

বড় বড় যে সব কণাত্বরণ যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তা দিয়ে একমেরু চুম্বকের খোঁজ করা হবে। মৌলিক কণার গবেষণায় যে সব দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর দিয়ে পদার্থ জগতের বিশ্লেষণ চলছে, একমেরু চুম্বকের অস্তিত্ব তাতে নতুনভাবে আলোকপাত করবে।

দুটি একমেরু চুম্বকের আলাদা অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া গেলেও তাদের ধর্ম, যেমন জন্ম ও মৃত্যু রহস্য, বেঁচে থাকার খুঁটিনাটি সম্পর্কে তথ্যগুলি খুঁজে দেখা যেতে পারে। চুম্বকীয় আধানের মধ্যে যে বল কাজ করবে তার পরিমাণ হবে বৈদ্যুতিক বলের চেয়ে $(\frac{137}{2})^2$ গুণ বেশী। একমেরু চুম্বকের অস্তিত্ব থাকলে তার ভর হবে প্রোটনের চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশী। প্রোটন, ইলেকট্রন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভরের মত একমেরু চুম্বকও ভিন্ন ভিন্ন ভরের হওয়া বিচিত্র নয়। একমেরু চুম্বক কণা যথেষ্ট ভারী হ'বে—জুড়ি গঠন প্রক্রিয়ায় তার জন্ম সম্ভব হলে নভোরশ্মিতে বা ব্রুকহাভেন ও সার্নের কণাত্বরণ যন্ত্রে উত্তর ও দক্ষিণমেরু বিশিষ্ট একমেরু চুম্বকের জুড়ি পেলেও পাওয়া যেতে পারে। প্রাইস্ ও সার্ফের বেলুনের পরীক্ষায় হয়ত ভারী কোন কণাকে তাঁরা একমেরু চুম্বক বলে ভুল করেছিলেন, কিন্তু এরকম পরীক্ষায় সত্যিকারের একমেরু চুম্বক একদিন ধরা পড়তেও পারে।

নভোরশ্মি থেকে জন্মালে একমেরু চুম্বকের নিজস্ব চুম্বকক্ষেত্র নভোমণ্ডলের সামান্য কোন ক্ষীণ চৌম্বকক্ষেত্রেও যে ত্বরণ পাবে, তাতে ইলেকট্রন যেরকম ধাতুতে বাঁধা পড়ে, সেরকম উপায়ে উল্কাপিণ্ডে তার আটকে পড়া অসম্ভব নয়। তাহলে পুরানো উল্কাপিণ্ডগুলির সংগ্রহের মধ্যে তার অস্তিত্ব খুঁজে দেখা যায়। উল্কাপিণ্ডের

সংস্পর্শ এড়িয়ে এরা যদি আমাদের বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে তবে লৌহখনিজে ঢুকে থেকে যেতে পারে। অবশ্য উল্কাপিণ্ড বা লৌহখনিজ থেকে একমেরু চুম্বক পৃথক করে নেওয়া খুব সহজ হবে না। অন্ততঃ 60 হাজার বা ততোধিক গাউস্ চুম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে তাকে টেনে বের করতে হবে। এরকম কোন পরীক্ষায় একমেরু চুম্বক পাওয়া যায় নি।

এমালসন, মেঘকক্ষ বা বুদ্‌বুদকক্ষে একমেরু চুম্বক ধরা পড়তে পারে—কারণ এর গতিপথ হ'বে অন্য মৌলিক কণা থেকে আলাদা।

কেউ কেউ বলেন একমেরু চুম্বক চুম্বকীয় অণু গড়তে পারে। পরমাণুর নিউক্লীয় চুম্বকত্ব তাদের নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি টেনে আনতে পারে। এ সবই হল অনুমান-ভিত্তিক।

বিজ্ঞানীরা থেমে নেই। যতদিন না প্রমাণ করা যায় যে, তত্ত্বের ভিত্তিতে একমেরু চুম্বকের অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে না পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে ততদিন তাঁরা খুঁজে বেড়াবেন—ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খোঁজার মত। হয়ত সাফল্য একদিন আসবে।

মৌলিক কণা প্রসঙ্গে আমরা যে ক্যুআর্কের কথা বলেছি তার অস্তিত্ব অজানা। কেউ কেউ মনে করেন যে, একমেরু চুম্বক ও ক্যুআর্ক এই দুইয়ের মধ্যে কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে। তাই যখনই কোন উচ্চশক্তি কণা ত্বরণযন্ত্র প্রথম চালু হয়, বিজ্ঞানীরা তার সাহায্যে এই দুই অজানা কণার সন্ধান করে বেড়ান। সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ত ভবিষ্যতের হাতে।

প্রাকৃতিক বল

জড় জগতে পদার্থ ও কণার প্রকৃতি, তাদের পরস্পর বিক্রিয়ার আলোচনায় বিভিন্ন বলের কথা এসে পড়েছে। এসব বল জড়জগতের পদার্থ ও মৌলিক কণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে যে প্রাকৃতিক বলের কথা আমাদের প্রথমেই মনে আসে, তা হল মহাকর্ষ বল। মহাকর্ষের গণিত তত্ত্ব আমাদের সুপরিচিত। নিউটনের মতবাদে এই বল পদার্থ দূরে থাকলেও তাদের ভেতর আকর্ষণের সৃষ্টি করে। মহাকর্ষ বলই পার্থিব ও মহাকাশ পদার্থবিজ্ঞানের সেতুবন্ধ। নিউটনের বিপরীত বর্গ নিয়ম থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চাঁদের দূরত্ব তার নিজের পৃষ্ঠদেশ থেকে ষাটগুণ বেশী বলেই পৃথিবীর দিকে চাঁদের ত্বরণ খসে পড়া আপেলের থেকে 3600 গুণ কম।

মহাকর্ষের চেয়ে বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব সম্পর্কে প্রাচীনযুগে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। 1873 খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব সম্পর্কে গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে এদের সম্পর্ক ও স্বরূপ নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুতে আকর্ষণ, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর আকর্ষণ—এসব ধর্ম ছাড়াও ম্যাক্সওয়েলের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, চুম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তনে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনে চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। আলো বা যে কোন বিকিরণ মহাশূন্যে যে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এই ধারণা বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব ও এদের সঙ্গে বিকিরণের সম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করল।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মত মহাকর্ষেরও তরঙ্গ থাকার সম্ভাবনা থাকলেও তা বাস্তবে ধরা সম্ভব হয় নি। পদার্থের অণু-পরমাণু জগতে তড়িৎ চুম্বকীয় বলই প্রধান, কিন্তু সেখানে মহাকর্ষ বলের প্রভাব নগণ্য। কেবল বৃহৎ পদার্থের জগতেই মহাকর্ষ বল কাজ করে। ছায়াপথ, গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক মহাকর্ষ আকর্ষণের প্রভাবে বাঁধা। এই বলের প্রভাবে শুধু আকর্ষণই দেখা যায়, তড়িৎ চুম্বকীয় বলে আকর্ষণ-বিকর্ষণ দুইই ঘটে থাকে। 1925 খ্রীষ্টাব্দ থেকে আইনস্টাইনের চেষ্টা ছিল মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বল দুটির পরস্পর সম্পর্ক দাঁড় করিয়ে এদের একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব (unified field theory) স্থাপন করা। তাঁর জীবদ্দশায় আইনস্টাইন এবিষয়ে সাফল্যলাভ করেন নি। বিজ্ঞানী ভিন্‌বার্গের মতে এই অসাফল্যের প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে বিশ্বজগৎ শুধু তড়িৎ-চুম্বকীয় ও মহাকর্ষবলের অনুশাসনে চলে না। 1930 খ্রীষ্টাব্দে আর দুটি বলের কথা জানা গেল—তা হল ক্ষীণ (weak) ও তীব্র (strong) বল। তীব্র বল ক্ষুদ্রায়তন

নিউক্লিয়াসে শতাধিক প্রোটনকে বেঁধে রাখে—তার শক্তি তড়িৎ চুম্বকীয় বল থেকে বহুগুণ বেশী। তীব্রবলের নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় মুক্ত শক্তি রাসায়নিক ক্রিয়ার তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। তেজস্ক্রিয়ার বীটাক্ষরণ ক্ষীণ বিক্রিয়ার উদাহরণ। নিউক্লীয় সংযোজনে যে সৌর শক্তির সৃষ্টি তার মূলে আছে ক্ষীণ বিক্রিয়া তথা ক্ষীণ বল। এ নিয়ে আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

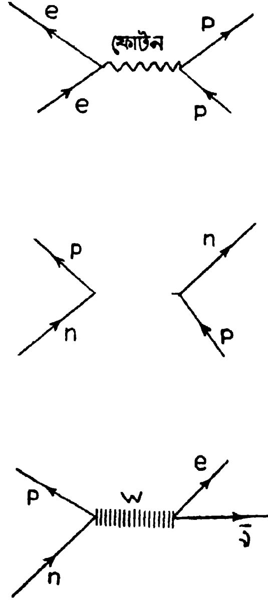
তীব্রতার ক্রম অনুযায়ী সাজালে সবচেয়ে কমজোরী মহাকর্ষ বল ও পর পর ক্ষীণ, তড়িৎ চুম্বকীয় ও তীব্র বল। আমাদের কাছে মহাকর্ষ ও তড়িৎ চুম্বকীয় বল সবচেয়ে বেশী পরিচিত, কারণ এদের পাল্লা বিপরীত বর্গ অনুযায়ী অসীম দূরত্বেও কাজ করে। তীব্র ও ক্ষীণ বলের পাল্লা খুব ছোট—তীব্র বলের বেলায় $\sim 10^{-13}$ সেঃ মিঃ আর ক্ষীণ বলের বেলায় আরও কম। এত ছোট পাল্লার মধ্যে এদের বিক্রিয়া বিশেষ পরীক্ষায় শুধু ধরা পড়ে। তাই আমাদের সাধারণ মাপের মধ্যে এরা সহজে আসে না। কিন্তু এই দুটি বল বাদ দিয়ে শুধু মহাকর্ষ ও তড়িৎ চুম্বকীয় বলকে একীকৃত করলে সাফল্য না আসাই স্বাভাবিক। 1920 থেকে 1930 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোয়াণ্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের (quantum field theory) প্রতিষ্ঠায় জানা গেল মৌলিক কণার বিক্রিয়া ঘটে তাদের বিনিময়ে। প্রাকৃতিক বলের আর একটি স্বরূপ জানা গেল যে তড়িৎ চুম্বকীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণে ফোটন কণার বিনিময় ঘটে। বলের পাল্লা বিনিময়শীল কণার ভরের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতী। তড়িৎ চুম্বকীয় ও মহাকর্ষ বলে শূন্য ভরের বিনিময় ঘটে, তাই তার পাল্লা অসীম প্রসারী। এই কণাগুলি হল যথাক্রমে ফোটন ও কাল্পনিক গ্র্যাভিটন। তীব্র বলের পাল্লা ছোট, তাই তার বিনিময় কণাগুলি প্রোটন, নিউট্রন বা মেসনের মত ভারী। ক্ষীণবলের পাল্লা আরও ছোট, তাই তার বিনিময় কণা আরও ভারী হওয়াই সম্ভব।

তত্ত্বের ভিত্তিতে ক্ষীণবল জনিত বিনিময় কণাকে বলা হয় W কণা। এবং এরকম আহিত ও আধানহীন W কণার ভর হবে যথাক্রমে হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় 80 এবং 90 গুণ। এরকম কণা আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

গেজ ক্ষেত্র তত্ত্ব (gauge field theory) দিয়ে ক্ষীণ, তড়িৎ চুম্বকীয় এবং সম্ভবতঃ তীব্র বিক্রিয়ার একটি একীকৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।

এদিকে ক্যুআর্ক কণা সব মৌলিক কণার ভিত্তিতে আছে—এই তত্ত্বটিও পদার্থ বিজ্ঞানকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে। প্রোটন যদি তিনটি ক্যুআর্কের সমষ্টি হয় তবে প্রোটনের দুটি ক্যুআর্ককে আলাদা করা যায় না কেন? গেজ ক্ষেত্র তত্ত্বে বলে যে দুটি ক্যুআর্ককে প্রোটন থেকে যতই টেনে দূরে সরান যাবে—ততই বেশী শক্তির প্রয়োজন হবে। সেই শক্তির পরিমাণ শেষ পর্যন্ত এত বেশী হবে তা থেকে

কুআর্ক-অ্যান্টিকুআর্কের জোড় তৈরি হবে। তখন প্রোটনের কুআর্ক দুটি এই জোড়ের সঙ্গে মিলে দুটি ভারীকণা তৈরি করবে। যেমন একটি দড়ি টানলে শেষে তা ছিঁড়ে গিয়ে দুটি দড়িতে পরিণত হয়।



3.21 : বিনিময় কণার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বলের ক্রিয়া (ক) তড়িৎ-চুম্বকীয়, (খ) নিউক্লীয়, (গ) ক্ষীণবল।

এখন দুটি কুআর্ককে তাহলে যদি জুড়ে দিতে এগিয়ে আনা হয় তবে বল নিশ্চয়ই কমতে থাকবে। তাহলে খুব ছোট পাল্লার মধ্যে কি তীব্র বিক্রিয়ার শক্তি ক্ষীণ অথবা তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির পরিমাপের সঙ্গে তুলনীয় হবে ? এই কম পাল্লার মাপে তখন হয়ত মহাকর্ষেরও প্রভাব এসে পড়বে। গেজ ক্ষেত্রতত্ত্বে হয়ত এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

এখন বিনিময় কণাগুলির কথায় আসা যাক। একদিকে শূন্যভরের ফোটন আবার এতভারী W কণা। সালাম, ভিনবার্গ ও গ্ল্যাসো তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রমাণ করেছেন যে একই ইলেক্ট্রোউইক বলের এপিঠ-ওপিঠ হল তড়িৎ-চুম্বকীয়ও ক্ষীণ বিক্রিয়াজনিত বল। এই তত্ত্বের প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল স্ট্যানফোর্ড রেখাকার ত্বরণ যন্ত্রের একটি পরীক্ষায়। পরীক্ষাটি হল ভারী জলের সংঘাতে ত্বরণ সমন্বিত

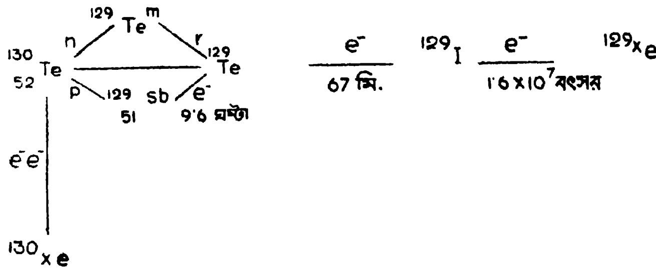
বামাবর্তী ইলেকট্রন্ দক্ষিণাবর্তী ইলেক্ট্রন থেকে বেশী পরিমাণে বেঁকে যায়। এই বাড়্তি পরিমাণ খুবই সূক্ষ্ম, প্রায় দশহাজার ভাগের একভাগ। তত্ত্বের সঙ্গে এই পরিমাপ মিলে যায়। এখন W কণার অস্তিত্ব পাওয়া গেলে, সালাম ভিনবার্গতত্ত্বের অকাট্য প্রমাণ' মিলবে। *CERN*-এর প্রোটন অ্যান্টিপ্রোটন ত্বরণের বৃহৎ যন্ত্রটি এরকম কণা থাকলে তা ধরতে পারবে আশা করা যায়।

অবশ্য এখনই নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ইলেক্ট্রোউইক বল আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাকৃতিক বলের সংখ্যা তিনটিতে দাঁড়িয়েছে। 1973 খ্রীষ্টাব্দে সালাম ও যোগেশচন্দ্র পাতি এবং 1974 খ্রীষ্টাব্দে জর্জি ও গ্ল্যাসো যে একটি নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তাতে তীব্র নিউক্লীয় বল এবং তড়িৎ চুম্বকীয় বল যে একই বলের রূপান্তর তা প্রমাণিত হয়েছে। এই বলকে বলা হয় ইলেক্ট্রোনিউক্লিয়ার বল। পরীক্ষায় এই তত্ত্ব প্রমাণিত হলে তা মহাকর্ষ ছাড়া অন্য তিনটি বলকে একীকৃত করে মহান একীকরণ তত্ত্ব বা Grand Unification Theoryর আংশিক প্রতিষ্ঠা করবে। এই তত্ত্বের প্রমাণে যে পরীক্ষা সফল হওয়া প্রয়োজন তা হল প্রোটনের ক্ষয়। আমরা তো প্রোটন কণাকে স্থায়ী বলেই জানি কিন্তু সালাম-পাতির তত্ত্বে প্রোটন হবে অস্থায়ী। তার ক্ষয়জনিত গড় জীবৎকাল হবে $10^{31}-10^{33}$ বছর। এসময় খুবই দীর্ঘ। অর্থাৎ $10^{31}-10^{33}$ প্রোটনের বছরে একটি মাত্র গড়ে ক্ষয় পাবে ও পজিট্রন মেসন প্রভৃতি কণিকার সৃষ্টি হবে. আর সেই সঙ্গে কিছুটা বিকিরণ। এই ক্ষয়জনিত ঘটনা পরীক্ষায় ধরা পড়া দুরূহ। তবু এই দুরূহ পরীক্ষা নিয়ে কয়েকটি দেশ এগিয়ে এসেছে তার ভেতর রয়েছে আমেরিকা, ইতালী. ভারত, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি। ভারতে পরীক্ষাটি চলেছে কোলার স্বর্ণখনির 2300 মিটার গভীরতায় যেখানে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব থাকবে না। প্রায় 140 টন লোহা নেওয়া হয়েছে ও সমানুপাতিক গণক যন্ত্রে (proportional counter) লোহানিউক্লিয়াসের প্রোটনের ক্ষয়জনিত বিরল ঘটনা ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। 1981 খ্রীঃ এপ্রিলে 131 দিন অবিরাম পরীক্ষার ফল হল তিনটি প্রোটন ক্ষয়ের ঘটনা যেন ধরা পড়েছে—তবে অন্ততঃ 15টি এরকম ঘটনা ধরা না পড়লে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

আমেরিকায় যে দুটি পরীক্ষা চলেছে তাতে প্রোটনের উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে যথাক্রমে 9000 ও 1000 টন জল। এসব পরীক্ষার ফল নিশ্চিতভাবে তত্ত্ব প্রমাণে সাহায্য করতে পারবে।

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যে পরীক্ষার পরিকল্পনা করেছেন তাতে প্রোটনের উৎস হল টেলুরিয়াম-130 আইসোটোপ। প্রোটনের ক্ষয় ঘটলে এই আইসোটোপ কয়েকটি ধাপে তেজস্ক্রিয় আইওডিন-129এ রূপান্তরিত হবে যার অর্ধহ্রাসকাল $1{\cdot}6\times10^{7}$ বৎসর। আইওডিন-129 রূপান্তরিত হয় জেনন্-129

স্থায়ী আইসোটোপে। টেলুরিয়াম-130 আবার যুগপৎ দুটি বীটকণা বা ইলেকট্রন বিকিরণ করে সোজাসুজি জেনন-130 এ রূপান্তরিত হ'তে পারে। এরকম বীটা-ক্ষয়ের জীবৎকাল জানা আছে। সেই কালের পরিমাণ থেকেও অতি-সুবেদী ম্যাসস্পেক্ট্রোমিটার যন্ত্রে জেনন 129 এবং 130 দুটি আইসোটোপের আপেক্ষিক পরিমাণ পরিমাপ করে বলা যাবে প্রোটনের ক্ষয় হলে তার জীবৎকাল, তত্ত্বের সঙ্গে কতটা মিলছে।



চিত্র 3.22 : প্রোটনের ক্ষয়নিরূপণে সম্ভাব্য পরীক্ষা।

বলগুলির একীকরণ তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিশ্বসৃষ্টির আদিম লগ্নে সব বলই হয়ত ছিল একই রকম দূরপ্রসারী ও বিপরীত বর্গ নিয়ম মেনে চলত। ক্রমশঃ এই সমতার সূত্রটি কোথায় হারিয়ে গেছে—গেজ ক্ষেত্রতত্ত্ব সেই সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করছে।

তবে আইনস্টাইনের মহান একীকরণ সমস্যা কি সমাধানের পথে? ত্রিমাত্রিক দেশ ও কাল-এর বক্রতা থেকে আইনস্টাইন মহাকর্ষের প্রকাশ ধরতে পেরেছিলেন। চারটি বলের একীকরণে হয়তো দেশ ও কালের অতিরিক্ত মাত্রার প্রয়োজন আছে—যা এখনও আমাদের জানা নেই। তা ধরা পড়লে মহাকর্ষও একীকরণের সামিল হ'বে।

বেদান্তদর্শনে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সেই এক অদ্বৈতের কথা বলা হয়েছে। 'অহম্ বহুস্যাম ভূয়েম' বহু হওয়ার ইচ্ছায় সেই অদ্বৈত থেকে বিচিত্র বিশ্বের অভিব্যক্তি। স্বাভাবিক বলগুলি কি সেরকম কোন আদিম অদ্বৈত বলের বিভিন্ন প্রকাশ? তবে সেই অদ্বৈতবল একদা প্রমাণিত হলেও কোন্ প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় তা ভিন্নধর্মী হয়ে পড়েছে তার সন্ধানে হয়ত সৃষ্টি রহস্যের আদিম লগ্নটির স্বরূপ খুঁজে পেতে হ'বে। তখন হয়ত এই শতকেই প্রাকৃতিক বল নিয়ে সব সমস্যার অবসান হওয়া অসম্ভব হ'বে না।

4

বিকিরণ ও বিশ্বজগৎ

তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে

—ঋগ্বেদ

সৃষ্টি রহস্য

পৃথিবীর মানুষ বিপুল বিশ্বের এক কোণে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে দেখতে পায় তার চারদিকে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত মহাকাশ। এই বিশ্বের আদি ও অন্ত অজানা। তবু মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের সৃষ্টি রহস্যের সন্ধান করে এসেছে। বেদ, পুরাণ, বাইবেল সব গ্রন্থেই এই রহস্য সমাধানের প্রয়াস দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এসব সিদ্ধান্ত বিনা যুক্তিতে মেনে নিতে রাজী নন। তাই নতুন আলোতে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির মূল সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে চলেছেন।

বিজ্ঞানীদের মতে সৃষ্টির প্রত্যূষে গোটা বিশ্ব জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল অখণ্ড নভোবায়ু (cosmic gas)। সেই বায়ুরাশির বিপুলতা থেকে তার মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। তখন তা বিভক্ত হয়ে বিন্দু বিন্দু আকার নিল। সেই বিন্দুগুলিই মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনের ফলে নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে। তখন সে সব নক্ষত্র ছিল শীতল ও হাল্কা বায়ুতে গড়া।

নক্ষত্রসৃষ্টির এই যুক্তি মেনে নিতে হলে প্রশ্ন উঠে, সাধারণ বায়ুমণ্ডলে কেন এরকম বায়ুবিন্দুর সৃষ্টি হয় না ? সেখানে তো অনন্তকাল ধরে সেই অবিরাম বায়ুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত রয়েছে। যদিও নভোমণ্ডলের উপাদান ও তাপের সঙ্গে সাধারণ পার্থিব বায়ুমণ্ডলের যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবুও তাদের সাধারণ ধর্মে পার্থক্য থাকার কথা নয়। তবু আমাদের বায়ুমণ্ডলে বায়ুবিন্দু গড়ে উঠবে ও বিন্দুগুলির মাঝের অংশ বায়ুহীন থাকবে এরকম কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু নভো ও সাধারণ বায়ুমণ্ডলের পার্থক্য হল তাদের ঘনমান এক নয়। আমাদের বায়ুমণ্ডল আয়তনে অনেক ছোট, তাই সেখানে বায়ুবিন্দু গড়ে ওঠার চেষ্টায় বাধা দেবে ঐ বিন্দুর বায়ব চাপ। ফলে ঘনীভবন ঘটতেই পারবে না। নভোবায়ুর বেলায় বায়ুবিন্দুর জ্যামিতিক আয়তন এত বড় যে, এদের ভেতরকার মহাকর্ষ আকর্ষণই বিন্দুকে টিকিয়ে রাখবে। বরং এই মহাকর্ষ আকর্ষণে বায়ুবিন্দুর সংকোচন এত বাড়বে যে, তার তাপ ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলবে।

সৃষ্টির আগে নভোবায়ুর গড় ঘনত্ব ছিল জলের 10^{-23} গুণ। এ রকম কম ঘনত্বে ও ক্রমশঃ তাপ বাড়ার ফলে 10^{30} কিঃ গ্রাঃ ভরের 2-3 আলোক বছর ব্যাসের নক্ষত্র প্রথমে সৃষ্টি হতে পেরেছিল। মহাকর্ষীয় সংকোচনে এসব নক্ষত্রই বর্তমানের আকার পেয়েছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, তখন আরও বড় নক্ষত্র সৃষ্টি হয়ে থাকলে সে সব অতি তারকা ভেতরকার অস্থিরতায় বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই বা হয়ত অধিক নক্ষত্রে কিছুকাল পরেই বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, 200 কোটি বছর আগে নক্ষত্রগুলির জন্ম হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—বর্তমান যুগে কি আর নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে অথবা সেই আদিম মুহূর্তটিতেই বিশ্বসৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করেছে ? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে মহাকাশের বিভিন্ন শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির জীবনচর্যা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। অল্পবয়সী লালউজ্জানী নক্ষত্র E. Aurigae এর কথা ধরা যাক্। তার সৃষ্টিকালীন মহাকর্ষীয় সংকোচন এখনও শেষ হয়নি। অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় এই শ্রেণীর নক্ষত্রদের শিশুই বলতে হবে। সাধারণ পর্যায়ের নীলদানব নক্ষত্রগুলির বয়সও খুব বেশী নয়। তাই নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি হবে না একথা বলা চলে না। মহাশূন্যে রয়েছে বায়ব-নীহারিকার আকারে বস্তুপুঞ্জ, তা ঘনীভূত হয়ে নতুন নক্ষত্র গড়ে উঠতে পারে যে কোন সময়ে। তা সত্ত্বেও নিশ্চয় করে বলা যায় যে সেই আদিম যুগে প্রধান প্রধান নক্ষত্র দেহের সৃষ্টি হয়ে গেছে—এখন এরকম সৃষ্টি হবে বিরল ঘটনা।

শ্বেত বামন নক্ষত্রগুলি নিয়ে আর এক সমস্যা দেখা যায়। যে তাপ-নিউক্লীয় ক্রিয়ায় নক্ষত্রদেহে শক্তির সৃষ্টি—তার উৎস হল হাইড্রোজেন। শ্বেত বামনে হাইড্রোজেন নেই তাই তাপনিউক্লীয় ক্রিয়া চলে না। আমাদের সূর্য এখনই তার হাইড্রোজেন ভাণ্ডারের প্রায় 1/35 অংশ খরচ করে ফেলেছে—আগামী কয়েক কোটি বছরে সেও শ্বেত বামন অবস্থায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু এখনই সাইরাস সহচর নক্ষত্রটির হাইড্রোজেন ফুরাল কী করে ? যেহেতু রাসায়নিক মৌল মহাকাশে সমানভাবেই ছড়িয়ে থাকার কথা, সাইরাস সহচর নক্ষত্রে নিশ্চয়ই হাইড্রোজেন কম ছিল না। আবার অন্যান্য সব নক্ষত্রের কয়েক মিলিয়ন বছর আগে তার সৃষ্টি হয়েছে—তাও বলা যায় না।

গ্যামোর সিদ্ধান্ত হল আজকের শ্বেত বামনগুলি কোনদিন শৈশব পর্যায়ে আসেই নি। বেশ ভারী উজ্জ্বল কিছু নক্ষত্র দ্রুত বিচরণ করে—তাই সৃষ্টির পর খুব তাড়াতাড়ি তাদের সব হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেছে। পরে মহাকর্ষীয় সংকোচনে তা ভেঙ্গে পড়েছে কয়েকটি অংশে। এই সব অংশই এখন শ্বেত বামন—সিরিয়াস সহচর তাদের অন্যতম।

সৌর জগতের গ্রহ সৃষ্টির রহস্যও যথেষ্ট অন্ধকারে আছে। কাণ্টের মতবাদ হল আদিতে সূর্যে যখন মহাকর্ষীয় সংকোচন চলছিল, তখন তার কেন্দ্রাতিগ বল সৌরদেহ থেকে বায়ুর বলয় বিচ্ছিন্ন করে দেয়—এসব বলয় থেকে গ্রহের সৃষ্টি। সূর্যের আবর্তন ও সংকোচন থেকে সৃষ্ট বায়ুর বলয় শনির বলয়ের মত খণ্ড খণ্ড বস্তু- না হয়ে ঘনীভূত গ্রহ হতে যাবে কেন—এ এক প্রশ্ন। তাছাড়া সৌর জগতের আবর্তনজনিত ভরবেগের শতকরা 98 ভাগই গ্রহগুলিতে আবদ্ধ, বাকী 2 ভাগ

পেয়েছে সূর্য। মূল নক্ষত্রের ভরবেগ এত কম অথচ তা থেকে উৎপন্ন গ্রহগুলির ভরবেগ এত বেশী হল কেন—এ প্রশ্নও অবান্তর নয়।

তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা সূর্য ও অন্য কোন নক্ষত্রের সংঘাতে গ্রহদের সৃষ্টি হয়েছে—আর বাইরের ভরবেগ তাদের মধ্যে বাঁধা পড়া বিচিত্র নয়। সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন (hit and run) মতবাদ নামে অভিহিত এই সিদ্ধান্ত বলে যে, একদা সূর্য একাই যখন মহাশূন্যে বিচরণশীল ছিল, তখন আর একটি নক্ষত্র তার কাছাকাছি এগিয়ে আসে। বহুদূর থেকে মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব উভয়ের পৃষ্ঠদেশে প্রচণ্ড ঢেউ তুলে উঁচু পাহাড়ের মত বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি করল। একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হলে এই উচ্চতা আর স্থায়ী হল না। তার বস্তুপিণ্ড দুই নক্ষত্রের কেন্দ্র বরাবর সরলরেখায় বহু অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সেই সব টুকরো তাদের জনয়িতা নক্ষত্র দুটির গতির কিছু অংশ লাভ করল। দূরে সরে যাওয়ার সময় নক্ষত্র দুটি এইসব টুকরো দিয়ে গড়া গ্রহজগৎ সঙ্গে নিয়ে গেল। আমাদের সূর্যের সঙ্গে যে নক্ষত্রের সংঘাত ঘটেছিল তা আজ কোটি কোটি বৎসরে কতদূরে সরে গেছে ঠিক নাই। কোন দূরবীণেই সেই ক্ষণিকের অতিথির চিহ্ন আজ আর ধরা পড়বে না।

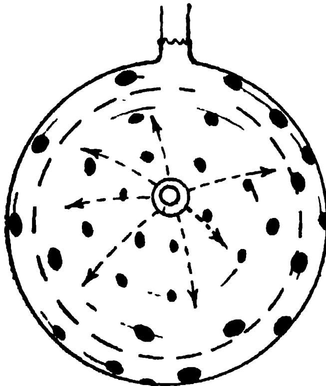
এরকম সংঘাত সচরাচর ঘটে না, তার কারণ নক্ষত্রগুলির ব্যবধান যথেষ্ট বেশী। কয়েক কোটি বছরে কয়েকটি নক্ষত্রের মধ্যে দু একজোড়া হয়ত এরকম সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়। আমাদের সৌরজগৎ সৃষ্টিই হয়ত এরকম সংঘাতের নিদর্শন। নতুবা আজও কেন নিকটতর কোন নক্ষত্রের কোন গ্রহজগৎ আমাদের দূরবীণে ধরা পড়েনি।

সৃষ্টির আদিতে বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যে দূরত্ব অল্প ছিল। স্ফীতিশীল ব্রহ্মাণ্ডে এই আপেক্ষিক দূরত্ব ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ায় সেরকম সংঘাত আর হয়ত সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আদি যুগে সে সম্ভাবনা নিশ্চয়ই কম ছিল না। তাই আমাদের অজানা কোন নক্ষত্রের গ্রহজগৎ থাকা বিচিত্র নয় তাছাড়া তৃতীয় একটি নক্ষত্রের সাহায্যে কোন কোন নক্ষত্র কাছের একটি নক্ষত্রকে স্থায়ীভাবে বেঁধে রেখে জুড়ি তারার (binary star) সৃষ্টি করেছে—গ্রহ জগৎ সৃষ্টির এই বিকল্প ঘটনা যে বিরল নয়, আকাশে অনেক জুড়ি তারার অস্তিত্ব তা প্রমাণ করে।

বিশ্বজগৎ ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। হাব্‌লের গণনায় নীহারিকার অপসরণের গতিবেগ এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল প্রতিপন্ন করেছে। কাছের নীহারিকা থেকে দূরের নীহারিকার এই গতিবেগ বরং বেশী। দুগুণ দূরত্বের নীহারিকার গতিবেগও হবে দ্বিগুণ—এই হল হাব্‌লের সূত্র। সেকেণ্ডে কয়েক শত মাইল থেকে দূরের নীহারিকার বেলায় তা সেকেণ্ডে দেড় লক্ষ মাইল পর্যন্ত দেখা গেছে।

শুধু আমাদের ছায়াপথ থেকেই যে অন্য সব নীহারিকা সরে যাচ্ছে তা নয়। পরস্পরের মধ্যে তাদের ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়ছে। গ্যামো একটি চমৎকার উদাহরণ

দিয়েছেন। একটি রাবারের বেলুনের পিঠে সমান দূরে দূরে বিন্দু আঁকা থাকলে, বেলুনে ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দুগুলির দূরত্ব বাড়বে। একটি বিন্দুতে যদি একটি পতঙ্গ বসে থাকে, তার মনে হবে যেন বিন্দুগুলি তার কাছ থেকেই শুধু দূরে সরে যাচ্ছে। আর সেই সব বিন্দুর গতিবেগ পতঙ্গ থেকে তাদের দূরত্বের সমানুপাতী হবে। হাব্‌লের মতে তাই সারা মহাকাশ স্ফীত হচ্ছে। 200 কোটি বছর পরে নক্ষত্র জগৎগুলির ব্যবধান দুগুণ বাড়বে। আর দু বিলিয়ন বছর আগে কি ছিল একই হিসেবে তা অনুমান করা যায়। এই হিসেবে ব্যবধান এত অল্প দাঁড়ায় যে, তখন নীহারিকাগুলি ছিল অখণ্ড—তাতে পুঞ্জীভূত নক্ষত্ররাজি সমভাবে বিন্যস্ত ছিল।



চিত্র 4.1 : স্ফীতিশীল বেলুনের মত বিশ্ব।

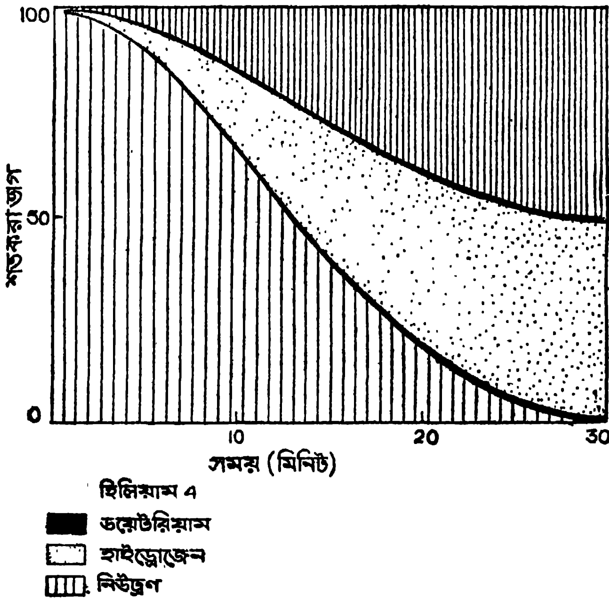
নক্ষত্র সৃষ্টির মত প্রক্রিয়ায় নক্ষত্রলোকেরও সৃষ্টি হয়েছে। শুধু এইটুকু তফাত যে, অণু দিয়ে গড়া বায়ু থেকে নক্ষত্রের সৃষ্টি, আর নক্ষত্র বিন্দু দিয়ে গড়া নাক্ষত্রিক বায়ু থেকে ছায়াপথগুলির সৃষ্টি। বিশ্ব যখন স্ফীত হতে আরম্ভ করেনি, তখন মহাকর্ষ ছিল তীব্রতর। সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রহ সৃষ্টির মত এই মহাকর্ষ তখন হয়ত নক্ষত্রগুলিকে কিছুটা কৌণিক ভরবেগ যোগান দিয়েছে ও নাক্ষত্রিক বায়বের বিচ্ছিন্ন বলয়কে কুণ্ডলিত নীহারিকার (spiral nebulae) রূপ দিয়েছে।

জীনৃসের মতে নক্ষত্র সৃষ্টির আগেই ছায়াপথের জন্ম। কিন্তু গ্যামো ও টেলর প্রমাণ করেছেন যে, ছায়াপথ সৃষ্টির সময় নক্ষত্রগুলির অস্তিত্ব ছিল। এই মতবাদে গণনায় ছায়াপথগুলির পরস্পর দূরত্ব ও আয়তন যা পাওয়া যায়, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল আছে।

পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় পদার্থ কবে সৃষ্টি হয়েছে? বিজ্ঞানীদের মতে নক্ষত্র ও ছায়াপথ যখন সৃষ্টি হয়নি, মহাকাশে বায়ুর ঘনত্ব ও তাপমাত্রা ছিল বেশী, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি মৌল তখনই সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এদের অর্ধজীবনকাল ও তুলনামূলক প্রাচুর্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অন্তত 200 কোটি বছর আগে তাদের সৃষ্টি। পরবর্তীকালে তেজস্ক্রিয় পদার্থের আয়ুষ্কালের সূক্ষ্ম পরিমাপ থেকে তাদের সৃষ্টি দেখা গেল প্রায় 500 কোটি বছর আগে। ছায়াপথের দূরতম যে বস্তুটি চোখে দেখা যায়, তার দূরত্ব প্রায় 900 কোটি আলোক বছর আর তার গতিবেগ আলোর প্রায় শতকরা 80 ভাগ। হাব্‌লের সূত্র অনুযায়ী কোন নীহারিকার

দূরত্ব 1100 কোটি আলোক বছর হলে, তার গতিবেগ আলোর সমান হবে। আইনস্টাইনের মতবাদ অনুযায়ী কোন বস্তুর গতিবেগ আলোর চেয়ে বেশী হতে পারে না। তা হলে কি এই দূরত্বের সীমায় বিশ্ব সীমাবদ্ধ ? তাছাড়া বিশ্বের স্ফীতির গতিবেগের হার থেকেও বর্তমান বিশ্বের দৃশ্য সীমানার সঙ্গে মিলিয়ে যদি কল্পনা করা যায় যে একদা বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল একটি cosmic egg বা মহাজাগতিক অণ্ড থেকে, তাহলে সৃষ্টির সেই আদিম লগ্নটি দাঁড়ায় 200 কোটি বছর আগে। তবে কি পৃথিবী তথা তার তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আরও তিনশো কোটি বছর আগে জন্ম নিয়েছে ? তা সম্ভব নয়। তবে বিশ্বের দৃশ্য সীমানা দু তিন গুণ বাড়িয়ে বিশ্বের সৃষ্টিক্ষণ 5 থেকে 6শো কোটি বছরে পিছিয়ে নেওয়া যায়। এবং এই সময়কাল এখন সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

ফ্রেড হয়েলের একটি সিদ্ধান্ত থেকে আবার কিছু গোলযোগ দেখা গেল। হাইড্রোজেন সংযোজনের নিউক্লীয় শক্তির একটি প্রক্রিয়ার প্রাধান্য থেকেও কোন



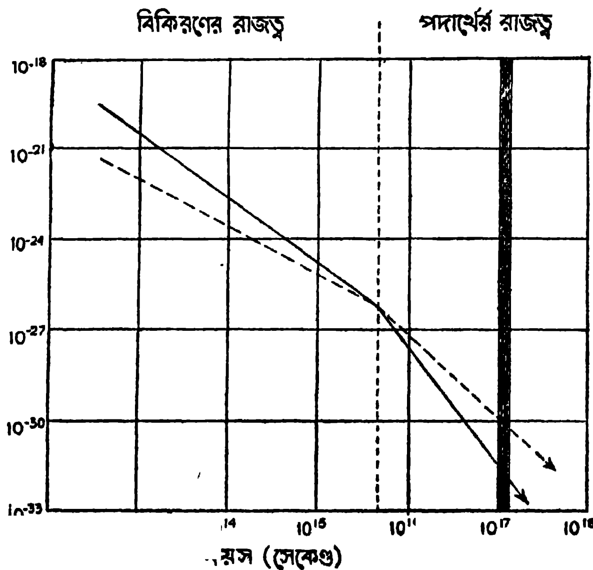
চিত্র 4.2 : গ্যামোর মতে সৃষ্টির 30 মিনিটের মধ্যে তাপকেন্দ্রীণ ক্রিয়ায় নিউট্রন প্রোটন সংযোজনে (fusion) ডয়েটরন এবং হিলিয়াম পরে ডয়েটরন থেকে ভারী পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে।

কোন নক্ষত্রে শক্তির এই উৎস প্রকট ধরে নিয়ে হয়েল দেখালেন যে তাদের বয়স 1000 থেকে 1500 কোটি বছর হওয়া বিচিত্র নয়। স্যাণ্ডেজ, জুইকি এঁরা তো

আরও বেশী বয়সের কথা বললেন। অবশ্য তা যদি ঠিক হয় তবে পৃথিবীর কম বয়স হয়ত সমীচীন হবে। কিন্তু এখনকার যে গতিবেগে বিশ্ব স্ফীত হচ্ছে তাতে 1500 কোটি বছরে স্ফীতির পরিমাণ আরও বেশী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক—কিন্তু তা তো দেখা যাচ্ছে না। সমস্যাটির সমাধান কিন্তু হল না।

মহাজাগতিক অণ্ডের মতবাদ হল বেলজিয়ান বিজ্ঞানী লেমাইটার-এর। তাঁর মতে এই অণ্ডের হঠাৎ বিস্ফোরণের ধাক্কায় কোটি কোটি বছর পরে আজও বিশ্ব স্ফীত হয়ে চলেছে।

গ্যামোর মতে এরকম বিস্ফোরণের আধ ঘণ্টার মধ্যে সব মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি। পরবর্তী প্রায় 25 কোটি বছর ধরে জড় পদার্থের উপর বিকিরণের ছিল

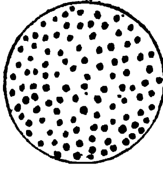
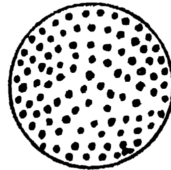
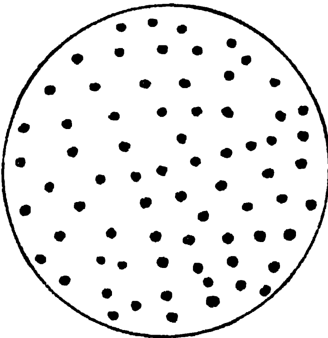
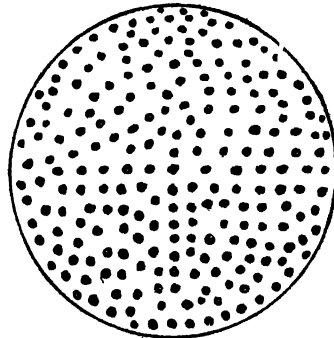


চিত্র 4.3 : বিবর্তনশীল (evolutionary) বিশ্বের ইতিহাসে বিকিরণ (কাল রেখা) ও পদার্থের (বিচ্ছিন্ন রেখা) আপেক্ষিক ঘনত্ব বিপরীতমুখী হতে পারে। সৃষ্টির 25 কোটি বৎসর পরে (বিচ্ছিন্ন রেখা) পদার্থের ঘনত্ব বিকিরণ থেকে বেড়েছে। কাল মোটা রেখাটি বর্তমান সময়।

একাধিপত্য—তাই সব জড় বস্তুই পাতলা আবরণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। পরে কোন এক সন্ধিক্ষণে জড় বস্তু পদার্থ হিসেবে ঘনীভূত হয়ে তৈরি করল ছায়াপথ। তাঁর মতে একদিন হয়ত সব ছায়াপথ শূন্যে বিলীন হয়ে গিয়ে আমাদের পৃথিবীকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে যাবে।

আগেই বলেছি মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনে পাতলা বায়ব আবরণ ঘনীভূত হয়ে

নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে এরকম ঘনীভবন থেকেই হয়ত মহাজাগতিক অণ্ডের জন্ম। পরে ঘটেছে তার বিস্ফোরণ। স্ফীতিশীলতার ফলে হয়ত আবার বিশ্বের বিলয় ঘটতে চলেছে। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা সৃষ্টি ও বিলয়ের মাঝামাঝি সময়ে আছি—যখন বিশ্বে সব কিছুই পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজ করছে। বিজ্ঞানী বোন্নর বলেন যে সৃষ্টি ও বিলয়ের এই বিবর্তন বার বার চলছে অনন্তকাল ধরে—এরকম একটি সৃষ্টি বিলয়ের আয়ু প্রায় 1000 কোটি বছর। স্যাণ্ডেজের মতে এই আয়ু

(ক) (খ)

চিত্র 4.4 : (ক) আবর্তনশীল বিশ্ব ; উপরে বিন্দুগুলি ছায়াপথ, নীচে কালক্রমে তাদের দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

(খ) স্থিতিশীল বিশ্ব ; উপরে বিন্দুগুলি ছায়াপথ, নীচে সময়ের ব্যবধানে নূতন ছায়াপথ সৃষ্টি হয়ে ঘনত্ব একই আছে।

8200 কোটি বছর হতে পারে। ফলে সৃষ্টি রহস্যের মূল তত্ত্ব দাঁড়াচ্ছে যে বিশ্ব বিবর্তনশীল (evolutionary)।

1948 খ্রীষ্টাব্দে বণ্ডি, গোল্ড ও হয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অন্য একটি মতবাদ খাড়া

করেন, তাতে বিশ্বকে বলা হয় স্থিতিশীল (steady state) অথবা অবিরাম সৃষ্টিশীল। এই মতবাদে স্ফীতিশীল বিশ্ব স্বীকার করা হয়। তবে যখন কোন ছায়াপথ আলোর গতিবেগ পেয়ে বিশ্ব থেকে হারিয়ে যায়, ঠিক তখনই অন্য একটি অনুরূপ ছায়াপথের সৃষ্টি হয়—ফলে বিশ্বের ঘনত্ব মোটামুটি একই থেকে যায়। তবে নতুন পদার্থ সৃষ্টির আভাস তো কই এতদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি। অবশ্য যে হারে নতুন ছায়াপথ সৃষ্টি হবে তাতে 100 কোটি মিটার বিশ্বের আয়তনে বছরে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হলেই যথেষ্ট। আমাদের যন্ত্রপাতি এরকম বিরল ঘটনা হয়ত ধরতে সক্ষম নয়। প্রশ্ন হল, ভর ও শক্তি তুল্যমূল্য ধরে নিয়ে এদের নিত্যতা বজায় রাখতে নতুন পদার্থ নিশ্চয়ই শক্তির বিনিময়ে সৃষ্টি হবে। অবিরাম সৃষ্টিশীল বিশ্বের প্রবক্তারা বলেন স্ফীতির গতিবেগের শক্তির কিছুটা পরিণত হবে নতুন পদার্থে। তাতে স্ফীতির গতিবেগ কিছুটা মন্দীভূত হবে মাত্র।

দুটি মতবাদের সমস্যা থেকে এখন যে সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে তাতে অবিরাম সৃষ্টির মতবাদ প্রায় নস্যাৎ হয়ে গেছে। বার বার সৃষ্টি ও বিলয়ের মধ্যে বিবর্তনশীল বিশ্বই এখন মোটামুটি স্বীকৃত। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পৌরাণিক মতবাদই বুঝি বিজ্ঞানীদের চোখে নতুন আঙ্গিকে ধরা পড়েছে।

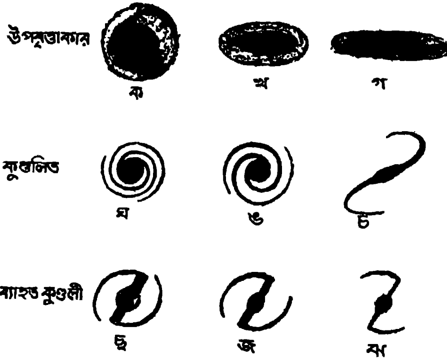
দ্বীপ জগৎ

নির্মল আকাশের দিকে তাকালে যে সাদা ছায়াপথ পার্থিব বিষুবরেখার মত আকাশকে দুভাগে ভাগ করেছে দেখা যায়, আমাদের সূর্য তারই একটি নক্ষত্র। আরও এরকম বহুকোটি নক্ষত্র এই ছায়াপথে আছে। হার্সেল আবিষ্কার করেন যে, মসূরী আকার (lenticular) এই ছায়াপথের সমতলে বেশী নক্ষত্রের ভীড় আর তার লম্বদিকের সমতলে তাদের সংখ্যা কম। কাপ্‌টিনের গণনায় ধরা পড়ে যে আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় 40 লক্ষ কোটি। যে ছায়াপথে এত নক্ষত্র দূরত্ব বাঁচিয়ে রয়েছে, তার আয়তন যে কত বড় তা বলা বাহুল্যমাত্র। মোটামুটি হিসেবে এর ব্যাস প্রায় একলক্ষ আলোক-বছর (5900 মিলিয়ন মাইল)। এক আলোক বছর হল এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার সমান। আমাদের সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোক বছর দূরে রয়েছে। স্যাগিটারিয়াস্ নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে ছায়াপথের কেন্দ্রে। পৃথিবী ও ছায়াপথের কেন্দ্রের মধ্যে ঠাণ্ডা কালো বায়ুমণ্ডল এমন জমাট বেঁধে আছে যে, পৃথিবী থেকে কেন্দ্রের চিত্র দূরবীণে ধরা পড়ে না।

বহুদিন ধরে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, নক্ষত্র স্থির ও গ্রহগুলিই বিচরণশীল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, নক্ষত্রের বেগ বরং গ্রহের চেয়েও বেশী। নক্ষত্রগুলির দূরত্ব বেশী বলেই তাদের অবস্থানের সামান্য কৌণিক পরিবর্তনও চোখে পড়ে। বিভিন্ন সময়ের নেওয়া ছবি থেকে কোন্ নক্ষত্রমণ্ডলী কখন কীভাবে থাকবে তা বলে দেওয়া যায়। একক নক্ষত্রদের গতি স্বাধীন ও কিছুটা অনিয়মিত হলেও নক্ষত্র-মণ্ডলী একযোগে স্থান পরিবর্তন করে। গ্রেটবিয়ার নক্ষত্রমণ্ডলীর ২ লক্ষ বছরের অবস্থান থেকে দেখা যায় তার পাঁচটি নক্ষত্র একদিকে ও অন্য দুটির গতি ভিন্নমুখী—তাই এই দুটিকে অন্যমণ্ডলীর নক্ষত্র মনে করা স্বাভাবিক।

নক্ষত্রের রৈখিক গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় 20 কিঃ মিঃ—কোন নক্ষত্রে এই বেগ কদাচিৎ 100 কিঃ মিঃ হতেও দেখা যায়। আমাদের সূর্য হারকিউলাস নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি বিন্দুর দিকে 19 কিঃ মিঃ বেগে ছুটে চলেছে। নক্ষত্র মধ্যবর্তী দূরত্ব এত বেশী যে, এরকম প্রচণ্ড গতিবেগ সত্ত্বেও দুটি নক্ষত্রের সংঘর্ষ প্রায় ঘটে না। 2 বিলিয়ন বছরে হয়ত এরকম কয়েকটিমাত্র সংঘর্ষ ঘটে থাকতে পারে। তাছাড়া আমাদের ছায়াপথ তার কেন্দ্রকে অক্ষ করে এক শতাব্দীতে প্রায় 7 কৌণিক সেকেণ্ড বেগে আবর্তন করে। এই সামান্য কৌণিকবেগ কিন্তু ছায়াপথের উপরিতলে সেকেণ্ডে যে কয়েকশত কিঃ মিঃ রৈখিকবেগের সৃষ্টি করে, তাতে মনে হয় ছায়াপথ নিজস্ব চ্যাপ্টা মসূরী আকার পেয়েছে।

নক্ষত্র ছাড়াও আমাদের ছায়াপথে আছে অসংখ্য নীহারিকা। দূরবীণে এদের কোন কোনটি গ্রহের মত দেখায়। তাই এদের গ্রহনীহারিকা (planetary nebulae) বলা হয়। এদের মধ্যে যারা আকারে বেশ বড় ও অনিয়মিত তাদের বলা হয় ছায়াপথ নীহারিকা। আমাদের ছায়াপথের বাইরেও আছে অসংখ্য নীহারিকা। এদের কোনটি কুণ্ডলিত, কোনটি বা উপবৃত্তাকার (চিত্র 4.5)। অতল মহাকাশ সমুদ্রে এরা যেন দ্বীপের মত ভাসছে—তাই মহাকাশকে বলা হয় দ্বীপ জগৎ (Island universe)। 4.5 চিত্রে নীহারিকার শ্রেণী বিভাগ দেখান হল।



চিত্র 4.5 : হাবল্-কৃত নীহারিকার শ্রেণীবিভাগ কোনটি উপবৃত্তাকার বা কুণ্ডলিত (spiral) আর কোনটিই বা ব্যাহত কুণ্ডলী (barred spiral)।

আমাদের কাছের নীহারিকাগুলিতে রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র। এসব নীহারিকার বর্ণালী সূর্যের মত। তাহলে তাদের তাপমাত্রা সূর্যের মতই হবে। নীহারিকাগুলি যদি অবিচ্ছিন্ন বস্তু হয় তবে এই তাপমাত্রায় বিকীর্ণ আলো তার পৃষ্ঠদেশের আয়তনের সমানুপাতী হওয়া উচিত। ফলে তাদের ঔজ্জ্বল্য সূর্যের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশী হবে। কিন্তু আমাদের নিকট প্রতিবেশী অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা সূর্যের চেয়ে মাত্র 1·7 লক্ষ কোটি গুণ বেশী উজ্জ্বল। তাহলে কি নীহারিকার বিকিরণ তার সারা পৃষ্ঠদেশ থেকে না এসে ভেতরের ছোট ছোট বিন্দু থেকে আসছে ? হ্যাঁ, এই বিন্দুগুলি সাধারণ নক্ষত্র—আর এসব নীহারিকা আসলে অন্য ছায়াপথ যেখানে অসংখ্য নক্ষত্র ভীড় করে আছে। হার্সেল প্রমাণ করেন যে, অ্যাণ্ড্রোমিডায় সাধারণ নক্ষত্র ছাড়াও কিছু নবতারা (novae) ও সেফেইড ভেরিএব্‌ল্ শ্রেণীর নক্ষত্রও আছে।

আমাদের ছায়াপথের দূরতম কিছু নক্ষত্র পুঞ্জের প্রায় চারগুণ দূরে 680000 আলোক-বছর পারে অ্যাণ্ড্রোমিডার অবস্থান। আমাদের ছায়াপথের ম্যাগলেনিক মেঘের মত অ্যাণ্ড্রোমিডার ও *M*32 এবং *NGC* 205 নামে দুটি উপগ্রহ নীহারিকা আছে। এদের ব্যাস যথাক্রমে 800 ও 1600 আলোক-বছর।

অ্যাণ্ড্রোমিডা ছাড়াও আমাদের ছায়াপথের দূরে ও কাছে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নীহারিকা—তাদের বিশাল দেহে আছে কোটি কোটি নক্ষত্র। সবচেয়ে দূরের যে নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে তার দূরত্ব প্রায় 100 মিলিয়ন আলোক-বছর।

গ্যামোর ভাষায় বলা যায় যে এসব নীহারিকার আলো পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেই শতকরা 99·9 ভাগ দূরত্ব অতিক্রম করেছিল আর বাকী 0·1 ভাগ অতিক্রম করেছে মানুষের সৃষ্টির পর। মনে হয় এটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে দূরবীণে ধরা পড়েছে কয়েক হাজার পুরুষের ব্যবধানে। এখনকার নীহারিকার আলো যেদিন তার চিত্র নিয়ে পৃথিবীতে হাজির হ'বে—তখন পৃথিবীর কী রূপান্তর ঘটে থাকবে তা কল্পনা করা যায় না।

বাইরের ছায়াপথ নীহারিকাগুলি আমাদের ছায়াপথের মতই নিজ অক্ষে আবর্তন করে। অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা কয়েক শ' বছরে একবার এই আবর্তন পূর্ণ করে। তার কৌণিক গতিবেগ আমাদের ছায়াপথের সমান। এই আবর্তন থেকে এসব ছায়াপথ উপবৃত্ত আকার পেয়েছে। জীন্সের মতে ছায়াপথের দ্রুত আবর্তনে তার বিষুবরেখার সমতল থেকে যে বস্তুপিণ্ড বেরিয়ে আসে, তা থেকেই তাদের কুণ্ডলিত বলয়ের জন্ম।

খালি চোখে আমরা 6000 এর কিছু বেশী নক্ষত্র দেখতে পাই। কাপ্‌টিনের হিসেব মত আমাদের ছায়াপথে প্রায় 40 লক্ষ কোটি নক্ষত্র আছে—অন্য ছায়াপথের নক্ষত্রের সঠিক সংখ্যা আমাদের ধারণার বাইরে। হাজার হাজার আলোক-বছর দূরে এসব নক্ষত্রের তথ্য পাওয়া কঠিন হলেও বিজ্ঞানীদের গবেষণায় অনেক তথ্যই ধরা পড়েছে।

নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা

সূর্য আমাদের খুব কাছে রয়েছে বলে তার পৃষ্ঠদেশে একক আয়তনের বিকিরণের পরিমাণ থেকে পৃষ্ঠের মোট তাপমাত্রা সহজেই মাপা যায়। কিন্তু অন্যান্য নক্ষত্র দূরে রয়েছে বলে এভাবে তাদের তাপমাত্রা মাপা যায় না। তাই পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করতে হয়। কম উত্তাপে পদার্থ থেকে লাল রং-এর বিকিরণ হয়—ক্রমশঃ তাপ বাড়লে পরপর হলুদ, শ্বেতাভ ও শেষে নীলাভ রং-এর বিকিরণ দেখা যায়। বর্ণালীর লাল থেকে ভায়োলেটের দিকে তাই তাপমাত্রা বৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। আরও সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা জানতে হলে নক্ষত্র বর্ণালী খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হয়। নক্ষত্রের আলোর কিছু অংশ নাক্ষত্রিক বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয় বলে বর্ণালীতে কালো ফ্রনহফার রেখা (Fraunhofer's Line) দেখা যায়। শোষণের এই ক্ষমতা বস্তুর তাপমাত্রার উপরই নির্ভর করে—তাই বিভিন্ন নক্ষত্রে কালোরেখার তারতম্য দেখা যায়। এই তারতম্য ও তাদের তীব্রতা থেকে নক্ষত্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার আপেক্ষিক পরিমাপ সম্ভব হয়েছে।

হার্ভার্ড বর্ণালী শ্রেণী: বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালী দশভাগে ভাগ করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই বর্ণালীগুলিকে হার্ভার্ড বর্ণালী শ্রেণী নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজী দশটি বর্ণমালা দিয়ে এদের নামকরণ—*O B A F G K M R N S*। আমাদের সূর্য থেকে *G* শ্রেণীর বর্ণালী পাওয়া যায়। সাইরাস্ ও ফ্রুগার 60*B* নক্ষত্র যথাক্রমে *A* ও *M* বর্ণালী শ্রেণীর অন্তর্গত। কোন কোন নক্ষত্রের বর্ণালী দুটি বর্ণালী শ্রেণীর মাঝে পড়লে, দশমিক চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন A_2 *A* ও *F*-এর দুই দশমাংশে পড়ে; $K_5 - K$ ও *M*-এর পাঁচ দশমাংশে পড়ে। এই বর্ণালী শ্রেণীর সঙ্গে নক্ষত্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা দেখান হল:

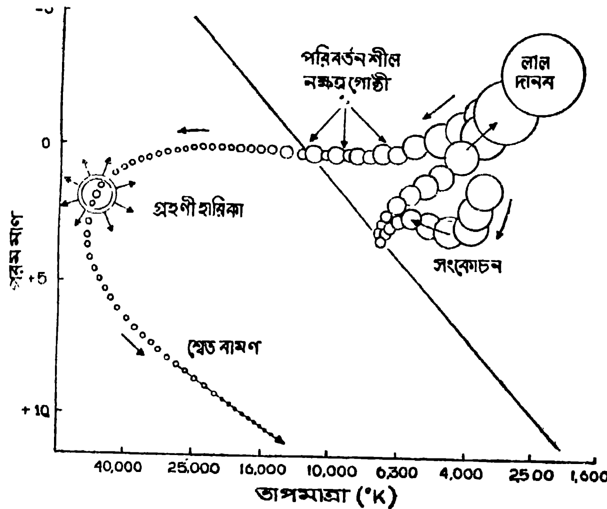
B_0	20000°C
	10000°C



G	6000°*C*
K	5100°*C*
M	3400°*C*

উপরের তালিকা সূর্যের মত সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রের পক্ষে প্রযোজ্য। 0 শ্রেণীর নক্ষত্রের তাপমাত্রা 20000°*C* থেকে 100000°*C* পর্যন্ত আর *R*, *N* বর্ণালী 3000°*C* চেয়েও কম। সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা থেকে আমরা তাদের আয়তন তুলনা করতে পারি। এই হিসাবে সূর্যের ব্যাসকে এক ধরলে সাইরাস, ওয়াইসিগ্‌নী, ক্রুগার 60 বি নক্ষত্রগুলির ব্যাস হবে যথাক্রমে 1·8, 5·9 ও 30·5।

রাসেলের চিত্র ঃ রাসেল বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালী শ্রেণী, বর্ণ-ঔজ্জ্বল্য ও

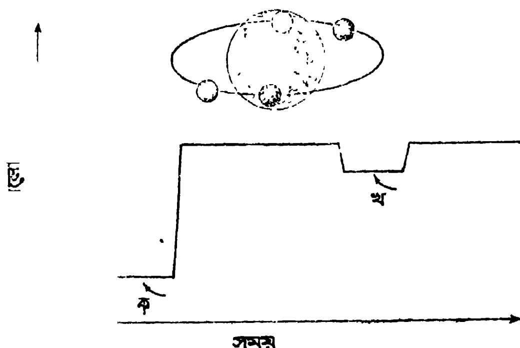


চিত্র 4.6 : রাসেলের চিত্র : তাপমাত্রার সঙ্গে নক্ষত্রের পরমমান (absolute magnitude)। কাল সরলরেখায় সূর্যের মত সাধারণ পর্যায়ের (main sequence) নক্ষত্রের ভীড়। এই রেখার তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা ক্ষীণ লাল বামন ও অন্যপ্রান্তে উজ্জ্বল উত্তপ্ত নীলদানবদের অস্তিত্ব আছে (চিত্রে দেখানো নাই)। রেখার বাইরে দেখানো হয়েছে লালদানব, সেফেইড (cepheid) শ্রেণীর পরিবর্তনশীল বিকিরণের নক্ষত্রগোষ্ঠী, গ্রহনীহারিকা, শ্বেতবামন প্রভৃতি নক্ষত্রশ্রেণী।

পরমমান এবং ব্যাস এসব ধরে নিয়ে একটি লেখচিত্র আঁকেন। এই চিত্রে দেখা যায় নীচের ডানদিক থেকে উপরের বাঁদিক পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট সারিতে যে নক্ষত্রগুলি ভীড় করে আছে, ভরের পার্থক্য থাকলেও তাদের নিকট-সম্বন্ধ আছে। নীচের ঠাণ্ডা ক্ষীণ লাল বামন থেকে উপরের উজ্জ্বল নীলদানব পর্যন্ত মাঝখানে আমাদের সূর্যকে নিয়ে যে নক্ষত্রগোষ্ঠী তা সাধারণ পর্যায়ের (main sequence) অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্র ছাড়া উপরের ডানদিকের কোণে নক্ষত্রগুলি আয়তনে এত বৃহৎ যে, এদের পৃষ্ঠতাপমাত্রা কম হলেও ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশী। এদের নাম দেওয়া হয়েছে লাল দানব; ক্যাপেলা, ব্যাটেলগো প্রভৃতি নক্ষত্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 4.6 চিত্রে নীচে বাঁদিকের কোণের নক্ষত্রগুলি শ্বেত বামন। এদের আয়তন ছোট বলে তাপমাত্রা বেশী হওয়া সত্ত্বেও ঔজ্জ্বল্য কম। নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের মাঝামাঝি হল পরমমান। নক্ষত্রগুলি বিভিন্ন দূরত্বে আছে বলে তাদের সঠিক ঔজ্জ্বল্য আমরা সমান ভাবে দেখতে পাই না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে নক্ষত্রগুলির ঔজ্জ্বল্য তুলনা করা যায়। দশ পার্সেক বা প্রায় তিন আলোক-বছর দূরে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যকে পরমমান (absolute magnitude) বলা হয়। ভেগা নক্ষত্রের পরমমান 0·6। নীচের তালিকায় সূর্যের আপেক্ষিক মানে সাধারণ পর্যায়ের অন্যান্য কয়েকটি নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য, ব্যাস ও ভর দেখান হল।

নক্ষত্র	ঔজ্জ্বল্য	ব্যাস	ভর
সাইরাস এ	24	1·50	2·35
প্রোকাইঅন্‌এ	6·5	1·80	1·48
আল্‌ফা সেণ্টাউরী এ	1·14	1·07	1·10
সূর্য	1·00	1·00	1·00
আলফা সেণ্টাউরী বি	0·32	1·22	0·89
ক্রুগার 60 এ	0·0015	0·20	0·27
ক্রুগার 60 বি	0·0004	0·12	0·14



রা ঃ (ক) ও (খ) যথাক্রমে বড় উজ্জ্বল ও ছোট অনুজ্জ্বল জুড়ির পরস্পরের গ্রহণকালে তাদের আলোর তীব্রতার সর্বোচ্চ হ্রাস।

নক্ষত্রের বর্ণ সাধারণ চোখে দেখা যায় না। রাসেলের চিত্রে নক্ষত্রের বর্ণ, বর্ণালী-বৈশিষ্ট্য ও তাপমাত্রার সামঞ্জস্য পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। তাপমাত্রার

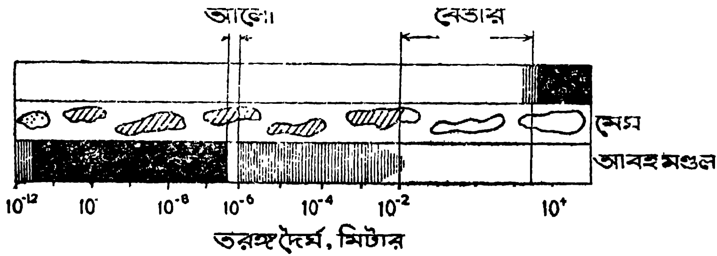
তুলনামূলক মাপে, বড় নক্ষত্রের বেলায় ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাস মাপা যায়। সমান ব্যাসবিশিষ্ট নক্ষত্রগুলির ওপর রেখা টেনে সূর্যের অনুপাতে আয়তন ও বিভিন্ন নক্ষত্রের ব্যাস ও বৃত্তগুলির তুলনা করে আয়তনের তারতম্য আমরা এই চিত্রে দেখতে পাই।

জুড়ি তারার প্রত্যেকটির আপেক্ষিক গতি দিয়ে তাদের আবর্তনকাল মেপে তাদের ভর জানা যায়। এডিংটনের মতে নক্ষত্রের ভর বেশী হলে তার ঔজ্জ্বল্যও বাড়বে। ওয়াইসিগ্‌নী নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে 17 গুণ ভারী অথচ 30000 গুণ বেশী উজ্জ্বল। সাইরাসএ সূর্যের চেয়ে 2·4 গুণ ভারী অথচ মাত্র 24 গুণ উজ্জ্বল। এদিকে ক্রুগার 60 বি সূর্যের চেয়ে 0·0004 গুণ উজ্জ্বল হয়েও সূর্য থেকে দশগুণ হাল্কা। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ভরের সঙ্গে ঔজ্জ্বল্য সমান তালে পা ফেলে চলে না। ফলে ভারী নক্ষত্রগুলিতে হাল্কা নক্ষত্রের চেয়ে প্রতি গ্র্যাম বস্তুতে বেশী পরিমাণ শক্তি বিকিরণ হয়। কেন্দ্রের তাপমাত্রায় পার্থক্য ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভেদে বিকিরণের হারে পার্থক্য ঘটে।

নক্ষত্র	ভর	কেন্দ্রের ঘনত্ব	কেন্দ্রেব তাপমাত্রা ° সেঃ	শক্তি বিকিরণের হার $\frac{\text{আর্গ}}{\text{গ্র্যাম} \times \text{সেকেণ্ড}}$
ক্রুগার 60 বি	0.1	140	14×10^6	0·01
সূর্য	1·00	75	29×10^6	2
সাইরাস	2·4	41	25×10^6	30
ওয়াইসিগ্‌নী	10 0	6·5	32×10^6	3600

আলো বিকিরণের ভিত্তিতে সূর্য ও নক্ষত্র জগতের চিত্র কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। আলো ছাড়াও জ্যোতিষ্কের অন্যান্য অদৃশ্য বিকিরণ মিলিয়ে তবেই নক্ষত্র জগতের স্বরূপ জানা সম্ভব।

1894 খ্রীষ্টাব্দে স্যার অলিভার লজ অনুমান করেন যে সূর্য থেকে অদৃশ্য তরঙ্গের বিকিরণ হওয়া সম্ভব। এই অনুমান সত্য হলেও সব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সূর্য থেকে পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারে না। সূর্যের বেতার বিকিরণ মাঝের আয়নস্তরে প্রতিফলিত হয়ে উপরের আকাশে ফিরে যায়। আয়নস্তর দিয়ে শুধু এক সেঃ মিঃ থেকে 10^3 সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। 4.8 চিত্রে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বায়ুমণ্ডল কতটা ভেদ করে আসতে পারে তা দেখান



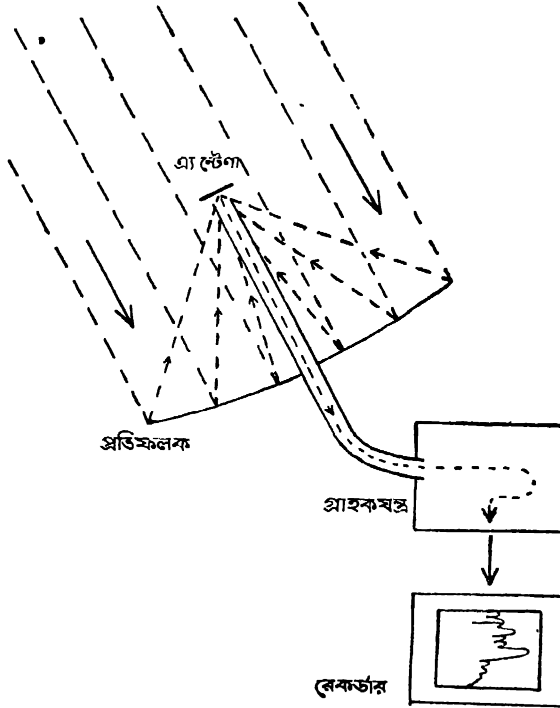
চিত্র 4.8 : বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণে আবহমণ্ডলের ভেদ্যতা। কালো অংশ দুর্ভেদ্য ও সাদা অংশের ভেদ্যতা আছে। বাকী অংশগুলি আংশিক ভেদ্য।

হয়েছে। সূর্যের বিভিন্ন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করে ও কৃষ্ণদেহ বর্ণালীর বিকিরণের সঙ্গে তুলনা করে সূর্যের পরম তাপমাত্রা ধরা হয় 6000K। কিন্তু বেতার দূরবীণে সূর্য থেকে যেসব বেতার তরঙ্গ পাওয়া যায়, তাতে সূর্যের তাপমাত্রা 18000K বা বেশী হওয়া উচিত। সূর্যের কোরোনার অবশ্য এত বেশী তাপমাত্রা হওয়া সম্ভব—এই কোরোনা থেকে বেতার তরঙ্গ বিকিরণ হওয়া বিচিত্র হয়।

4.9 চিত্রে সাধারণ ও বেতার দুরবীণের তুলনামূলক চিত্র দেখান হল। বেতার দূরবীণে অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকে বেতার তরঙ্গ অক্ষবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে বেতার গ্রাহকযন্ত্রে ধরা হয়—এই ব্যবস্থাকে বেতার দূরবীণ (Radio Telescope) বলা হয়।

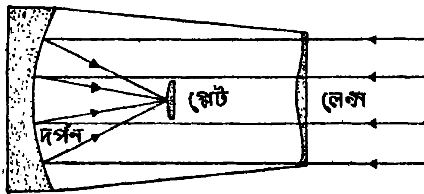
সাধারণ দূরবীণে সূর্য একটি থালার মত দেখায়, তার প্রত্যন্ত দেশ হল ফোটোস্ফিয়ার। এই স্তরের উপর প্রায় স্বচ্ছ কয়েক হাজার মাইল উচ্চ ক্রোমোস্ফিয়ার রয়েছে। এই স্তরে রয়েছে প্রায় সব মৌলিক পদার্থ। তার উপরের আবরণ হল কোরোনা—যার ঘনত্ব কম, কিন্তু উচ্চতা কয়েক হাজার মাইল। সূর্যপৃষ্ঠের অন্ধকার অঞ্চল হল সৌরকলঙ্ক—এদের ব্যাস কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার মাইল হতে

পারে। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা পরিবর্তনশীল—এতে রয়েছে বিপুল চৌম্বকক্ষেত্র—যার মান 2000 গাউস বা তার বেশী এবং বিস্তৃতি লক্ষ লক্ষ মাইল। সৌরকলঙ্ক থেকে



চিত্র 4.9 : (ক) বেতার দূরবীণের কার্যপ্রণালী।

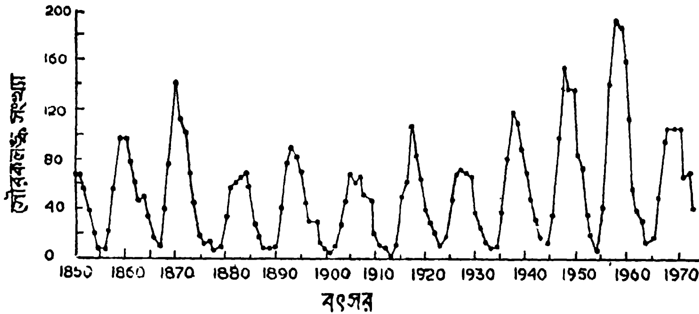
তীব্র বেতার তরঙ্গের বিকিরণ হয়। পৃথিবীতে যখনই সৌরকলঙ্ক বেশী দেখা যায় তখনই সেই সঙ্গে বেতার বিকিরণের তীব্রতাও বাড়ে। সৌরকলঙ্কের আয়তনের



চিত্র 4.9 (খ) : আলোকীয় দূরবীণের কার্যপ্রণালী।

ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে বেতার তরঙ্গের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। দিনের বেলায় সৌরকলঙ্কের বেতার তরঙ্গের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও সূর্যাস্তের পর আর বেতার তরঙ্গ

ধরা পড়ে না। সৌরকলঙ্কের অবস্থান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও বেতার তরঙ্গের হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। সূর্যের মধ্যরেখায় থাকার সময় সৌরকলঙ্ক থেকে বেতার বিকিরণ তীব্রতম হয়।



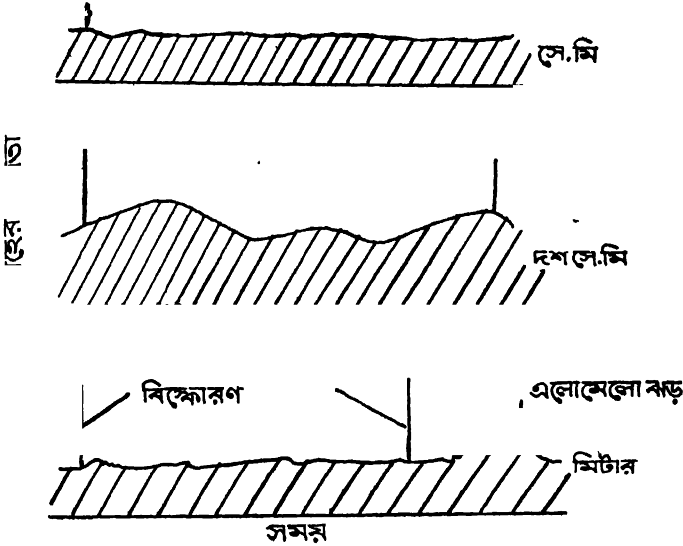
চিত্র 4.10 : সৌরকলঙ্কের 1850-1970 খ্রীষ্টাব্দের পর্যায়ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধি।

সৌরকলঙ্কের আশেপাশে সাধারণত ক্রোমোস্ফিয়ারে যে বিস্ফোরণ দেখা যায়, তাকে সৌরশিখা (solar flare) বলে। বছরে এরকম তিন চারটি সৌরশিখা দেখা যায়। এই শিখার তীব্রতা যেমন হঠাৎ বাড়ে তেমনি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তীব্রতম অবস্থায় সৌরশিখা অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরণ করে এবং পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে বিপর্যয় (magnetic crochet) ঘটায়। এ সময় পৃথিবীর বেতার প্রেরকযন্ত্র বেতার তরঙ্গ পাঠাতে পারে না। আবার ঐ অবস্থায় সৌরশিখা থেকে বেতার বিকিরণ হয় তীব্র ও তড়িৎকণার বিচ্ছুরণ ঘটে। ঐ তড়িৎকণাগুলি সেকেণ্ডে প্রায় 1600 কিঃ মিঃ বেগে 26 ঘণ্টা পরে পৃথিবীতে পৌঁছয়। আসার পথে আয়নস্তরে প্রতিহত হলে পার্থিব চুম্বকক্ষেত্রের বিপর্যয় ঘটে। এ থেকেই অরোরা বোরিয়ালিসের উৎপত্তি।

শুধু দিনের বেলায় পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে থাকে—তাই মনে হয় তড়িৎকণার সমষ্টি আয়নস্তর ও সৌরবিকিরণের অতিবেগুনী অংশের প্রভাবে যেভাবে পরিবর্তিত হয় তাতেই চুম্বকীয় বিপর্যয় ঘটে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সহজে আয়নস্তর ভেদ করে পৃথিবী থেকে 70—90 কিঃ মিঃ উপরে একটি স্তরে তার নিজস্ব আয়নন ক্ষমতায় একটি দ্বিতীয় আয়নস্তর উৎপাদন করে। এই আয়নস্তর কিন্তু বেতারতরঙ্গ প্রতিফলনে সাহায্য করে না বরং শোষণ করে নেয়। তাই পৃথিবী থেকে বেতার প্রেরণে ব্যাঘাত ঘটে।

সূর্যের সাধারণ বেতার বিকিরণ থেকে সৌরশিখার ঐ বিকিরণ প্রায় 1000 গুণ

বেশী। ঐ শিখার বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে যে চুম্বকীয় বিপর্যয় ঘটে তা সাময়িক। ঐ শিখার আবির্ভাবের 26 ঘণ্টা পরে যখন তড়িৎ কণাগুলি পৃথিবীতে এসে পড়ে, তখন পার্থিব চুম্বকক্ষেত্রের যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে তা 24 ঘণ্টা এমনকি



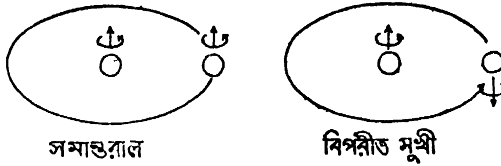
চিত্র 4.11 : সেন্টিমিটার, দশসেন্টিমিটার ও একমিটার পর্যায়ের তিনটি দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গের সময়-ভেদে বিকিরণের তীব্রতা। মৃদু পরিবর্তনশীল বেতার প্রবাহে কখনও দেখা যায় বিস্ফোরণ অথবা এলোমেলো ঝড়।

সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। এই পরিবর্তন চুম্বকঝটিকা (magnetic storm) নামে অভিহিত হয়। তখনই মেরু অঞ্চলের অরোরা দেখা যায়।

সৌরকলঙ্ক ও সৌরশিখা ছাড়াও সূর্যের গড় বেতার বিকিরণের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। তবে তা কখনও শূন্য মানে পৌঁছয় না। 4.11 চিত্রে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার বিকিরণ সময়ের অনুপাতে দেখানো হল। এতে মধ্যে মধ্যে বিস্ফোরণ এবং এলোমেলো ঝড়ও ধরা পড়েছে।

সূর্য থেকে সব দৈর্ঘ্যের বেতারতরঙ্গ পাওয়া গেলেও ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলিই সাধারণত কোরোনা ভেদ করে আসতে পারে। কোন্ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ কোরোনার কোন্ অংশ থেকে বেরোবে, তা সেই অংশের তাপমাত্রা ও ইলেকট্রনের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। তাই কোরোনাই সূর্যের বেতার তরঙ্গের উৎস মনে করা হয়। এই বিকিরণ থেকে কোরোনার তাপমাত্রা অনুমান করা হয় 10^6 K। সৌরশিখা বা কলঙ্ক থেকে কেন এত তীব্র বেতার বিকিরণ ঘটে, তার কারণ এখনও জানা যায়নি।

আমাদের সূর্যের মত কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে যে ছায়াপথ, তার আলো চোখে দেখা যায়, কিন্তু ঐ সঙ্গে যে অদৃশ্য বেতার তরঙ্গ পৃথিবীতে ধরা পড়ে, তার খুঁটিনাটি পরীক্ষা থেকে নক্ষত্র জগতের অনেক তথ্য জানা যায়। জ্যোতিষ্কের আলোর কিছুটা রেখাবর্ণালীতে ও বাকীটুকু অবিরাম বর্ণালীতে বিকিরণ হয়। কিন্তু বেতার বিকিরণের সবটুকুই অবিরাম। কেবল 21·1 সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের হাইড্রোজেন পরমাণুর



চিত্র 4.12 : হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রন দুইয়ের হয় সমান্তরাল অথবা বিপরীত স্পিন থাকে। এই দুটি অবস্থার পার্থক্য 21·1 সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের বিকিরণ পৃথিবীর পরীক্ষাগারে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম হলেও মহাকাশে এই বিকিরণ বিরল নয়।

বেতার রেখাবর্ণালীর বিকিরণ হয়। আমাদের ছায়াপথ ও বাইরের ছায়াপথে যে হাইড্রোজেন রয়েছে এই রেখাবর্ণালীই তার নিদর্শন। ছায়াপথের কোন কোন অংশে বেতারবিকিরণ এত তীব্র যে, সেইসব অংশে বেতার নক্ষত্রের অস্তিত্ব আছে অনুমান করা যায়। তাছাড়া সূর্যের চেয়ে বিশ্বের বেতার বিকিরণ প্রায় 10000 গুণ তীব্র। আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র কালো মেঘের অন্ধকারে ঢাকা বলে, অদৃশ্য বেতার তরঙ্গের বিকিরণই ঐ অঞ্চলের খুঁটিনাটি সংবাদ দিতে পারে।

সূর্যের বেতার বিকিরণ যেমন মাঝে মাঝে তীব্র হয়, তেমনি আমাদের ছায়াপথের কতকগুলি শিখা নক্ষত্র (flare star) থেকেও বেতার বা আলোর বিকিরণ বেড়ে উঠে।

বিশ্বের যে বেতার উৎসটি প্রথমে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, তা একটি অতিনবতারার (supernovae) ধ্বংসাবশেষ ক্র্যাব্‌নেবুলা। এই নীহারিকার সিনক্রোট্রন বিকিরণ থেকে তীব্র আলো ও বেতার তরঙ্গ পাওয়া যায়। চুম্বকক্ষেত্রে উচ্চশক্তির ইলেকট্রনের গতি থেকে ইলেকট্রনত্বরণ যন্ত্র সিনক্রোট্রনে এরকম বিকিরণ পাওয়া যায়। কেপলার ও টাইকোব্রাহী জ্যোতিষ্কগুলি ও বেতার উৎস—তাছাড়া ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে ধাবিত দ্রুতগতি আয়নিত বায়ুপুঞ্জ থেকেও তীব্র বেতার বিকিরণ পাওয়া যায়। 1950 খ্রীষ্টাব্দে জর্ডেল ব্যাঙ্কএর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে,

এ্যাণ্ড্রোমেডার কুণ্ডলীনীহারিকা থেকে আমাদের ছায়াপথের সমান তীব্রতার বেতার তরঙ্গের বিকিরণ ঘটে। সাধারণ ছায়াপথের বেতার বিকিরণের শক্তি $10^{27}-10^{29}$ কিলোওয়াট—আর দুরের সব ছায়াপথ থেকে প্রায় $10^{31}-10^{35}$ কিলোওয়াট শক্তির বেতার বিকিরণ পাওয়া যায়। অতি নবতারার ধ্বংসাবশেষ থেকে আসে প্রায় 10^{26} কিলোওয়াট্।

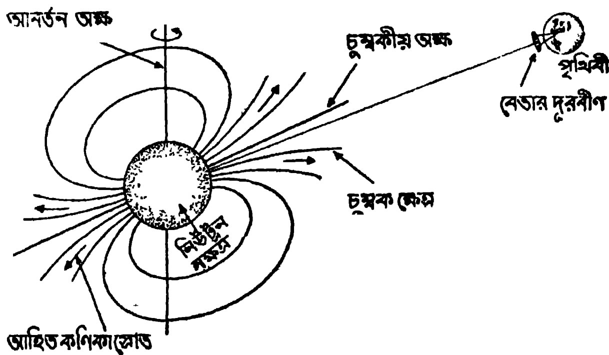
বেতার ছায়াপথগুলির কেন্দ্রাঞ্চলের ব্যাস প্রায় কম বেশী এক লক্ষ আলোক বছরের মত। এই অঞ্চলে যেন অসংখ্য নক্ষত্রের মেলা। এই অঞ্চলের দুপাশে প্রায় 10 গুণ বৃহদাকার দুটি অঞ্চল থেকে প্রধানত বেতার বিকিরণ ঘটে। সাধারণত আলোর উৎস অঞ্চলগুলি যথেষ্ট উত্তপ্ত। অনেকগুলি ছায়াপথের বেতার বিকিরণের শক্তি আলো থেকেও শক্তিশালী। তাহলে কি এইসব ছায়াপথ অতিনবতারার মত কোন বিস্ফোরণ থেকে জন্মেছে? তা যদি হয় তবে এরকম বিস্ফোরণ অন্তত 10 লক্ষ বছর আগে ঘটেছিল। কারণ তা নাহলে বেতার বিকিরণকারী পদার্থগুলি তাদের দ্রুতবেগ সত্ত্বেও এই সময়ের আগে ছায়াপথের বেতার উৎস তার প্রান্তদেশে পৌঁছুতে পারে না। আজকের উৎপাদিত বেতার শক্তির নিরিখে এইসব ছায়াপথ দশলক্ষ বছর ধরে প্রায় 10^{45} কিলোওয়াট-ঘণ্টা বেতার বিকিরণ করেছে। বেতার ছাড়া অন্য সব বিকিরণ ধরলে এদের উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় 10^{47} কিলোওয়াট ঘণ্টা। এই শক্তি 100 কোটি সূর্যের মত জোরালো। এরকম বিপুল শক্তির উৎস কোন্ বিস্ফোরণের ফলে উৎপাদিত হতে পারে—এই বিস্মিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

1967 খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ মহিলা বিজ্ঞানী জোসিলিন বেল্ ভেগা ও আল্টেয়ার নক্ষত্রের মাঝামাঝি জায়গা থেকে মাইক্রোওয়েভের নিয়মিত স্পন্দন পান—স্পন্দনগুলি 1·33 সেকেণ্ড অন্তর নিয়মিত ধরা যায় ও স্থায়িত্ব $\frac{1}{30}$ সেকেণ্ড। হিউইস্ এসব নক্ষত্রের নাম দেন পালসার বা স্পন্দমান নক্ষত্র। এখন প্রায় 100টি এরকম নক্ষত্র পাওয়া গেছে—যাদের মধ্যে আমাদের নিকটতম পালসার রয়েছে 300 আলোক-বছর দুরে। এদের পর্যায়কাল ·033099 সেকেণ্ড থেকে 16 মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। এধরনের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ কোন নক্ষত্র থেকে সম্ভব যদি সেই নক্ষত্রে মহাকর্ষশক্তি শ্বেত বামন থেকেও তীব্র হয়। অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী গোল্ড এদের নামকরণ করেন নিউট্রন নক্ষত্র। নিউট্রন নক্ষত্রে মহাকর্ষ এত তীব্র যে, 4 সেকেণ্ড বা তার কম সময়ে নিজের অক্ষে ঘূর্ণনের ফলেও তার দেহ ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায় না। সাধারণ নক্ষত্রের চেয়ে এদের চুম্বকক্ষেত্র যথেষ্ট শক্তিশালী। ঘূর্ণনের সঙ্গে নিউট্রন নক্ষত্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলেক্ট্রন বেরিয়ে এসে তার চুম্বক ক্ষেত্রের দুটি মেরু দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। মেরু দুটির ঘূর্ণন নেই—তাদের কাজ হল 1 সেকেণ্ড বা

কম সময় অন্তর অন্তর নক্ষত্রের ঘূর্ণনশীল নিজস্ব মেরু থেকে ইলেকট্রনের ঝাঁকগুলি কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া। তখন এই ইলেক্ট্রনগুলি নক্ষত্রের চুম্বকক্ষেত্রে শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই শক্তিই মাইক্রোওয়েভ আকারে পৃথিবীতে ধরা পড়ে। এর ফলে নক্ষত্রটির ঘূর্ণন বেগ কমে আসে। ক্র্যাবনেবুলার নিউট্রন নক্ষত্র তার উদাহরণ। এর বয়স এখনও হাজার বছর নয়—কিন্তু তার ঘূর্ণন সেকেণ্ডে 1000 থেকে 30-এ নেমে এসেছে। *CP*1919 নিউট্রন নক্ষত্রটির 16000000 বছর পরে পর্যায়কাল দ্বিগুণ হবে এরকম অনুমান করা হয়। 1969 খ্রীষ্টাব্দে Vela *X*−1 নিউট্রন নক্ষত্রটির পর্যায়কালের হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। হয়ত এই নক্ষত্রে ভূমিকম্পের মত কোন বিপর্যয় ঘটে থাকবে নতুবা তার আয়তনের হঠাৎ সঙ্কোচন ঘটেছে—সঠিক কারণ এখনই বলা শক্ত। বেতার তরঙ্গ ছাড়া নিউট্রন নক্ষত্র থেকে আলো, অদৃশ্য এক্সরশ্মিও বিকিরণ হয়। এক্সরশ্মি দিয়ে নিউট্রন নক্ষত্রের গবেষণা অনেক সহজ হয়েছে।

কোয়াসার

নিউট্রন নক্ষত্রের চেয়ে আরও বিস্ময়কর হল কোয়াসার (Quasar)। কোয়াসার তত্ত্ব নিয়ে আগেই কিছু আলোচনা করেছি। কোয়াসার তীব্র বেতার উৎস—কিন্তু সত্যিকারের নক্ষত্র কিনা তাতে সন্দেহ আছে, এদের আধা-নক্ষত্র (Quasi-star)



চিত্র 4.13 : নিউট্রন নক্ষত্র : স্পন্দমান (pulsar) নক্ষত্র হল ঘূর্ণনশীল তীব্রচুম্বক ক্ষেত্রযুক্ত নিউট্রন নক্ষত্র। তার দুটিমেরু বাইরে ইলেকট্রন ছড়িয়ে দেয়; চুম্বকক্ষেত্রে যখন সেইসব ইলেকট্রনের শক্তি হ্রাস পায়, তখন সেই হ্রাসপ্রাপ্ত বিকিরণ স্পন্দন পৃথিবীতে ধরা পড়ে, তাই মনে হয় নক্ষত্রটি স্পন্দমান।

বলা হয়। এদের কৌণিক ব্যাস একই দূরত্বের ছায়াপথের মাত্র 0·2 গুণ। অথচ ছায়াপথের চেয়ে 100 গুণ শক্তিশালী প্রায় 10^{34} কিলোওয়াটের বেতার বিকিরণ

কোয়াসার থেকে পাওয়া যায়। আলোর পরিমাণও কম নয় প্রায় 10^{36} কিলো-ওয়াটের মত। কোন কোন কোয়াসারে কয়েক বছর অন্তর আলোর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ছায়াপথের আলো বিকিরণে এরকম পরিবর্তন ঘটে না। আলোর এরকম হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে তার উৎস বেশী বড় হলে চলে না—তাতে উৎসের বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে না। ছায়াপথের বিশাল দেহে এরকম পরিবর্তন তাই দেখা যায় না। কিন্তু কোয়াসারের এরকম হ্রাসবৃদ্ধি থেকে অনুমান করা যায় তার আলোর উৎসের বিস্তৃতি হয়ত কয়েক আলোক বছর মাত্র।

বিশ্বজগতের বিকিরণে লাল অপসরণ (red shift) একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দূর ছায়াপথের বর্ণালীতে আলোর রেখা লালের দিকেই বেশী। ডপলার অপসরণ (Doppler shift) থেকে এরকম ঘটে। সংক্ষেপে ডপলার এফেক্ট হল যদি স্থির কোন উৎসের বিকিরণ কম্পাংক ν হয় ও উৎসটি পর্যবেক্ষকের সঙ্গে v আপেক্ষিক গতিতে চলতে থাকে, তবে তা পর্যবেক্ষকের দিকে এলে ν কম্পাঙ্ক $\nu\,(1+\frac{v}{c})$ কম্পাঙ্কে বেড়ে যাবে। উল্টোদিকে গেলে ν কম্পাঙ্ক কমে $\nu\,(1-\frac{v}{c})$ তে দাঁড়াবে। একজন স্থির পর্যবেক্ষক চলন্ত ট্রেনের বাঁশীর কম্পাঙ্কে এরকম পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারেন।

ছায়াপথগুলি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—তাই তার বিকিরণ কম্পাঙ্ক কমে গিয়ে ডপলার এফেক্ট অনুযায়ী দৃশ্য আলোর বেলায় লাল আলোর দিকে সরে আসবে। অদৃশ্য বিকিরণের বেলায়ও এ নিয়ম খাটে।

1963 খ্রীষ্টাব্দে স্মিট্ 3C 273 কোয়াসারের 21·1 সেঃ মিঃ হাইড্রোজেন বর্ণালীর কম্পাঙ্কে যে হ্রাস লক্ষ্য করেন তাতে প্রমাণিত হয় কোয়াসারটি আলোর 0·16 বেগে দুরে সরে যাচ্ছে ও পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় 150 কোটি আলোক বছর। সেরকম 3C48 কোয়াসার আলোর 0·3 বেগে দুরে সরে যাচ্ছে ও তার দূরত্ব 330 কোটি আলোক বছর।

3C273 কোয়াসারের এমন দুটি অঞ্চল খুঁজে পাওয়া গেছে যা তার আলোর উৎসকেন্দ্রের প্রায় 150000 আলোক বছর দূরে থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরণ বা সংকোচন যে কোন প্রক্রিয়াই এই বিকিরণের উৎস হোক্ না কেন—এই বিকিরণ অন্ততঃ 150000 বছর ধরে উৎসারিত হচ্ছে। এর অর্থ হল যেন একটি বেতার ছায়াপথের মোট বিকিরণ এই সব ছোট জ্যোতিষ্ক থেকে পাওয়া যাচ্ছে। সূর্যের কেন্দ্রের চেয়ে এসব জ্যোতিষ্কের কেন্দ্র অন্ততঃ দশ লক্ষ গুণ বেশ ভারী হলে তবেই এত শক্তি বিকিরণ সম্ভব।

1975 খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়াকাস ও লিলার 3C279 কোয়াসারটি আবিষ্কার করেন। এর ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ সূর্যের প্রায় 40 গুণ বেশী। সূর্যের ঔজ্জ্বল্য পূর্ণচন্দ্রের 525000 ও সাইরাস নক্ষত্রের চেয়ে 15×10^9 গুণ বেশী। তুলনায় কোয়াসারটি কী পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে তা সহজেই অনুমেয়। এর ঔজ্জ্বল্য আবার বেড়ে চলেছে। এক সময় তা সূর্যের 10^{14} গুণ বা একটি অতিনবতারার 60000 গুণ বেশী হওয়াও বিচিত্র নয়। এমনকি আমাদের ছায়াপথের চেয়ে হাজার গুণ উজ্জ্বলতায় কোয়াসারটি একদিন জ্বলে উঠতে পারে। এরকম উজ্জ্বলতার তুলনা সারা বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যদিও বিশ্বসম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।

কোয়াসারের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ

ক. কোয়াসার দেখতে নক্ষত্রের মত ;

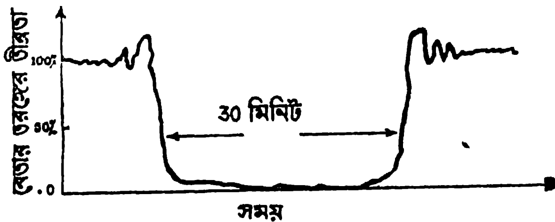
খ. তাদের রঙ নীলাভ ;

গ. কতকগুলি কোয়াসার তীব্র বেতার বিকিরণের উৎস ;

ঘ. কোয়াসারের লাল অপসরণ ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য ;

ঙ. কতকগুলি কোয়াসারের দ্রুত বেতার ও আলোকীয় বিকিরণের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

3C273 কোয়াসার যে ছোট জ্যোতিষ্ক তার দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া গেছে 1962 খ্রীস্টাব্দের পরীক্ষায়। অস্ট্রেলিয়া থেকে ওই বছর 3C273 তিনবার চাঁদে ঢাকা পড়ে। আকারে বড় হলে ঢাকা পড়ার আরম্ভ থেকেই 3C273 এর বেতার বিকিরণ ক্রমশঃ হ্রাস হওয়ার কথা। না, একেবারে তা না হয়ে বেতার বিকিরণ সম্পূর্ণ বন্ধ হল



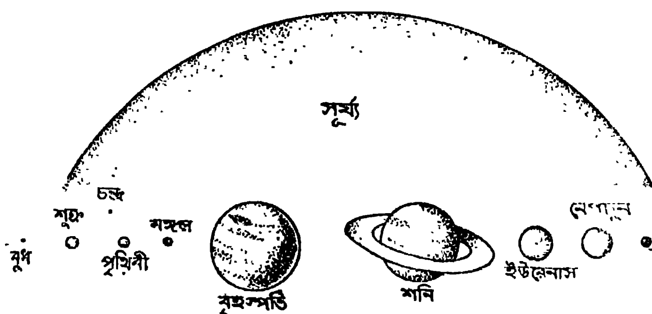
চিত্র 4.14 : কোয়াসার 3C273 চাঁদে ঢাকা পড়ার আগে ও পরে। দুদিকে অববর্তনজনিত বর্ণালীতে বেতার তরঙ্গের মৃদু হ্রাসবৃদ্ধি থেকে মনে হয় জ্যোতিষ্কটির প্রান্তদেশ তীক্ষ্ণ ও তীব্রতার হঠাৎ হ্রাস থেকে তার আয়তন অনুমান করা হয় ক্ষুদ্রাকার।

আধ ঘণ্টার জন্য, যতক্ষণ না 3C273 চাঁদের পিছন থেকে আবার উঁকি দিল। তাছাড়া কোয়াসারটির কিনারা যে তীক্ষ্ণ তার প্রমাণও পাওয়া গেল ঢাকা পড়ার আগে ও পরে অববর্তন বর্ণালীর বিন্যাস থেকে (চিত্র 4.14)।

আগেই বলেছি $3C273$-এর লাল অপসরণ বেগ আলোর 0·16 অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় 30000 মাইল। পরে জানা গেছে $3C48$-এর লাল অপসরণ বেগ সেকেণ্ডে প্রায় 70000 মাইল, 1964 খ্রীষ্টাব্দে এর চেয়েও বেশী আলোর শতকরা 80 ভাগ পর্যন্ত অপসরণ- বেগের কোয়াসার পাওয়া গেছে। এমনকি 1971 খ্রীষ্টাব্দে $4C05{\cdot}34$ কোয়াসারের লাল অপসরণ বেগ পাওয়া গেল আলোর শতকরা 88 ভাগ। এও শেষ নয়। 1973-এ OH 471-এর লাল অপসরণ বেগ পাওয়া গেল আলোর শতকরা $90\frac{1}{2}$ ভাগ আর OQ 172 এর শতকরা 91 ভাগ অর্থাৎ সেকেণ্ডে 170000 মাইল। এই মান এখন সর্বোচ্চ। তবে আলোর শতকরা 95 ভাগ বেগের কোয়াসার থাকা বিচিত্র নয়, হয়ত তাদের রঙ নীলাভ নয় বলে কোয়াসার বলে গণ্য করা হয়নি। সর্বদিক থেকে বিবেচনা করলে কোয়াসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধর্ম এখনও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যাবৃত।

সূর্য ও গ্রহজগৎ

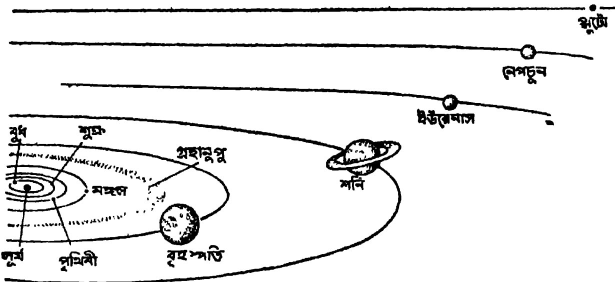
ছেলেবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি সূর্যের গ্রহ নয়টি। এক থেকে দশ সংখ্যাগুলি শেখাতে আজও গ্রামের পাঠশালায় নয়ে নবগ্রহ শেখানো হয়। এই নয়টি হল সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। আসলে রাহু ও কেতু কোন গ্রহই নয়, আসলে দুটি অয়নবিন্দু। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে অন্য সাতটি গ্রহের ধারণা বর্তমান ছিল। 1543 খ্রীষ্টাব্দে কোপার্নিকাস দেখান যে সূর্য একটি নক্ষত্র ও তার গ্রহ পাঁচটি—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—



চিত্র 4.15 : সূর্য ও গ্রহজগৎ : আপেক্ষিক আয়তন।

তাছাড়া পৃথিবীও অনুরূপ একটি গ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। 1610 খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলেও বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। ঐ শতকে শনির পাঁচটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ফলে চন্দ্রকে নিয়ে সৌরজগতের উপগ্রহ সংখ্যা দাঁড়ায় দশে।

1781 খ্রীষ্টাব্দে 13 মার্চ হার্সেল আর একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন, তার নাম দেওয়া হল ইউরেনাস। এই গ্রহটি শনির চেয়ে উজ্জ্বলতায় 270 গুণ কম—খালি-চোখে কোন রকমে ধরা পড়ে। হার্সেলের দুরবীণ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল বলেই গ্রহটি ধরা পড়ে। এই গ্রহের আবিষ্কারের ফলে আমাদের সৌরজগতের ব্যাস 2850×10^6 কিলোমিটারে অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ বাড়ল। গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াল সাতে।



চিত্র 4.16 : গ্রহদের কক্ষের আপেক্ষিক আয়তন। ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর কক্ষপথ চিত্রের বাইরে বিস্তৃত।

1787 খ্রীষ্টাব্দে হার্সেল ইউরেনাসের দুটি উপগ্রহ টিটানিয়া ও ওবেরন আবিষ্কার করেন। 1789তে শনির আরও দুটি উপগ্রহও তাঁর আবিষ্কার। এসব মিলে উপগ্রহ সংখ্যা দাঁড়ায় 14।

বিপত্তি দেখা গেল ইউরেনাসের কক্ষপথে অবস্থান নিয়ে। নিউটনের বিপরীত বর্গ নিয়মটি যেন ইউরেনাসের বেলায় খাটে না। বিপরীত বর্গ নিয়মে দুটি বস্তুর মাঝে মহাকর্ষ বল দূরত্বের বর্গ অনুযায়ী বিপরীত অনুপাতে কমে যায়। অবশ্য এই নিয়ম দুটি বস্তুর বেলায় খাটে। দুটি বস্তুর বেলায় এই নিয়ম যতটা সঠিক, তিন বা অনেক বস্তুর মধ্যে তা খুব কাজের নয়। অথচ অন্য কোন নিয়মও পাওয়া যায় না। গ্রহ নক্ষত্র জগতে বিপুল বস্তুর সমাবেশে একটির উপর বহু বস্তুর বল ক্রিয়া করে, কিন্তু দুটি কাছাকাছি বস্তুর গতিবিধি অন্য বস্তুকে নগণ্য ধরে নিয়ে নিউটনীয় নিয়মে সঠিক ব্যাখ্যা করা যায়। পরে অবশ্য অন্য বস্তুগুলির বল আলাদা আলাদা বিবেচনা করা যায়। এভাবে সৌরজগতের সব গ্রহ উপগ্রহের অবস্থান বিপরীত বর্গ নিয়মের সঙ্গে মিলে যায়। তবে ইউরেনাসের বেলায় অন্যথা কেন? ইউরেনাসের অবস্থান বিপরীত বর্গ নিয়মে যেখানে হওয়া উচিত তা থেকে প্রায় দুমিনিটের কৌণিক পার্থক্য থেকে যায়। এর কাছাকাছি গ্রহ বৃহস্পতি ও শনির প্রভাবে ইউরেনাসের অবস্থানের বিচলন ঘটতে পারে—তবে তাতেও এই পার্থক্য

ব্যাখ্যা করা যায় না। কেউ কেউ নিউটনের বর্গ-অনুপাতী নিয়মের উপরও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এইসব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে 1821 খ্রীষ্টাব্দে ক্যাম্ব্রিজের ছাত্র অ্যাডাম্‌স্ গণনায় দেখালেন যে, আমাদের সৌরজগতে আর একটি গ্রহ থাকলে ইউরেনাসের এই বিচলন ব্যাখ্যা করা যাবে। এই অজানা গ্রহটি থাকবে সূর্য থেকে ইউরেনাসের দ্বিগুণ দূরত্বে, ইউরেনাসের কক্ষের একই সমতলে ও বৃত্তীয় কক্ষপথে সূর্যকে অবর্তন করবে। অ্যাডাম্‌স্ তাঁর গণনার বিবরণ ক্যাম্ব্রিজে মানমন্দিরের অধ্যক্ষ চাল্লিশ-এর কাছে পাঠালেন। চাল্লিশ কিছুটা বিরক্ত হয়ে সুপারিশ সহ বিষয়টি রয়েল এস্ট্রোনমার এয়ারির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এয়ারি খুব সুবিধের লোক ছিলেন না। তাঁর কাছে বিষয়টি হেলাফেলার মধ্যে রইল। ইতিমধ্যে এক তরুণ ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী লেভেরিয়ের একই রকম গণনা এয়ারির কাছে পাঠিয়ে দুরবীণের সাহায্যে গ্রহটি ধরা যায় কিনা দেখতে অনুরোধ করেন। তিনিও অ্যাডাম্‌সের মতই আচরণ পেলেন। তখন লেভেরিয়ের বার্লিন মানমন্দিরের সাহায্য নেন। সেখানে গ্যেলে ও দ্য আরেস্ট 1846 খ্রীষ্টাব্দে 23 সেপ্টেম্বর এই নতুন গ্রহটি আবিষ্কার করেন। দূরবীণে গ্রহটি সবুজ রঙে ধরা দিয়েছিল তাই লেভেরিয়ের রোমানদের সবুজ সাগরের দেবতা নেপচুনের নামে গ্রহটির নামকরণ করেন। অ্যাডাম্‌সের গণনা যে নির্ভুল ছিল তাও প্রমাণিত হল। তবে সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব ইউরেনাসের দ্বিগুণ না হয়ে দেড়গুণের মত দাঁড়াল—এই যা পার্থক্য।

1930 খ্রীষ্টাব্দের 13 মার্চ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টমবাগ্ সৌর জগতের পরবর্তী নবম গ্রহের আবিষ্কার করেন। সূর্যের দূরতম এই গ্রহ মহাকাশের অতল অন্ধকারে রয়েছে তাই পাতাল দেবতা প্লুটোর নামানুসারে তার নামকরণ হয়। 248 বছরে এই গ্রহটি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে উপবৃত্তপথে। এর আয়তন পৃথিবীর $\frac{1}{10}$ থেকে $\frac{1}{40}$ হতে পারে। এর উপবৃত্ত কক্ষের দুই কেন্দ্রবিন্দু যথাক্রমে সূর্য থেকে 74×10^8 ও 44×10^8 কিলোমিটার দূরে। ক্ষীণতম এই গ্রহের তাপমাত্রা এত কম যে, তাতে মিথেন গ্যাস্ হিমে জমে থাকে।

আমাদের সৌরজগতে আরও গ্রহ থাকা বিচিত্র নয়। শেষের তিনটি গ্রহের আবিষ্কার থেকে দেখা যায় যে আলোকীয় দুরবীণের দিন এখনও ফুরোয়নি। আধুনিক কম্প্যুটারের সাহায্যে মহাকাশের বাধা এড়িয়ে ক্ষীণতম আলোও ধরা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে অজানা আরও গ্রহবলয় বা গ্রহ আবিষ্কার অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, 1977 খৃষ্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ব্যাঙ্গালোর গবেষণাগারে ইউরেনাসের একটি বলয় আবিষ্কার করেছেন।

ভয়েজারের তথ্য

ভয়েজার 1 ও 2 দুটি মহাকাশ যান 1977 খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে মহাকাশে পাঠান হয়। ভয়েজার 1, 1979 খ্রীষ্টাব্দের মার্চে বৃহস্পতির কাছাকাছি এসে যে সব রঙীন আলোকচিত্র পাঠিয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, বৃহস্পতির অন্ততঃ 14টি উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতিকে ঘিরে রয়েছে প্রায় 30 কিলোমিটার পুরু একটি বলয় যার পরিধি হ'বে প্রায় 57000 কিলোমিটার। বৃহস্পতির তৃতীয় বড় উপগ্রহ আইও (*IO*)র যে ছবি পাওয়া গেছে, তার পৃষ্ঠদেশ মনে হ'চ্ছে মসৃণ। তা থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সংঘর্ষজনিত ক্রেটারের চিহ্ন না থাকায় এর পৃষ্ঠদেশ নবীন বলেই মনে হয়। এর পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রায় 160 কিলোমিটার উচ্চতার কঠিন পদার্থের বিস্ফোরণ অনবরত ঘটছে—বিশ্বের কোথাও অনুরূপ ঘটনার নিদর্শন নেই। ক্যালিস্টো (Callisto) হল বৃহস্পতির সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রহ কিন্তু আমাদের চন্দ্রের চেয়েও উজ্জ্বল। বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ ক্ষুদে লাল অ্যামালথিয়া (Amalthea)—তার আয়তন 130—170 কিলোমিটার। পৃথিবীর 12 ঘণ্টায় সে বৃহস্পতিকে একবার ঘুরে আসে। তার অনিয়ত আকার থেকে অনুমান করা হ'চ্ছে যে বার বার সংঘাতে ক্রেটার তৈরি হয়ে তার দেহের অনেক অংশ ক্ষয় পেয়েছে। 1980 নভেম্বরে ভয়েজার I শনির কাছাকাছি এসে পড়েছিল, পরে নেপচুন ও ইউরেনাসের খবর পাঠিয়ে এখন সৌরজগতের বাইরে পাড়ি দিয়েছে।

ভয়েজার 2, 1981 খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে শনির কাছে এসে পড়ে। তার দেওয়া খবর থেকে জানা যাচ্ছে শনির আবহমণ্ডল হল হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের আবরণ—তার আকাশে সোনালী মেঘ ঘণ্টায় 1600 কিলোমিটার গতিতে বাতাসে চলাফেরা করে। অন্ততঃ 17টি উপগ্রহ নিয়ে শনির সংসার—তাদের কেউ কেউ আবার শনির বলয়ে জড়িয়ে আছে। একটি উপগ্রহ হাইপেরিঅন (Hyperion) লম্বায় 210 কিলোমিটার ও চওড়ায় 360 কিলোমিটার, আকারে চ্যাপ্টা আর এক উপগ্রহ ইয়াপেটাস (Iapetus) অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কাল। এর শতকরা 20 ভাগ শিলায় বাকীটুকু বরফে গড়া।

শনি থেকে দূরত্ব অনুযায়ী *C*, *B* ও *A* এই তিনটি বলয় পৃথিবী থেকে দূরবীণে পৃথক তিনটি বলয় মনে হয়। ভয়েজারের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে যে 80000 কিলোমিটার ব্যাপ্ত এই সব বলয় বরফ ও শিলায় গড়া হাজারেরও বেশী কণ্ঠহারের সমষ্টির মত। এই হারগুলি যেন গ্রামোফোনের রেকর্ডের খাঁজের মত। এছাড়া আর ও চারটি বলয় দেখা যাচ্ছে। আবিষ্কার কালের ক্রম অনুযায়ী ইংরাজী বর্ণমালা

ক্রমিক ব্যবহার করা হয় বলে চতুর্থ বলয় *D*, কিন্তু শনির সবচেয়ে কাছে, *A* থেকে ক্রমশঃ দূরে *F*, *G* ও *E*। Voyager *I*, *G* বলয়টি আবিষ্কার করেছিল এবং এও লক্ষ্য করেছিল যে *F* বলয়ের সঙ্গে যেন তিনটি জড়বস্তুর মালা জড়াজড়ি হয়ে আছে।

বলয়গুলির কোনটি গভীর নীল রঙের, কোনটি বা সোনালী কিংবা হলদে। তাদের কোন কোনটিতে ফুলে ওঠা বা ভাঁজের চিহ্নও আছে।

সবচেয়ে মজার খবর হল শনি থেকে যে তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ হচ্ছে তা শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করলে দেখা যায় যে সেই শব্দ, যেন নিয়মিত ঘণ্টাধ্বনি, তাতে মিশে আছে গুন্ গুন্ বা কিচির মিচির শব্দ যেন পাখীর কলকাকলী ও পার্থিব কোন সঙ্গীতের মূর্ছনা।

ভয়েজার প্রকল্পে প্রথম যান ছিল পাইওনীয়ার 1। দ্বিতীয় হল ভয়েজার 1, দুটিই এখন সৌরজগৎ ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। ভয়েজার 2 এখন শনিগ্রহ-কে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। ইউরেনাসের কাছে পৌঁছবে 1986 খ্রীষ্টাব্দে ও 1989 খ্রীষ্টাব্দে নেপচুনের কাছে পৌঁছে গ্রহ জগতের তথ্য দেওয়া শেষ করবে—তারপর এই যানটিও পাড়ি দেবে সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে।

আমাদের সৌর জগতের অন্য গ্রহগুলি আলোর সম্পদে যথেষ্ট উজ্জ্বল। মহাকাশ গবেষণায় বিভিন্ন যান পাঠিয়ে এসব গ্রহ সম্পর্কে বহু তথ্যই পাওয়া গেছে। বেতার বিকিরণ দিয়েও আমাদের সৌর জগতের কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে চাঁদ সম্পর্কে পরীক্ষা করাও সম্ভব হয়েছে।

আমাদের সৌরজগতের চাঁদ ও গ্রহগুলির বেতার বিকিরণ থেকে উৎসস্থলের তাপমাত্রা জানা যায়। খুব নির্ভুল না হলেও যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে চাঁদের একটি তাপ অপরিবাহী এক ইঞ্চির মত ধূলিস্তর আবরণ আছে; মঙ্গলের তাপমাত্রা 220 থেকে 260*K* ও বৃহস্পতির 130 থেকে 140*K*। অবশ্য বেতার বিকিরণ-এর হিসেবে বৃহস্পতির তাপমাত্রা 600*K* দাঁড়ায় আবার লাল উজানী রশ্মি থেকে এই পরিমাণ হয় 240*K*। এ পার্থক্য কেন তা জানা যায়নি। বৃহস্পতির বিভিন্ন সময়ের হঠাৎ বেতার বিস্ফোরণও ধরা পড়েছে। বৃহস্পতির নিজস্ব চুম্বক-ক্ষেত্র ও বিকিরণ বলয় আছে। শক্তিশালী ইলেকট্রন চুম্বকক্ষেত্রে ত্বরণ লাভ করে বিকিরণ বলয়ে আটকে পড়ে ও বিকিরণের উৎস হয়ে উঠে: বুধ ও শনি থেকেও বেতার বিকিরণ পাওয়া যায়।

রাডার

বিশ্বের যে স্বাভাবিক বেতার বিকিরণ আমরা পৃথিবীতে বেতার দূরবীণে পর্যবেক্ষণ করি, তার ফলাফল থেকে অনেক খুঁটিনাটি খবর পাওয়া যায়। এসব

বিকিরণ যথেষ্ট ক্ষীণ ও পরিবর্তনশীল। তাই রাডার (Radar) পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে পৃথিবীতে শক্তিশালী হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ উৎপাদন করে পাঠান হয়, তা জ্যোতিষ্কের উপর প্রতিফলিত হয়ে যে সব তথ্য নিয়ে ফিরে আসে তাতে জ্যোতিষ্কের প্রকৃতি সহজেই ধরা পড়ে। উল্কা সম্পর্কীয় গবেষণায় রাডার অপরিহার্য। তাছাড়া চাঁদ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহ সম্পর্কে রাডার অনেক তথ্যই দিতে পারে। রাডারের সাহায্যে পৃথিবী ও সূর্যের গড় দূরত্ব জানা যায়—149598 ± 700 কিলোমিটার। অন্য পদ্ধতির চেয়ে রাডার নির্ভুল খবর নিয়ে আসে। শুক্রের আবহমণ্ডলে রয়েছে পুরু আবরণ, তাই তার পৃষ্ঠদেশে কোন বস্তুর স্থায়ী অবস্থান ধরা যায় না এমনকি শুক্রের আবর্তনের ধরন কীরকম তাও ধরা পড়ে না। রাডার পদ্ধতিতে জানা গেছে যে শুক্রের নিজ অক্ষে আবর্তন ও সূর্যের চারদিকের আবর্তনের পর্যায়কাল প্রায় এক রকম—কিন্তু দুটি আবর্তন বিপরীতমুখী।

38 মেগা সাইকল্‌স্/সেকেণ্ড কম্পাঙ্কের তরঙ্গ পাঠিয়ে সূর্যের কোরোনার বাইরের দিকের গতিবেগ ও গড় নিজস্ব গতিবেগ মাপা হয়েছে—তা যথাক্রমে সেকেণ্ডে দশ ও পঁয়ত্রিশ মাইল।

দিনে ও রাতে রাডারের সাহায্যে উল্কার প্রকৃতি, আয়তন ও তার পুচ্ছে কণিকার গতিবেগের বিন্যাস নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ উল্কা পৃথিবীর উপরের 60 মাইলের উঁচু কোন স্তরে পুড়ে ছাই হয়—এতথ্যও রাডারের সাহায্য জানা যায়। মোটের উপর রাডার উল্কা সম্পর্কীয় পদার্থতত্ত্বকে (meteor physics) এক নতুন আকার ও বিস্তৃতি দিয়ে উন্নত করেছে।

আধুনিক কালে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদির সাহায্যে বিশ্বজগতের বেতার বিকিরণ গবেষণা অনেক উন্নত হয়েছে।

রকেটে বেতার প্রেরক যন্ত্র পাঠিয়ে আয়নস্তরের ইলেকট্রনবিন্যাস নির্ভুলভাবে মাপা যায়। এসব পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে সূর্য ও চন্দ্রের জন্য পৃথিবীর আয়ন স্তরেও জোয়ার ভাঁটা হয়। জোয়ারের প্রভাবে আয়নগুলি পরিবাহী পদার্থের মত কাজ করে। পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে তার আবর্তনের দিক একটি নির্দিষ্ট কোণে ছেদ করে। ফলে ডায়নামো ক্রিয়ায় যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তা পৃথিবীর চুম্বক ঝটিকার উৎস। রকেটের সাহায্যে জানা গেছে যে, সৌরশিখার এক্সরশ্মি নীচের বায়ুস্তরে এমন একটি নতুন আয়ন স্তরের সৃষ্টি করে—যা পৃথিবীর বেতার তরঙ্গ শোষণ করে নেয়।

অ্যারিয়াল 1 কৃত্রিম উপগ্রহ একদিন খবর পাঠাল যে, সূর্য 4·7 থেকে 13·8$\AA$ দৈর্ঘ্যের এক্সরশ্মি বিকিরণ করছে। সৌরশিখার বাড়া ও কমার সঙ্গে এই রশ্মিও বাড়ে কমে। এই এক্সরশ্মির জন্য পৃথিবীর ওপরে যে একটি নতুন আয়নস্তর গড়ে উঠে ও ফলে পৃথিবী থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ যোগাযোগ বিঘ্নিত হয় সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় এক্সরশ্মি বিকিরণ গবেষণা একটি নতুন অধ্যায়। পৃথিবীতে নক্ষত্রজগতের আলো ও বেতার বিকিরণ নিয়ে এতদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা চলছিল। কারণ আবহমণ্ডল ভেদ করে এরা পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে। কিন্তু এক্সরশ্মি আবহমণ্ডলে শোষিত হয় বলে এতদিন ধরা পড়েনি। রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ আবহমণ্ডলের উপরে থেকে এক্সরশ্মি ধরার পথ সুগম করে দিয়েছে।

1962 খ্রীষ্টাব্দে একটি অ্যারোবী রকেট মহাকাশে এক্সরশ্মির অস্তিত্ব সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য নিয়ে আসে। তারপর আরও কয়েকটি রকেট পাঠিয়ে এসম্পর্কে বিশদ গবেষণা চালান হয়েছে।

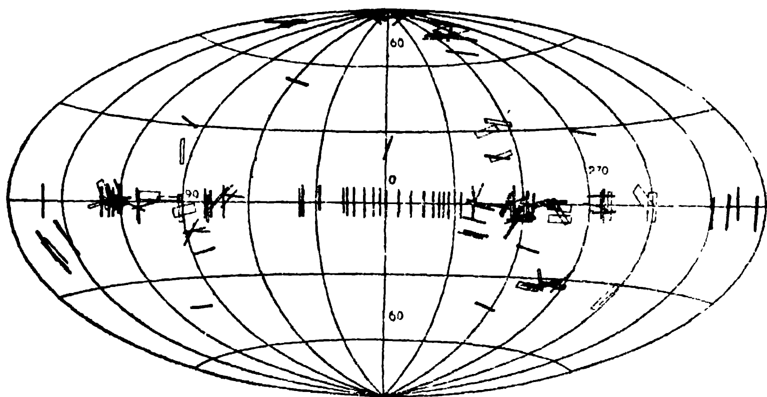
1970 খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে কেনিয়া থেকে নাসা (NASA) ভারত মহাসাগরের উপকূলে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে তুলে দিয়েছে—যার কাজ হল মহাকাশে শুধু এক্সরশ্মির অনুসন্ধান করা। কেনিয়বাসীদের আতিথেয়তার স্বীকৃতিতে তাদের সোয়াহিলি ভাষায় এই উপগ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে 'উহুরু' (UHURU) বা স্বাধীনতা। এই উপগ্রহে সূর্যের ও নক্ষত্রজগতে এক্সরশ্মি মাপতে দুটি আলাদা যন্ত্র বসানো আছে। এরা এক্সরশ্মি বিকিরণের সব তথ্যই পৃথিবীর গবেষণাগারে পৌঁছে দেয়।

এইসব গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, শুধু সূর্যই নয়, মহাকাশে অন্ততঃ একশোর বেশী নক্ষত্র আছে যারা এক্সরশ্মি বিকিরণ করে। সূর্য যে এক্সরশ্মি বিকিরণ করে তার পরিমাণ সূর্যের মোট বিকিরণের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ। কোরোনা এই এক্সরশ্মির উৎস। 1970 খ্রীষ্টাব্দের 7 মার্চ সূর্যগ্রহণের ঠিক পরে একটি রকেট সূর্যের যে এক্সরশ্মি পাঠায়, তাতে সূর্যের প্লাজমা ও চুম্বক ক্ষেত্রের স্বরূপ সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে।

আমাদের ছায়াপথে 30° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অধিকাংশ এক্সরশ্মি নক্ষত্রগুচ্ছের ভীড়, অন্যগুলি 90° দ্রাঘিমাংশে সিগ্ন্যাস্ ও 300° দ্রাঘিমাংশ সেণ্টাউরি নক্ষত্র মণ্ডলে দেখা যায়। বাইরের ছায়াপথের বিভিন্ন অক্ষাংশেও কিছু এক্সরশ্মি নক্ষত্র

ছড়িয়ে আছে। নক্ষত্রের এক্সরশ্মি বিকিরণ থেকে এমন সব তথ্য ধরা পড়েছে যা আলো বা বেতারবিকিরণ থেকে জানা যায় না।

আমাদের ছায়াপথের ক্র্যাব্‌নেবুলা একটি অতিনবতারার ধ্বংসাবশেষ। আলো ও বেতার তরঙ্গের সঙ্গে এই জ্যোতিষ্ক থেকে এক্সরশ্মিও আসে। এই এক্সরশ্মির শক্তি



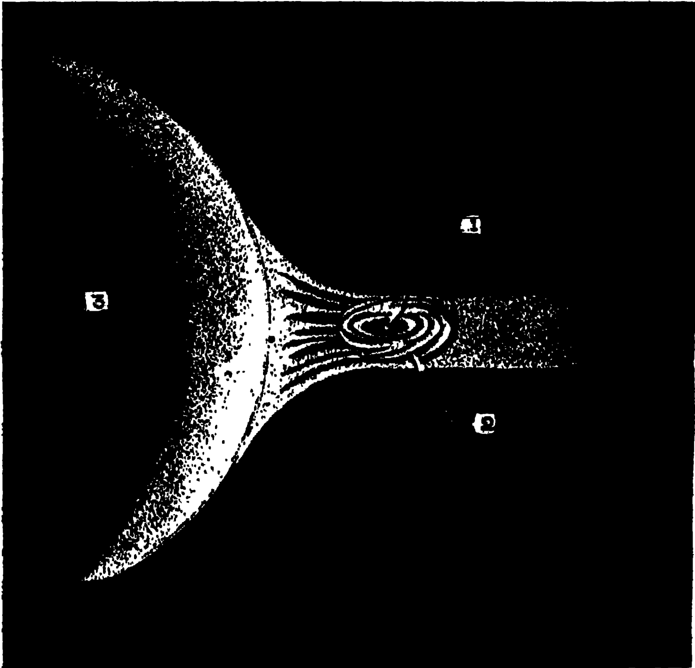
চিত্র 4.17 : আমাদের ছায়াপথে 30°, 90° ও 300° দ্রাঘিমাংশে এক্সরশ্মি নক্ষত্রগুচ্ছের ভীড়।

তার আলো বিকিরণের সমান কিন্তু বেতার বিকিরণের চেয়ে কম। প্রচুর এক্সরশ্মির উৎস বলে এর তাপমাত্রা নিশ্চয়ই কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রী হবে এরকম অনুমান করা হয়। সাধারণ নক্ষত্রের তাপমাত্রা কম হলে তা লাল বা লাল উজানী রশ্মিই বেশী বিকিরণ করে। নক্ষত্রের তাপমাত্রা বেশী হলে তার বিকিরণে বেগুনি বা অতিবেগুনি রশ্মি বাড়তে থাকে। সবচেয়ে উত্তপ্ত নক্ষত্রে এক্সরশ্মির পরিমাণ বাড়ে কিন্তু ক্র্যাব্‌নেবুলার এক্সরশ্মির বিকিরণ এত বেশী যে, তার উত্তাপ থেকে এই বিকিরণের পরিমাণ ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ক্র্যাব্‌নেবুলার কেন্দ্রে রয়েছে একটি নিউট্রন নক্ষত্র—যেখানে প্রোটন ও ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে নিউট্রন। শ্বেতবামন থেকে ছোট এসব নক্ষত্রে নিউক্লিয়াস নেই—আছে শুধু নিউক্লীয় পদার্থ। ক্র্যাব্‌নেবুলার নিউট্রন নক্ষত্র বেতার তরঙ্গের সঙ্গে সমানে সেকেণ্ডে 30 বার এক্সরশ্মির স্পন্দন ও বিকিরণ করে। এরকম পাল্‌সার বা স্পন্দমান নক্ষত্রের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

প্রায় সব অতিনবতারার ধ্বংসাবশেষই এক্সরশ্মি বিকিরণ করে, কিন্তু তাদের বিকিরণের ধরন সব এক নয়। যেমন সিগন্যাস মণ্ডলীর নক্ষত্র থেকে যে এক্সরশ্মি পাওয়া যায়, তা তার উত্তপ্ত গ্যাসীয় অঞ্চল থেকে আসে।

আজ পর্যন্ত যে এক্সরশ্মি নক্ষত্রগুলি ধরা পড়েছে তার প্রায় একদশমাংশ হল অতি-নবতারার ধ্বংসাবশেষ—বাকীগুলি বিভিন্ন নক্ষত্র জগতের বাসিন্দা। এমন একটি জুড়ি তারা দেখা গেছে যার একটি হল সাধারণ নক্ষত্র আর তার জুড়িটি নিউট্রন নক্ষত্র। সাধারণ নক্ষত্রটি থেকে বস্তুপুঞ্জ জুড়ি নিউট্রন নক্ষত্রে এসে পড়ায় এক্সরশ্মির বিকিরণ ঘটে। কারণ নিউট্রন নক্ষত্রে মহাকর্ষই প্রধান—তাই পদার্থের সংযোগে এরা শক্তি বিকিরণ করে। নিউট্রন নক্ষত্র আবার মহাকর্ষের চাপে ক্রমশ এত সংকুচিত হয়ে পড়ে যে, তাতে আর পদার্থ বলে কিছু থাকে না—থাকে শুধু তীব্র মহাকর্ষ। এদের তখন বলা হয় কৃষ্ণ বিবর বা অন্ধকূপ (black hole)।

নিউট্রন নক্ষত্রের স্বরূপ কি ? তার উত্তরে বলা যায় নিউট্রন নক্ষত্রে থাকে বহমান নিউট্রনীয় পদার্থ। এই পদার্থই নক্ষত্রের মহাকর্ষজনিত সংকোচনে বাধা সৃষ্টি করে।



চিত্র 4.18 : কৃষ্ণবিবর বা অন্ধকূপ (black hole) 1. নিউট্রনীয় পদার্থ ; 2. বস্তুপুঞ্জ ; 3. নিকটবর্তী জ্যোতিষ্ক।

1939 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার বিতর্ক তুললেন যে নিউট্রনীয় পদার্থের এই বাধা তো অসীম হতে পারে না—একসময় তা ভেঙে পড়বে। তার ফল হবে

মহাকর্ষীয় সংকোচন অবাধে চলতে থাকবে এবং নক্ষত্রের ভর প্রায় শূন্যে পৌঁছুবে। তখনই তা অন্ধকূপে (Black hole) পরিণত হ'বে।

নক্ষত্রের ভরের কোন্ ক্রান্তিক মানে এই বাধা ভেঙে পড়বে ? এই ভর হল সূর্যের 3·2 গুণ অর্থাৎ সূর্যের চেয়ে 3·2 গুণ ভারী নিউট্রন নক্ষত্র আর টিকে থাকবে না। অতিনবতারার বিস্ফোরণে কোন বৃহৎ নক্ষত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে সূর্যের চেয়ে 3·2 গুণ ভারী একটি নক্ষত্রের সৃষ্টি করলে তা অচিরে অন্ধকূপে পরিণত হ'বে। অন্ধকূপে মহাকর্ষ ছাড়া যখন কিছুই থাকবে না তখন তার কোন বিকিরণও ধরা যাবে না—আর তার আয়তন হবে সমান ভরের সাধারণ নক্ষত্র থেকে অনেক কম।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে মহাকর্ষ তরঙ্গের বিকিরণের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্ধকূপের মহাকর্ষ তরঙ্গ কি ধরা যাবে ? 1960 খ্রীষ্টাব্দে ওয়েবার এরকম একটি পরীক্ষায় বিফল হয়েছেন। কেউ কেউ বলছেন অন্ধকূপের তীব্র মহাকর্ষ ক্ষেত্রে নক্ষত্রে চারদিকে দৃশ্য আলো বেঁকে গিয়ে পৃথিবীর দিকে অভিসারী আলোর সৃষ্টি করতে পারে। এরকম ঘটলে অন্ধকূপটি মহাকর্ষীয় লেন্সের মত কাজ করবে। কিন্তু এরকম আলো এখনও ধরা সম্ভব হয়নি।

অন্ধকূপের চারপাশে বস্তুপুঞ্জ থাকলে তা নক্ষত্রটির চারপাশে আবর্তিত হবে। এরকম আবর্তনে তাদের কিছু অংশ শক্তি হারিয়ে ক্রমশঃ ছোট বৃত্তে আবর্তন করবে—ক্রমশঃ অন্ধকূপের মধ্যে তাদের বিলয় ঘটবে। এর ফলে বস্তুর মহাকর্ষ শক্তি তাপে রূপান্তরিত হ'বে এবং বস্তুর অবলোপের চিহ্ন হিসাবে তখন হয়ত এক্সরশ্মির বিকিরণ থেকে অন্ধকূপের অবস্থান নির্দেশ করা যাবে। আগেই আমরা যে জুড়ি তারার উল্লেখ করেছি—তার এক্সরশ্মি বিকিরণ এরকম প্রক্রিয়ায় ঘটে বলে অনুমান করা হয়।

1965 খ্রীষ্টাব্দে cygnus নক্ষত্রমণ্ডলীতে cygnus $X-1$ নামে একটি জ্যোতিষ্কের এক্সরশ্মি ধরা পড়ে। উহুরু যে 161টি এক্সরশ্মির উৎসের সন্ধান পেয়েছে তার অর্ধেকই আমাদের ছায়াপথে। 1971 খ্রীষ্টাব্দে উহুরু খবর দেয় যে cygnus $X-1$ এর এক্সরশ্মির তীব্রতার অনিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে। নিউট্রন নক্ষত্রের স্পন্দন দেখা গেছে যথেষ্ট নিয়মিত। তাহলে cygnus $X-1$ কি একটি অন্ধকূপ ? বেতার তরঙ্গের সাহায্যে একটি দৃশ্য নক্ষত্রের কাছে এর অবস্থান খুব ভালভাবেই ধরা পড়ে। সূর্যের চেয়ে প্রায় 30 গুণ ভারী এই নীল নক্ষত্রটি $HD-226868$। টরণ্টোর বিজ্ঞানী বোল্ট দেখান যে, এই নক্ষত্র জুড়ি তারার একটি —5·6 দিনে সে তার কক্ষে বৃত্তাকারে ঘোরে। এই কক্ষের প্রকৃতি থেকে প্রমাণ হয় যে জুড়ি অন্য অদৃশ্য নক্ষত্রটি সূর্য থেকে 5 বা 8 গুণ ভারী হওয়া সম্ভব। তবু নক্ষত্রটির আয়তন এত ছোট যে নজরে পড়ে না। তবে কি নক্ষত্রটি শ্বেতবামন না কি নিউট্রন নক্ষত্র অথবা অন্ধকূপ ? নিউট্রন নক্ষত্র তো সূর্য থেকে 3·2 গুণের বেশী ভারী হতে পারে

না, শ্বেতবামনও 1·4 গুণের বেশী নয়। তবে কি এই জুড়ি তারাটি একটি অন্ধকূপ ? হতে পারে। দেখা যাচ্ছে *HD* 226868 নক্ষত্রটির প্রসারণ ঘটছে। এমন হতে পারে যে তার জুড়ি অন্ধকূপের তীব্র মহাকর্ষ বল তার ভর টেনে নিচ্ছে—তাই এই প্রসারণ। আর এই ভর অন্ধকূপে ঢোকার মুখে আমরা এক্সরশ্মির বিকিরণ পাচ্ছি। নিউট্রন নক্ষত্রের মত অন্ধকূপের এক্সরশ্মি স্পন্দন নিয়মিত নয় তার কারণ অসাম্য অবস্থার এই নক্ষত্রের মহাকর্ষ ও তাতে বস্তুর অনিয়মিত গতিবিধির জন্যই হয়ত এক্সরশ্মি বিকিরণ নির্দিষ্ট পর্যায় মেনে চলতে পারে না।

বাইরের ছায়াপথে কিছু কোয়াসারও এক্সরশ্মির উৎস বলে মনে হয়। আরও ক্ষীণ এক্সরশ্মি ধরা সম্ভব হলে এবং ঐ সঙ্গে গামারশ্মি বা নভোরশ্মির গবেষণা যুক্ত হলে বিশ্বের স্বরূপ স্পষ্টতর হবে।

বিশ্বজগতের গামারশ্মি বিকিরণ ধরা সম্ভব হলে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। গামারশ্মির ভেদ শক্তি বেশী বলেই এক্সরশ্মি, বেতার তরঙ্গ বা আলো যে সব ঘটনা বা অবস্থানের খবর দিতে পারে না, গামারশ্মি সে সব খবর নিয়ে আসতে পারবে। গামারশ্মির মহাকর্ষজনিত লাল অপসরণ পদ্ধতি থেকে নিউট্রন নক্ষত্র ও অন্ধকূপের পৃষ্ঠদেশের সঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে। নভোরশ্মির অজানা উপাদান, তার তীব্রতা ও অবস্থিতি গামারশ্মির বিশ্লেষণে ধরা পড়তে পারে। 1972 খ্রীষ্টাব্দের 4 ও 7 আগস্ট OSO—7 উপগ্রহ সৌরশিখার যে গামাবিকিরণ পেয়েছে, তার তীব্রতা থেকে সৌরশিখায় দ্রুতগামী কণিকার সংখ্যা নির্ণয়, সৌরকণার ত্বরণকাল ও শক্তিবর্ণালী নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। মহাকাশ থেকে উচ্চশক্তির গামারশ্মির প্রধান উৎস হল π কণিকার ক্ষয়—এতথ্যও জানা গেছে। নবতারা, অতিনবতারা, নিউট্রন নক্ষত্র, অন্ধকূপ নক্ষত্রজগতের ধূলিকণা ও বায়ু এদের বৈচিত্র্যের রহস্য উদঘাটনে গামারশ্মি অন্য সব বিকিরণের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হবে সন্দেহ নাই। এখনই উপগ্রহ বা রকেটে গামারশ্মি ধরার যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে পরীক্ষা চালান হচ্ছে। 1980 খ্রীষ্টাব্দে নাসার (NASA) গামারশ্মি পরীক্ষার যে মহাকাশ মানমন্দির সক্রিয় হয়েছে তার তথ্য থেকে, জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হবে।

নিউক্লীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়টি যথেষ্ট প্রাচীন। পুঁথিপত্রে দেখা যায়, প্রায় 4000 বছর আগেও চীনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। ভারত, মেসোপটামিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রাচীনকালে এই বিজ্ঞান প্রসারলাভ করেছে। তখন চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণই ছিল এইসব গবেষণার একমাত্র উপায়। পরবর্তীকালে গণিত এইসব গবেষণার সহায়তা করেছে। ফলে জ্যোতির্গতিবিদ্যার (astrodynamics) উদ্ভব হয়েছে। 1609 খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও দূরবীণ তৈরি করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যান্ত্রিক কৌশলের প্রথম ব্যবহার করেন। তখন পর্যন্ত আলোই ছিল গবেষণার মাধ্যম। ক্রমশ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে নক্ষত্র জগতের আলো বিশ্লেষণ করা সম্ভব হল। এই বিশ্লেষণ থেকে নক্ষত্রের উপাদান ও তার ভেতরকার অবস্থা কিছু কিছু জানা গেল। এসব গবেষণায় পদার্থ বিজ্ঞানের ভূমিকাই হল প্রধান। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান (astrophysics) বিষয়টির তখনই শুরু।

18 থেকে 20 শতকের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে বিকিরণের নিয়মকানুনগুলি যখন প্রতিষ্ঠালাভ করেছে—তখন বর্ণালী থেকে নক্ষত্রের তাপমাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব হল। কোন্ নক্ষত্রে কী মৌলিক পদার্থ আছে তাও জানা সম্ভব হল।

1931 খ্রীষ্টাব্দে জ্যান্স্কি নক্ষত্র থেকে বেতার তরঙ্গ ধরতে সমর্থ হন। বহু নক্ষত্রই আলোর সঙ্গে বেতার, লাল উজানী, অতিবেগুনি এমনকি এক্সরশ্মিও বিকিরণ করে—এ সম্পর্কে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। জ্যান্স্কির আবিষ্কার থেকে বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের (radioastronomy) সূত্রপাত। আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের (optical astronomy) পাশাপাশি এই নতুন পদ্ধতিও যে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে—পূর্বেই তা আলোচনা করা হয়েছে।

নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান এযুগের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর প্রয়োগের কথা কল্পনাই করা যেত না, যদি না 1930 খ্রীষ্টাব্দে এডিংটন ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে, নক্ষত্রজগতের শক্তির উৎস কোন নিউক্লীয় ক্রিয়ার ফলেই সম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রজগতের বিপুল শক্তির সন্ধান করতে গিয়ে কোন হদিশই পাচ্ছিলেন না। যেমন আমাদের সূর্যের কথাই ধরা যাক্। এই নক্ষত্রটি সেকেণ্ডে 4×10^{33} আর্গ শক্তি অর্থাৎ 5×10^{23} অশ্বশক্তি বিকিরণ করে। সংখ্যার জটিলতায়

না গিয়ে সূর্যের শক্তি সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ধরা যাক্ সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে 1 মাইল পুরু ও 2 মাইল চওড়া একটি বরফের সেতু আছে। কোনও ক্রমে যদি সূর্যের সমস্ত শক্তি এই সেতু ধরে কেন্দ্রীভূত করা হয়, তবে সেতুটি এক সেকেণ্ডেই গলে যাবে। এথেকে সূর্যের শক্তির বহর কিছুটা অনুমান করা যায়। তাছাড়া আবহমানকাল ধরে কোটি কোটি বছরেও এই শক্তির কোন হ্রাস হচ্ছে না। এরকম বিপুল শক্তির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে উনিশ শতকের মাঝামাঝি হেলমহোৎজ ও কেলভিন একটি মতবাদ খাড়া করেছিলেন। তাঁদের মতে মহাকর্ষীয় সংকোচনই নক্ষত্র শক্তির উৎস। এই সংকোচনের ফলে মহাকর্ষীয় স্থৈতিকশক্তির কিছু অংশ বিকিরণে রূপান্তরিত হয়।

সৌরশক্তির উৎস

একদা সূর্যের সৃষ্টি হয়েছিল বায়ব অথবা মহাকাশের ক্ষুদ্র কণাপুঞ্জ থেকে। এদের ঘনীভবনে সূর্য যখন গড়ে উঠছিল—তার স্থৈতিক শক্তিরও হ্রাস হল। এই শক্তির কিছু অংশ সূর্যের ভেতরের তাপ বাড়িয়ে দিল ও বাকীটুকুর বিকিরণ হল। কিন্তু এরকম অবিরাম সংকোচনের ফল হওয়া উচিত সূর্যের আয়তনের ক্রমিক হ্রাস। সূর্যের বিশাল দেহে আয়তনের এই হ্রাস এত সামান্য যে ধরা পড়ার কথা নয়।

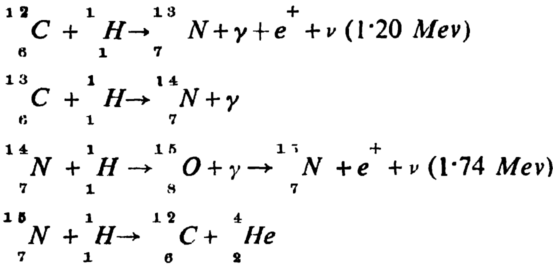
আজ পর্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্বের উপর মোটামুটি যে সব মতবাদ চালু আছে তাতে সূর্যের জন্ম কয়েক হাজার কোটি বছর আগে। বায়ব অবস্থা থেকে বর্তমান আকারে আসতে সূর্যের যে সংকোচন ঘটেছে তাতে অন্তত তার 10^{49} আর্গ শক্তি বিকিরণ করা সম্ভব। সূর্যের বর্তমান ঔজ্জ্বল্য দেখা যাচ্ছে 10^{41} আর্গ, তাহলে সূর্যের বয়স দাঁড়ায় 10^{8} বছর। কিন্তু সূর্যের বয়স এর চেয়ে অনেক বেশী। তাই মহাকর্ষীয় সংকোচন যে সৌর শক্তির বর্তমান উৎস নয়—তা অনায়াসে বলা যায়।

বেকেরেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর যেন একটু আশার আলো দেখা গেল। রাসায়নিক শক্তির চেয়ে অকল্পনীয় বিপুল শক্তির উৎস পরমাণুর নিউক্লিয়াস—যে শক্তি মহাকর্ষ শক্তির তুলনায় বিপুল, এই সম্ভাবনা জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিয়ে এল যুগান্তর।

ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতা থেকে দেখা যায় যে 1 গ্র্যাম পদার্থের ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হলে 670000 গ্যালন পেট্রোল দহনের শক্তির সমান হবে। রাসায়নিক ক্রিয়ায় ভরের ক্ষয় নগণ্য, কিন্তু নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তিও যেমন বিপুল, ভরের ক্ষয়ও অধিক। সূর্যের বর্তমান ঔজ্জ্বল্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তার উৎস নিউক্লীয় হলে প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের ভর 4600000 টন কমে যাবে। এই সংখ্যাটি বেশ বড় হলেও সূর্যের বিপুল ভরের তুলনায় নগণ্য।

নিউক্লীয় সংযোজন ও নিউক্লীয় শক্তি

কোন্ নিউক্লীয় বিক্রিয়া সৌর শক্তির উৎস হতে পারে, তা জানতে হলে সূর্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জানা দরকার। সৌর বর্ণালী থেকে সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অনুমান করা হয় 6000°C। সূর্যের বিকিরণ অজস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়লেও এই তাপমাত্রার বিশেষ হ্রাস হয় না। তাহলে অনুমান করা যায় সূর্যের ভেতরের তাপ আরও বেশী—প্রায় 2 কোটি 10 লক্ষ ডিগ্রী। 1930 খ্রীষ্টাব্দে বেথে ও ওয়াইজ স্যাকার যে তত্ত্ব খাড়া করেন তাতে সূর্যের এই আভ্যন্তরীণ তাপে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস অর্থাৎ প্রোটন পরস্পর সংযোজনে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে—এতে প্রায় 25 Mev শক্তি মুক্ত হয়। কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এসব এতে অংশ গ্রহণ করে, তাই প্রক্রিয়াটি CNO বা সংক্ষেপে কার্বন চক্র নামে অভিহিত হয়। প্রক্রিয়াটি নীচের মত প্রকাশ করা যায়।



$$^{12}_{6}C + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{13}_{7}N + \gamma + e^{+} + \nu \ (1{\cdot}20\ Mev)$$

$$^{13}_{6}C + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{14}_{7}N + \gamma$$

$$^{14}_{7}N + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{15}_{8}O + \gamma \rightarrow ^{15}_{7}N + e^{+} + \nu \ (1{\cdot}74\ Mev)$$

$$^{15}_{7}N + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{12}_{6}C + ^{4}_{2}He$$

এই প্রক্রিয়ায় γ, ν ও e^{+} বিপুল শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে। CNO ছাড়া আরও কয়েক প্রকার সংযোজন ক্রিয়ায় হিলিয়াম তৈরি হতে পারে। নিউক্লীয় সংযোজনে পৃথিবীতে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি সম্ভব হয়েছে। এই বোমা যে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বিভাজনে প্রস্তুত, ফিসন্ বোমার চেয়ে অনেকগুণ শক্তিশালী, সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

সৌর শক্তির উৎস যে নিউক্লীয় সংযোজন তা কি হাতেকলমে প্রমাণ করা যায়? আলো বা বেতার তরঙ্গ তো সৌরপৃষ্ঠের বিকিরণ, তার কেন্দ্রে কী ঘটছে এসব বিকিরণ তার স্বাক্ষর বয়ে আনে না। সূর্যের কেন্দ্রের বাইরে যে আবরণ আছে তার তাপমাত্রা কেন্দ্র থেকে কম, γ বা e^{+} এই আবরণ ভেদ করে বেরোতে পারে না। উপরের বিক্রিয়া থেকে বাকী যে কণা পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে তা হলো নিউট্রিনো। সৌর বিকিরণের শতকরা তিনভাগ শক্তিই নিউট্রিনো বয়ে নিয়ে আসে। নিউট্রিনোর ভর নেই, আধানও নেই। তাই তার পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছতে কোন বাধা থাকার কথা নয়। উপরের CNO বিক্রিয়াটি সৌর শক্তির উৎস হলে পৃথিবীর

প্রতিবর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় 10^{11}টি নিউট্রিনো প্রতিসেকেণ্ডে এসে পড়ে। সংখ্যাটি বিরাট, কিন্তু যে নিউট্রিনো বিশাল সৌর দেহকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তারা যে সুবোধ শিশুর মত বিজ্ঞানীদের যন্ত্রে ধরা দেবে তার নিশ্চয়তা কি ? এজন্য বিশাল যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োজন—তা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ।

সৌর নিউট্রিনোর সন্ধানে

পৃথিবীর কয়েকটি গবেষণাগারে সৌর নিউট্রিনোর সন্ধান চলছে। আমেরিকার হোমস্টেক খনিতে এরকম একটি যন্ত্র রয়েছে। মূলযন্ত্রটি 40 ফুট লম্বা ও 20 ফুট ব্যাসের একটি আধার। এতে প্রায় একলক্ষ গ্যালন টেট্রাক্লোরোএথিলিন (C_2Cl_4) থাকে। এই পদার্থটি দামে সস্তা, ধোপাদের কাপড়চোপড় ধোয়ায় প্রয়োজন হয়। C_2Cl_4 এর Cl – 37 স্থায়ী আইসোটোপ সৌর নিউট্রিনোর সঙ্গে বিক্রিয়ায় Ar – 37 তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করে। এদের অর্ধজীবনকাল 35 দিন। আধারটি 4850 ফুট নীচে রাখা হয় যাতে নভোরশ্মি সেখানে না পৌঁছয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় লক্ষ গ্যালন C_2Cl_4 থেকে Ar – 37 পৃথক করার কঠিন কাজটি সমাধা করতে হয়। Ar – 37 এর পরিমাণ থেকে যে পরিমাণ সৌর নিউট্রিনোর সন্ধান পাওয়া গেছে, তা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, CNO চক্র মোট প্রাপ্ত সৌরশক্তির মাত্র দশ শতাংশ উৎপন্ন করতে পারে। CNO ছাড়া অন্য কোন সংযোজন ক্রিয়ায় যে পরিমাণ নিউট্রিনো পাওয়ার সম্ভাবনা, পরীক্ষালব্ধ নিউট্রিনোর সংখ্যা তার চেয়েও অনেক কম।

সাধারণতঃ তিনটি কারণে এরকম ঘটতে পারে, (1) সূর্যের যে পরিবেশ ধরে নিয়ে তত্ত্বগুলি খাড়া করা হয়েছে—সেই ধারণাই হয়ত নির্ভুল নয়। (2) সংযোজন ক্রিয়ার তত্ত্বটিই হয়ত ত্রুটিপূর্ণ, অথবা (3) পরীক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতি। এইসব কারণগুলিই গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিলেও অন্ততঃ এই সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে যে সৌর নিউট্রিনোর অস্তিত্ব বর্তমান। সৌরশক্তির উৎস যে কোন-না-কোন নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়া এ নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। এখন পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতি ও মৌলিক তত্ত্বগুলির পুনর্বিবেচনা করে নতুন ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

বিশ্বে সূর্যই একমাত্র নক্ষত্র নয়। কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে যে মহাকাশ, তাতে সূর্য তো সাধারণ পর্যায়ের একটি নক্ষত্র মাত্র। নক্ষত্র জগতের স্বরূপ সূর্যের জীবনচর্যা থেকে ধরা পড়বে না। তাই সূর্যকে প্রথম ধাপ ধরে নিয়ে নক্ষত্র জগতের অভিব্যক্তি, জীবন মৃত্যুর খতিয়ান থেকে মহাবিশ্বকে জানা হয়ত সম্ভব।

নক্ষত্র জীবনের অভিব্যক্তি

সৃষ্টির আদি থেকে সূর্য খুব বেশী হলেও হয়ত প্রথম কুড়ি লক্ষ বছর মহাকর্ষীয় সংকোচনে শক্তিলাভ করেছে। তার পরবর্তী ধাপ হল নিউক্লীয় সংযোজনে শক্তির বিকিরণ। সূর্যের মত সাধারণ পর্যায়ের সব নক্ষত্রের জীবন কাহিনী একই রকমের হবে। তারপর হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্রের প্রসারণ ঘটে, ভেতরের তাপমাত্রা কমতে থাকে, পৃষ্ঠদেশ আরও হাল্কা হয়। সাধারণ পর্যায় থেকে নক্ষত্রটি তখন ধীরে ধীরে লাল দানবে (red giant) পরিণত হয়। তার কেন্দ্রে তখন হিলিয়াম জমতে থাকে। কেন্দ্রস্থল সংকুচিত হয়ে তাপমাত্রা সূর্যের কেন্দ্রের প্রায় দশগুণ বেড়ে যায়। এই তাপমাত্রায় তখন অন্য যে নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে, তাতে হিলিয়ামের সংযোজনে তৈরি হয় কার্বন নিউক্লিয়াস্। তখন নক্ষত্রটি যেন আর একবার যৌবন ফিরে পায়—কিন্তু এযৌবন আগের মত তত উদ্দীপ্ত নয়। কারণ কার্বন তৈরির প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত শক্তি CNO চক্রের শতকরা মাত্র নয়ভাগ। ক্রমশঃ নক্ষত্র কেন্দ্রের তাপ বাড়ে ও পরপর আরো ভারী নিউক্লিয়াস্ তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত লোহার নিউক্লিয়াস তৈরি হ'য়ে সংযোজন ক্রিয়া থেমে যায়। তখন লালদানবের কেন্দ্রে থাকে লোহার নিউক্লিয়াস সমষ্টি ও পরপর ক্রমশঃ হাল্কা নিউক্লিয়াসের আবরণ দিয়ে কেন্দ্রটি ঢাকা থাকে। লালদানবের মোট সংযোজন ক্রিয়ার আয়ু তার নক্ষত্র জীবনের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। নিউক্লীয় সংযোজন থেমে গেলে নক্ষত্রটি আরও উত্তপ্ত হয় ও ছোট আকার নেয়। তখন তার বার্ধক্য—শ্বেতবামন (white dwarf) শ্রেণীতে তার রূপান্তর ঘটে।

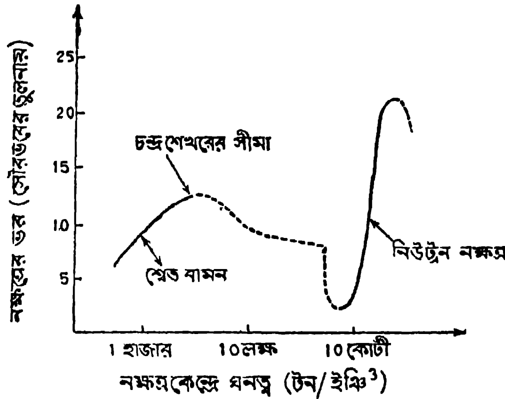
শ্বেতবামন নক্ষত্রকে মহাকর্ষীয় সংকোচনের উপরই নির্ভর করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। শ্বেতবামনে আর পরমাণু আস্ত থাকে না। নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন আলাদা হয়ে পড়ে। পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের ফাঁকা জায়গাটুকু থাকে না বলেই শ্বেতবামন আকারে এত ছোট। তখন তাকে মহাকর্ষীয় সংকোচন ঠেকিয়ে নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে হয়। সেজন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা না পাওয়া গেলে নক্ষত্রটির বিস্ফোরণ ঘটে—যাকে আমরা নবতারা বলি। প্রাচীনযুগে এই সব বিস্ফোরিত নক্ষত্রের হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তি বিকিরণ দেখে নতুন নক্ষত্র বলে ভুল করা হত। নামটি এখনও চালু আছে—তবে শ্বেতবামনত্ব প্রাপ্তির সুযোগ না পেয়ে নক্ষত্রের এই বিস্ফোরণই নবতারার উৎস। যে নক্ষত্রের ভর বিপুল, তার বিস্ফোরণও হয় প্রচণ্ড—তাদের বলা হয় অতিনবতারা।

চন্দ্রশেখরের মতে সূর্যের চেয়ে কোন নক্ষত্র যদি 1·4 গুণ ভারী হয়, তবে সে শ্বেতবামন না হয়ে নবতারায় রূপান্তরিত হ'বে।

এই বিস্ফোরণের স্বরূপ কি? সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি। কেউ বলেন

লোহার নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট ছোট নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়—আবার কেউ বলেন মহাকর্ষীয় সংকোচনকে ঠেকিয়ে রাখতে নিউট্রিনোর মাধ্যমে বিপুল শক্তির বিকিরণে বিস্ফোরণ ঘটে।

সৌরভরের 1·4 গুণ এই ক্রান্তিক ভরের নামকরণ হয়েছে চন্দ্রশেখরের সীমা (Chandrasekhar's Limit)।



চিত্র 4.19 : চন্দ্রশেখরের সীমা : সৌরভরের অনুপাতে কোন জ্যোতিষ্কের ভর ও তার কেন্দ্রে ঘনত্বের অনুপাত কত হলে চন্দ্রশেখরের সীমা প্রযুক্ত হ'বে। কোন্ অবস্থায় শ্বেতবামন বা নিউট্রন নক্ষত্রের অস্তিত্ব সম্ভব হ'বে।

চন্দ্রশেখর সীমা পেরিয়ে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যদি নক্ষত্রটির বিস্ফোরণ না হয়—তাহলে তার ভাগ্যে কী ঘটবে? তার শ্বেতবামনত্ব প্রাপ্তিও সম্ভব হবে না। তখন প্রোটন ইলেকট্রন জুড়ে গিয়ে তৈরি হবে নিউট্রন। শ্বেতবামনের দেহ নিউক্লিয়াস দিয়ে গড়া—কিন্তু এইসব নক্ষত্রে নিউক্লিয়াসের আয়তনও লুপ্ত হবে। ফলে এদের ব্যাস হবে 10 থেকে 100 মাইলের মধ্যে। এরাই নিউট্রন নক্ষত্র। তুলনা করা যাক্ পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে। সূর্যের ব্যাস 864 হাজার মাইল ও পৃথিবীর 8 হাজার মাইল। আর শ্বেতবামনের ব্যাস তো একটি গ্রহের মত। নিউট্রন নক্ষত্র এতছোট হলে কী হবে, তার তাপমাত্রা শ্বেতবামন থেকেও বেশী। তাই এর প্রধান বিকিরণ এক্সরশ্মি। আমরা আগেই বলেছি যে, আমাদের ছায়াপথে এরকম একশোর বেশী নক্ষত্র রয়েছে—তারা স্পন্দমানও বটে। নিউট্রন নক্ষত্র ও স্পন্দমান নক্ষত্রগুলি এক সূত্রে বাঁধা কিনা, নক্ষত্র জীবনের অভিব্যক্তিবাদ নির্ভুল কিনা এসবই ভবিষ্যতের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে।

প্লাজমা ও বিপরীত জগৎ

সাধারণ ও বিপরীত পদার্থ

পৃথিবীর পদার্থসমূহের গঠনবিন্যাস আমাদের অজানা নয়। অণু পরমাণু-নিউক্লিয়াস কীভাবে গড়ে উঠেছে, কোটি কোটি আলোক-বছর পরিধির বিশ্বছায়াপথ (metagalaxy), যা বহু ছায়াপথের সমবায়ে গড়া, আমাদের ছায়াপথ, ছোট বড় নক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহ সবই পৃথিবীর পদার্থ দিয়ে গড়া। এই ধারণা থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের বনিয়াদ তৈরি হয়েছে—বিশ্বরহস্য সমাধানের চেষ্টা চলছে।

এসব চিন্তাভাবনার মধ্যে বিপরীত পদার্থকণা (antiparticle) উড়ে এসে জুড়ে বসল—ফলে সবই তো নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য এদের আবিষ্কারে সুসমতার (symmetry) প্রত্যাশিত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পজিটিভ ও নেগেটিভ আধানে যখন সুসমতা রয়েছে—তবে একটির হাল্কা কণা ইলেকট্রন ও অন্যটির শুধু ভারী প্রোটন থাকবে কেন? পজিট্রন ও অ্যাণ্টিপ্রোটন পদার্থ জগতের এই অসাম্য দূর করেছে। সুসমতার খাতিরে তা হলে বিপরীত পদার্থও (antimatter) তো থাকা উচিত। গোল্ডহেবার বিপরীত ডয়েটরন পাওয়ার দাবী তুলেছেন—তাতে এধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। পৃথিবীর সাধারণ পদার্থ (Koinomatter) দিয়ে আমাদের পৃথিবীতে এইসব বিপরীত পদার্থ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এখানে তারা নেহাৎ অস্থায়ী আগন্তুক। সাধারণ পদার্থের সংঘাতে তাদের বিলয় ঘটে শক্তির রূপান্তরে। তবু নানা পরীক্ষায় এদের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটু এগিয়ে আমরা ভাবতে আরম্ভ করেছি—অ্যাণ্টি প্রোটন ও পজিট্রনের সমবায়ে বিপরীত হাইড্রোজেন পরমাণু, এমনকি ভারী ভারী বিপরীত মৌলিক পদার্থ তৈরি হতে পারে। এখনই তৈরি সম্ভব না হলেও সুসমতার খাতিরে এই পরিকল্পনা অন্ততঃ অসম্ভব নয়। সৃষ্টির আদিতে সাধারণ পদার্থের সমপরিমাণ বিপরীত পদার্থ সৃষ্টি হয়ে থাকবে—সুসমতার নিয়মে এ মতবাদও মানতে হয়। তাহলে বিপরীত পদার্থের বিপরীত জগৎ কি কোথাও থাকতে পারে? অসম্ভব নয় যে, সুসমতার নিয়ম বজায় রেখে মহাকাশের কোন দূর প্রত্যন্ত প্রদেশে হয়ত এই বিপরীত জগৎ আছে। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, বিপরীত জগতের অস্তিত্ব থাকলেও তা কি আমাদের কাছে ধরা পড়বে?

ধরা যাক বিশ্বের অর্ধেক বাসিন্দাই বিপরীত পদার্থে গড়া। এসব বাসিন্দা অনেক নক্ষত্রের চুম্বক ক্ষেত্র আছে—তাদের বর্ণালী রেখা জীম্যান্ ক্রিয়ায় (Zeeman effect) বিভক্ত হবে। কোন নক্ষত্রের জীম্যান্ বর্ণালীর দিক থেকে দেখলে নক্ষত্রটির

দক্ষিণ মেরু যদি পৃথিবীর দিকে থাকে, তবে নক্ষত্রটি নিঃসন্দেহে বিপরীত পদার্থে গড়া। কারণ ইলেকট্রন ও পজিট্রনের বেলায় এই বর্ণালী হবে বিপরীতমুখী।

নক্ষত্রজগতের মাঝখানে মহাকাশ যদি শূন্য হয়, তবু সাধারণ ও বিপরীত নক্ষত্রের আলো একই রকম হবে। কোন পার্থক্য থাকবে না। চাঁদে বিপরীত পদার্থ নেই—মানুষের অভিযানে তা বোঝা গেছে। সূর্যও সাধারণ পদার্থে গড়া। তা না হলে সূর্যের বিচ্ছুরণে যে অরোরা বোরিয়ালিস্ দেখা যায়, বিপরীত প্লাজমা ও সাধারণ পদার্থের সংঘাতে তার জ্যোতি আরও হাজার গুণ বেড়ে যেত।

সৌর প্লাজমা বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেও পৌঁছয়। সেখানে কোন অঘটন ঘটে না—বিপরীত পদার্থ হলে শক্তির রূপান্তরে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হত। সূর্য যখন বিপরীত পদার্থে গড়া নয়, তার গ্রহগুলিও তাই। তাহলে বিপরীত জগৎ খুঁজতে হয় সৌরজগতের বাইরে।

এখন পর্যন্ত যে সব উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে, তার কোনটাই বিপরীত জগতের টুকরা নয়। ফলে বিপরীত জগতের সম্ভাবনা রূপকথা মনে হবে। তবে লিবি অনুমান করেছিলেন, 1908 খ্রীষ্টাব্দে সাইবেরিয়ায় যে উল্কা পড়েছিল, তা হয়ত বিপরীত পদার্থের টুকরা। এই অনুমান যেমন বাতিল হয়নি, তেমনি প্রমাণিতও নয়। ফলে বিপরীত জগৎ যবনিকার আড়ালেই থেকে গেছে। তবু বিজ্ঞানীরা এই সম্ভাবনাকে বাতিল করেননি। সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগৎ যেখানে মুখোমুখি আছে, তার সীমারেখাও প্রান্তিক জগৎ কীরকম হবে, তা তাঁরা ভেবে দেখছেন।

ধরা যেতে পারে যে, নক্ষত্র জগতের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে প্লাজমা অর্থাৎ ইলেকট্রন ও প্রোটনের মুক্ত অঞ্চল। প্লাজমা হল বায়ব, কঠিন ও তরল পদার্থের বাইরে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। আমাদের গবেষণাগারে সূর্যের মত তাপ সৃষ্টি করে নিউক্লীয় সংযোজনে শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম প্লাজমার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। সে অন্য প্রসঙ্গ। এখন সাধারণ জগতের বাইরের আবরণে যেমন সাধারণ প্লাজমা থাকবে, তেমনি বিপরীত জগতের কাছাকাছি জায়গায়ও থাকবে বিপরীত প্লাজমা (Antiplasma)। এতে থাকবে মুক্ত অ্যাণ্টিপ্রোটন ও পজিট্রনের মেলা। তাহলে এই প্রান্তিক জগতে সাধারণ ও অ্যাণ্টিপ্লাজমার সংঘাতে কী অবস্থার সৃষ্টি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আলফভেন ও ক্লীন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বিপরীত জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে উজ্জ্বল সম্ভাবনার আভাস দিয়েছেন।

মহাকাশ ও প্লাজমা

সম্পূর্ণ আয়নিত পদার্থ—যাতে ইলেকট্রন প্রোটনের সমষ্টি ছাড়া নিরপেক্ষ পরমাণু থাকে না—তাকে প্লাজমা বলে। কিছু পরমাণু মেশানো থাকলে তাকে আংশিক

প্লাজমা বলা হয়। তাপ বাড়লে বায়বীয় পদার্থ আয়নিত হয়, কোন কোন অবস্থায় 5000—10000 ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায়, আবার কখনো আরো বেশী তাপে পদার্থ পূর্ণাঙ্গ প্লাজমার রূপ নেয়। আয়ননের সঙ্গে আয়ন ও ইলেক্‌ট্রনের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থাকে। এই পুনর্মিলন (recombination) ও আয়ননের (ionisation) মাত্রা যখন সমান সমান দাঁড়ায়—তখনই প্লাজমা সাম্যাবস্থায় থাকে।

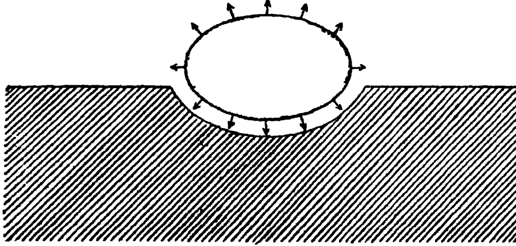
নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশ আংশিক প্লাজমা সন্দেহ নাই। তাদের অভ্যন্তর পূর্ণাঙ্গ প্লাজমা হতে পারে। মহাকাশও আংশিক প্লাজমায় ভরা। অবশ্য এর ঘনত্ব বড় কম—এক ঘনমিটারে প্রায় একটি পরমাণু। এই হাল্কা প্লাজমা যা মহাকাশে ছড়িয়ে আছে—তাতেই বুঝি রয়েছে বিপরীত জগতের চাবিকাঠি!

মহাকাশে ছড়িয়ে আছে ক্ষীণ চুম্বক ক্ষেত্র—এর পরিমাণ 10^{-5} থেকে 10^{-6} গাউসের মত অর্থাৎ পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের প্রায় একহাজার ভাগের এক ভাগ। এই ক্ষীণ চুম্বকক্ষেত্রই কিন্তু মহাকাশে প্লাজমার ধর্ম ও গতিবিধি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। প্লাজমার আহিত কণা এই চুম্বকের প্রভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে। এইসব কুণ্ডলীর পরিধি ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনের বেলায় যেমন ভিন্ন দেখা যায়, কণিকার গতীয়শক্তি ও চুম্বকক্ষেত্রের শক্তির পরিমাণের উপরও তা নির্ভর করে। পজিটিভ বা নেগেটিভ কণার ক্ষেত্রে এই কুণ্ডলীর আবর্তন গতি ভিন্নমুখী হয়। মহাকাশের চুম্বক-ক্ষেত্র সর্বত্র সমান নয়, তাই এসব কুণ্ডলী কোথাও সংকীর্ণ আবার কোথাও বিস্তৃত। মহাকাশের চুম্বকীয় অক্ষ অঞ্চলভেদে ভিন্নমুখে ছড়ান থাকে। তাই কণিকাগুলি অধিকাংশ এই অক্ষের সমান্তরালে থাকে না বলেই কুণ্ডলী পাকাতে পারে। ফলে তারা এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে সহজে যেতে পারে না। অবশ্য কোন কুণ্ডলীর ব্যাস যদি দুটি নক্ষত্রের দূরত্বকেও ছাড়িয়ে যায়, তবে এরকম স্থানান্তর ঘটতে পারে। 10^{14} ইলেক্‌ট্রন্ ভোল্টের শক্তিমান কণিকার পক্ষে এত বড় কুণ্ডলী পাকানো সম্ভব কিন্তু এত শক্তিশালী কণা মহাকাশে দেখা যায় না। আমাদের মহাকাশযান এই ক্ষীণ চুম্বকক্ষেত্র বা প্লাজমার কোন অনুভূতিই পায় না। অথচ এরাই আন্তর্নাক্ষত্রিক কণা চলাচলের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথের বেলায়ও একই সমস্যা থেকে যায়।

এখন দেখা যাক, দুটি নক্ষত্রের বেলায় কী ঘটে? ধরা যাক্ একটি নক্ষত্র সাধারণ ও অন্যটি বিপরীত পদার্থে গড়া। সাধারণ নক্ষত্রের চারদিকে থাকবে সাধারণ প্লাজমা ও বিপরীত নক্ষত্রের চারপাশে বিপরীত প্লাজমা। এই দুই প্লাজমার ঘনত্ব দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে কমে আসবে। তারপর একজায়গায় তাদের মিলন ঘটবে। কিন্তু এই মিলনে তো ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ ও বিপরীত

প্লাজমার মিলনস্থল হল উভপ্লাজমা (ambiplasma)—যা এই দুই জগতের সেতুবন্ধ।

সে প্রসঙ্গে আসতে হলে উনিশ শতকে লীডেনফ্রস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা বলা প্রয়োজন। এই আবিষ্কারের বিষয়টি জানতে হলে একটি পরীক্ষা সাধারণ রান্নাঘরেই করা যেতে পারে। একটি গরম ধাতুপাত্রে একফোঁটা জল রাখুন। প্রায় 100°C তাপমাত্রার উপরে এই বিন্দুটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিস্ হিস্ শব্দে উবে যাবে। তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ালে দেখা যাবে বিন্দুটি উবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু বিস্ফোরণের শব্দ হচ্ছে। এখন প্রথমেই যদি কয়েকশো ডিগ্রী তাপমাত্রায় তুলে পাত্রটির উপর জলবিন্দু ফেলা হয়, তা হলে দেখা যাবে, বিন্দুটি সঙ্গে সঙ্গে উবে যাচ্ছে না। পাঁচমিনিটের উপরও এই বিন্দুটি টিকে থাকবে—যদিও তাতে একটু আধটু আলোড়ন দেখা যাবে। ক্রমশঃ বিন্দুটির আয়তন কমতে কমতে

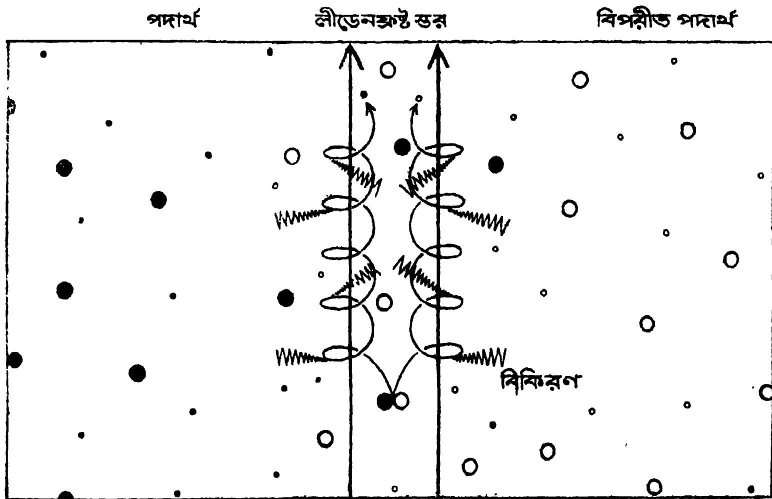


চিত্র 4.20 : লীডেনফ্রস্ট স্তর।

এক সময় উবে যাবে। লীডেনফ্রস্টের মতে উবে যাওয়ার আগে পাত্র ও বিন্দুটির মধ্যে একটি অপরিবাহী বাষ্পীয় স্তরের সৃষ্টি হবে। ফলে পাত্রের তাপ বিন্দুর উপর আস্তে আস্তে পরিবাহিত হবে। পাত্রের তাপমাত্রা যত বেশী হবে, বিন্দুটির উবে যাওয়া ততটা বিলম্বিত হ'বে। 100°C তাপমাত্রায় এই বাষ্পস্তর এত পাতলা থাকে যে তাতে তাপ খুব তাড়াতাড়ি পরিবাহিত হতে পারে ও তা সহজে উবে যায়। এই স্তরকে লীডেনফ্রস্ট স্তর বলা হয়।

সাধারণ ও বিপরীত প্লাজমার মিলনস্থলে কল্পনা করা যায় এরকম একটি লীডেনফ্রস্ট স্তর—যা সাধারণ ও বিপরীত পদার্থের বিলুপ্তিকে বিলম্বিত করে। প্রথমে এই বিলোপের শক্তি সীমান্তকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করবে—তখনই এদের বিলোপ ঘটবে দেরীতে। ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লিডেনফ্রস্ট স্তর সাধারণ ও বিপরীত প্লাজমার প্রান্তরেখায় একটি বাধার প্রাচীর তৈরি করে এদের মিলন তথা বিলুপ্তিকে আটকে রাখবে। এরকম স্তরের বিস্তৃতি হবে $\frac{1}{1000}$ আলোক বছর।

উভপ্লাজমাই লীডেনফ্রস্ট স্তর। প্রোটন অ্যান্টিপ্রোটনের মিলনে শেষপর্যন্ত e, e^+, γ ও ν এর সৃষ্টি হয়। শেষের দুটি অর্থাৎ γ ও ν অনায়াসে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইলেকট্রন পজিটনের শক্তি তখন থাকে প্রায় 10^{12} ডিগ্রি তাপমাত্রার সমান। এত তাপমাত্রায় উভপ্লাজমায় যে চাপ বাড়ে তাতে তার প্রসারণ ঘটে।



চিত্র 4.21 : উভপ্লাজমা (ambiplasma) লীডেনফ্রস্ট স্তর থেকে বিকিরণ। সাধারণ ও বিপরীত জগতের মধ্যবর্তী সীমান্তের সম্ভাব্য রূপ।

এই প্রসারণে দুই বিপরীত প্লাজমা একে অপরকে বিকর্ষণ করে। ফলে এরা আর পরস্পরের কাছে আসতে পারে না। উভপ্লাজমায় এভাবে গড়ে উঠে একটি বাধার স্তর—যা লীডেনফ্রস্ট স্তরের সঙ্গে তুলনীয়।

উভপ্লাজমায় কিছু হ্রস্ব বেতার তরঙ্গও থাকবে। দুই জগতের সীমা রেখা নির্ণয়ে এইসব তরঙ্গ অবশ্যই সাহায্য করতে পারে। কারণ γ বা ν এর চেয়ে বেতার বিকিরণ ধরা অনেক সহজ।

আজ পর্যন্ত অনেক বেতার নক্ষত্রই ধরা পড়েছে। দুই বিপরীত জগতের সীমান্ত যে এরকম একটি বেতার নক্ষত্র নয়, তাইই বা কে বলতে পারে? বিপরীত জগতের অস্তিত্ব আজও আমাদের অজানা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজমাই বুঝি এই জগতের চাবিকাঠি লুকিয়ে রেখেছে। কে জানে—হয়ত ভবিষ্যতে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

5

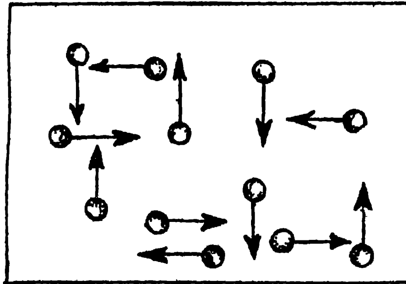
জীবন ও বিশ্বজগৎ

সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধ রূপ;

বৃক্ষবন্দনা : রবীন্দ্রনাথ

সাধারণ দৃষ্টিতে জড় ও জীবনের কোন মৌলিক সাদৃশ্য নাই। আধুনিক বিজ্ঞানে জড় ও শক্তির অভিন্নতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। জড়কে আশ্রয় করেই জীবনের অভিব্যক্তি—তবু জীবনের বৈশিষ্ট্য আছে। জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি জীবনের নিজস্ব ধর্ম। জীববিজ্ঞানে জীবনের এইসব ধর্মকে জড়ের যান্ত্রিক রূপ থেকে পৃথক করে রাখা হয়। ক্রমশ জড়বিজ্ঞানীরা জটিল যান্ত্রিক নিয়মে জীবনের আসল রূপ জানার চেষ্টা করেন। জীন্ ও ভাইরাস প্রভৃতি মৌলিক জীবকণা যে জটিল রাসায়নিক গঠনের অণু ছাড়া কিছু নয়—এই তথ্যটি জীব ও জড়বিজ্ঞানের যোগসূত্র রচনা করে। কৃত্রিম জীন (gene) তৈরি করে তা জীবদেহে জুড়ে দেওয়ার প্রথম বিস্ময়কর কৌশল এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। জীবের প্রাণশক্তিই তাকে জড় থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই প্রাণশক্তিই জীবকে বাড়ায়, গতি দেয়, প্রজননের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে, তার চিন্তাশক্তির স্ফুরণ ঘটায়। জড়ের মধ্যে এই শক্তি নেই।

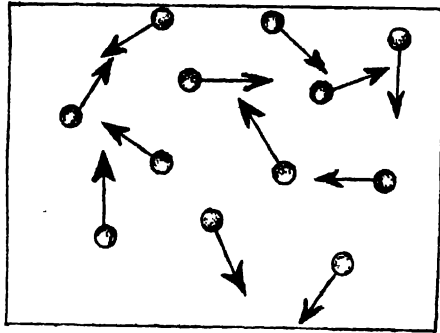
পদার্থবিজ্ঞানে এনট্রপি (entropy) কথাটি খুবই সুপরিচিত। আমাদের আশে পাশে এই যে বিচিত্র পদার্থ জগৎ—তার প্রত্যেকটি অণু গতিশীল। তাপের প্রভাবে এই অসংখ্য অণু অবিরত চঞ্চল। এই চঞ্চলতা সব পদার্থে সমান নয়। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি সবচেয়ে বেশী চঞ্চল; তরল পদার্থের অণুতে আণবিক আকর্ষণ একটু বেশী বলে ইচ্ছামত উড়ে চলে না বটে, কিন্তু তার আধারের নির্দিষ্ট



চিত্র 5.1 : আংশিক শৃঙ্খলাবদ্ধ পরমাণু।

আয়তনে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কঠিন পদার্থের আণবিক আকর্ষণ তাকে নির্দিষ্ট আকারে রাখতে পারে। তাই তার অণুগুলির তাপজনিত উদ্দাম চঞ্চলতা বাইরে

প্রকাশ পায় না। এই চঞ্চলতার ধর্ম হল তাপের প্রভাবে পদার্থের অণুগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তাপ যত বাড়ে, বিশৃঙ্খলাও বাড়তে থাকে। খুব কম তাপমাত্রায় কৃস্টালের মত পদার্থে অণুগুলি তবু কিছুটা সুসজ্জিত থাকে ; তা সত্ত্বেও তাদের কম্পনের গতি হয় বিভিন্ন দিকে। তরল অবস্থায় অণুগুলির কোন শৃঙ্খলাই থাকে না। আরও বেশী তাপমাত্রায় বস্তু বায়বীয় পদার্থে পরিণত হলে এই বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। 5.1 চিত্রে পদার্থে কয়েকটি অণুর গতি দেখানো হয়েছে। এতে তবু কিছু শৃঙ্খলা আছে, কিন্তু বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, অণুগুলি পরস্পরের সংঘাতে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। 5.2 চিত্রে এরকম বিশৃঙ্খল পরমাণুর গতি দেখানো হল। এই দুটি চিত্রে পদার্থের অণুসমূহের



চিত্র 5.2 : বিশৃঙ্খল পরমাণু।

শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মোটামুটি আভাস পাওয়া যাবে। পদার্থবিজ্ঞানে বিশৃঙ্খলার এই সম্ভাবনাকে এনট্রপি বলে। যে পদার্থে অণুগুলির বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বেশী, তাতে এনট্রপিও বাড়ে। বিশৃঙ্খলার মাত্রা কমলে এনট্রপিও কমে।

পদার্থ জগতের বিশেষ নিয়ম হচ্ছে—পদার্থের এনট্রপি ক্রমশঃ বেড়েই চলে ; অর্থাৎ শৃঙ্খলার চাইতে বিশৃঙ্খলার দিকেই যেন জড় পদার্থের ঝোঁক বেশী। একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে এই তত্ত্ব বোঝা যাবে। একটি বাড়ী তৈরি করতে নিপুণ কারিগরকে বহু পরিশ্রম করতে হয়, সময়েরও প্রয়োজন হয় ; কিন্তু ঐ বাড়ী ভেঙে ফেলতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন নেই—অনায়াসে অল্পসময়েই একাজ করা যায়। নিষ্প্রাণ জড়দের রাজ্যে সৃষ্টির নৈপুণ্য যেন কম, তাই সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে তার অণুপরমাণুকে ছন্নছাড়া করার দিকেই তার ঝোঁক বেশী। জড়জগতে এরকম ঝোঁক না থাকলে কিন্তু ভারী মজার ব্যাপার ঘটত। বাতাসের প্রত্যেক অণু একমুখী হলে তাঁদের গতিবেগে বিনা জ্বালানীতেই প্লেনগুলি উড়ে যেতে পারত।

কিন্তু বাতাসের প্রত্যেক অণু ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন দিকমুখী হয়ে গতিশক্তি হারিয়ে ফেলে, তাই একটা সামান্য কঠিন বস্তুকেও উড়িয়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই। মোটরগাড়ী চললে পথের তাপ বাড়ে, ফলে তাপের প্রভাবে পথের অণু-গুলির গতিবেগ বাড়ে ও তারা বিশৃঙ্খল হয়। এইসব অণুর গতি একমুখী হলে বিনা পেট্রোলেই গাড়ী চালান সম্ভব হত। এরকম অবিরাম গতির এঞ্জিন বাস্তবে পাওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ হল—ক্রমবর্ধমান এনট্রপি।

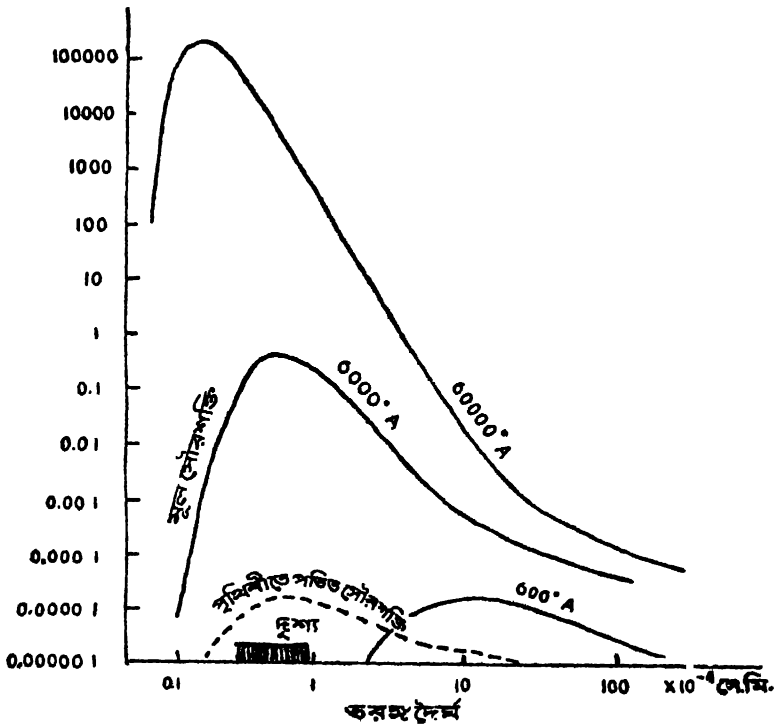
জৈব পদার্থের অণুতেও এনট্রপি বর্তমান, কিন্তু জীবজগতের ঝোঁক হচ্ছে এনট্রপি কমবার দিকে। জীবনের অণুতে রয়েছে সৃষ্টির উন্মাদনা। তাই জড় জগতের মত তার অণুগুলি ছন্নছাড়া নয়। তাই জীবের ধর্ম হল অণুগুলিকে আরও সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে রাখা। তাই বটগাছের ছোট একটি বীজ সাধারণ অজৈব কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ইত্যাদির অণু শোষণ করে যে সব জটিল রাসায়নিক জৈব অণুর সৃষ্টি করে, তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। প্রাণবাদীরা বলবেন, প্রাণশক্তিই জীবের জন্মমৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে। জড়জগতে এনট্রপি বেড়েই চলে অথচ জীবজগতে অন্য নিয়ম। প্রাণবাদীরা এই নিয়ম এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি।

জড়বিজ্ঞানীরা তাঁদের যান্ত্রিক নিয়মকানুন প্রয়োগ করে এই প্রাণশক্তির স্বরূপ ও ক্রিয়াকলাপ কিছুটা ধরে ফেলেছেন। এই শক্তির আধার হল সূর্য। সূর্যের আলো না হলে জীবজগৎ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। এই আলোতে জীবজগতের জীবনক্রিয়া কীভাবে চলে, এবং জীবজগতের অণুগঠনে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ক্রিয়া ও ঐ অণুসমূহের এনট্রপি হ্রাসের গোড়ার কথা জানতে হলে সূর্যের আলো বিকিরণের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

পরমশূন্য তাপমাত্রায় পদার্থ থেকে শক্তির বিকিরণ হয় না। তাপ বাড়লে শক্তির বিকিরণ হয়। বরফ থেকেও এই বিকিরণ হয়, কিন্তু আমাদের শরীর থেকে বেশী তাপ আসে বলেই আমাদের কাছে বরফ ঠাণ্ডা। বিশেষ তাপমাত্রায় পদার্থ নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বিকিরণ করে। তাপ বাড়লে শক্তির তীব্রতা বাড়ে—কিন্তু ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তীব্রতা বাড়ে বেশী। দীর্ঘতর তরঙ্গগুলির শক্তির তীব্রতা কমে। প্রায় $800°C$ তাপমাত্রায় কোন পদার্থ যে শক্তি বিকিরণ করে, তা দৃশ্য আলোর চেয়ে দীর্ঘতর তাপতরঙ্গ। এর চেয়ে তাপমাত্রা বেশী হলে পদার্থের রঙ হয় লাল। তাপমাত্রা আরও বাড়লে ক্রমশঃ হলুদ ও নীল রঙ প্রাধান্য পায়। দৃশ্য আলোতে লাল আলোর তরঙ্গ দীর্ঘতম—তাই প্রথমে লাল রঙ দেখা যায়। তাপ বাড়লে ক্রমশঃ ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ প্রকাশ পেতে থাকে। 5.3 চিত্রে বিভিন্ন তাপমাত্রায় কোন্ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তি কত তীব্র হয় তা দেখানো হয়েছে। এই চিত্র থেকে বোঝা

যাবে যে, একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শক্তির মোট তীব্রতা নির্দিষ্ট থাকে। বেশী তাপমাত্রায় এই তীব্রতার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। তাপজনিত শক্তিতরঙ্গের দিক্ ও তীব্রতা এত ভিন্নমুখী যে, পদার্থের অণুর মত এসব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে পারে না। বেশী তাপমাত্রায় শক্তির মোট তীব্রতা বাড়লেও তাদের তরঙ্গের বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। অর্থাৎ জড় পদার্থের অণুর মত তাদের এনট্রপিও বাড়ে। জড়-জগতে বায়বীয় পদার্থের মত উচ্চতাপীয় শক্তির এনট্রপি হয় সবচেয়ে বেশী।

সৌর মণ্ডলের ফোটোস্ফিয়ারের কাছে $6000°C$ তাপমাত্রায় যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও তীব্রতার শক্তি তরঙ্গের বিকিরণ হয়, 5.3 চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। এই



চিত্র 5.3 : বিভিন্ন তাপমাত্রায় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে বিকিরণের তীব্রতার সম্পর্ক। সৌরশক্তির এনট্রপি কীভাবে হ্রাস পায় তা দেখানো হয়েছে।

শক্তিতরঙ্গ পৃথিবীতে পৌঁছুতে সৌর ব্যাসার্ধের প্রায় 214 গুণ বেশী পথ অতিক্রম করে। শূন্যপথে আসতে এই শক্তির ঘনত্ব কমে যায়; কারণ একই পরিমাণ শক্তি বিরাট শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। শক্তির ঘনত্ব কমে গেলেও বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য জনিত

শক্তির পরিমাণ ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমানই থাকে। ফলে সূর্যের আলো যখন পৃথিবীতে পৌঁছায়, তাতে $6000°C$ তাপমাত্রা জনিত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের শক্তিতরঙ্গ বর্তমান থাকে, কিন্তু আলোর ঘনত্ব আরও কম তাপমাত্রার বিকিরিত শক্তির ঘনত্বের সঙ্গে সমান হয়ে পড়ে। এথেকে দেখা যায় যে, শক্তিতরঙ্গের এনট্রপি যেন কিছুটা হারিয়ে যায়। কারণ তাপমাত্রা কম হলে অণুর অথবা শক্তিতরঙ্গের বিশৃঙ্খলা কম হওয়ার কথা অথচ জড়বিজ্ঞানের নিয়মে এনট্রপি বাড়ার দিকেই তো জড়জগতের ঝোঁক বেশী। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। তাই সূর্যের আলো এই কমতি এনট্রপিটুকু গাছপালার সবুজ পাতা থেকে আহরণ করে নিয়ে ক্ষতিপূরণ করে। এনট্রপি কমে যাওয়ায় গাছপালারও জৈবধর্ম বিকাশের সুযোগ হয়। সূর্যালোকে এই এনট্রপিটুকু চাপিয়ে জৈবধর্মের স্বরূপ রক্ষা নির্ভর করে ফটোসিন্থেসিস বা সালোক-সংশ্লেষ নামক ক্রিয়ার উপর যা কেবল জীবজগতেরই একটা বিশেষ ধর্ম।

গাছপালার পাতায় যে জীবকোষ (cell) আছে, তা কতকগুলি ক্লোরোপ্লাস্টের সমষ্টি। এই উপকোষের গ্রানা (grana) নামক পদার্থের ক্লোরোফিল অংশটুকু সূর্যালোক থেকে প্রাণশক্তি আহরণের মাধ্যমরূপে কাজ করে। দহন সালোক-সংশ্লেষের বিপরীত ক্রিয়া। দহনক্রিয়ায় কার্বন হাইড্রোজেন ঘটিত জৈব অণু বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সহায়তায় শক্তি বিকিরণ করে এবং কার্বন ডাই-আইক্সড ও জলের অণুগঠিত হয়। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল সূর্যালোকের সমবায়ে শর্করা স্টার্চ প্রভৃতি জটিল জৈব অণু গঠন করে ও অক্সিজেন নির্গত হয়। দহন ক্রিয়ায় যেমন বিভিন্ন অণুর বাঁধন ভেঙে গিয়ে তাদের বন্ধনশক্তি বাড়তি শক্তি হিসেবে পাওয়া যায়, ফোটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় তা হয় না। বরং বাইরের কিছু শক্তি এই ক্রিয়ায় প্রয়োজন হয়। সূর্যালোক সেই শক্তির যোগান দেয়। তাছাড়া জটিল অণু গঠনের জন্য পদার্থ থেকে যে এনট্রপিটুকু বিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন, সূর্য্যালোক সে কাজটুকুও সম্পন্ন করে।

ক্লোরোফিলের লাল আলো শুষে নেওয়ার ক্ষমতা বেশী। লাল আলোর কোয়ান্টার শক্তি হল 1·9 ইঃ ভোঃ। সালোক-সংশ্লেষে এরকম দুটি কোয়ান্টা অংশ নেয়। প্রথম কোয়ান্টাম জলের অণু থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু, ক্লোরোফিলের সঙ্গে যুক্ত করে। দ্বিতীয় কোয়ান্টামটি ক্লোরোফিল থেকে এই হাইড্রোজেন পরমাণু বিযুক্ত করে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণুর সঙ্গে যোগ করে দেয়। এই কাজে 1·3 ইঃ ভোঃ শক্তি খরচ হয়—যার পরিমাণ দুটি কোয়ান্টার মিলিত শক্তি 3·8 ইঃ ভোঃ-এর শতকরা 35 ভাগ। সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত শক্তির এতবড় অংশ কখনও কাজে লাগে না। এনট্রপি কমে বলে জীবজগতে এরকম ঘটনা সম্ভব হয়। অবশ্য ক্লোরোফিল না থাকলে এই প্রক্রিয়া সম্ভব হত না।

এ থেকে এরকম সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, সূর্যালোকই শক্তির যোগান দিয়ে ও এনট্রপি হরণ করে জীবকে প্রাণশক্তি দেয়—ফলে তার বিকাশ সম্ভব হয়। অর্থাৎ প্রাণশক্তি=সৌরশক্তি—এনট্রপি। সূর্যালোকের এই প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে গাছপালার উপর। তাদের ভেতর সঞ্চিত সূর্যালোক জনিত রাসায়নিক শক্তি ও হ্রাসপ্রাপ্ত এনট্রপি জীবজন্তুর খাদ্যের ভেতর দিয়ে প্রাণীর জৈবধর্ম বজায় রাখে। মানুষ উদ্ভিদ জগৎ থেকে এই শক্তি আহরণ করে ; মাংস, দুধ ইত্যাদি প্রাণীজ খাদ্যের ভেতর দিয়ে আমরা এই প্রাণশক্তি পাই।

প্রাণশক্তি কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থ নয়—জড়ের জটিলতর গঠনেই প্রাণের প্রকাশ। জড়বিজ্ঞানের নিয়মকানুন জীবজগতেও প্রয়োগ করা যায়। জীবদেহ একটি মুক্ত কাঠামো (open system)। প্রিগজিন দেখিয়েছেন যে, জড়পদার্থের মত বদ্ধ-কাঠামোতে (closed system) এনট্রপি বাড়া একটি বিশেষ ধর্ম হলেও জীবদেহের মুক্ত কাঠামোতে এনট্রপি না বেড়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় থাকে মাত্র। হেবোল্টার উনিশশতকে জৈব পদার্থের বেলায় অনুরূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাণশক্তি সম্পর্কীয় প্রিগজিনের তত্ত্ব থেকে এনট্রপি হ্রাসের ঘটনাকে কোন অতীন্দ্রিয় প্রাণশক্তি বলার প্রয়োজন হয় না। পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মকানুন দিয়েই জীববিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জীবজগৎ নির্ভরশীল। তাপ, জল, বায়ু জীবনের পক্ষে যেখানেই সহায়ক, সেখানেই জীবজগতের বিস্তার সম্ভব।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে অজৈব পদার্থ থেকে কীভাবে জীবনের আবির্ভাব হল, তা অবশ্য এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে জীবজগতের আদিম উৎস হল—জীবকণা বা প্রোটোপ্লাজম। জৈববিবর্তনের ধারায় এই জীবকণাই উচ্চতর জীবে উন্নীত হয়েছে। হয়ত মহাসাগরের বিভিন্ন অজৈব পদার্থের সুদীর্ঘদিনের জটিল রাসায়নিক ক্রিয়ায় একদিন সৃষ্টি হয়েছিল জীবকণা। অবশ্য এরকম রাসায়নিক ক্রিয়া আমাদের পরীক্ষাগারে সম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকৃতিতে এখন আর এরকম প্রক্রিয়ায় নতুন জীবের সৃষ্টি হয় না কেন ? সম্ভবত জীবকণা সৃষ্টির সমস্ত উপকরণই সৃষ্টির প্রথমযুগে নিঃশেষিত হয়ে গেছে—তাই এরকম প্রক্রিয়ায় আর নতুন জীবের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, যদিও মহাসাগরের গর্ভে ঐ প্রক্রিয়ায় নতুন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই অরক্ষিত জীবকণা বড় বড় প্রাণীদের আহার্যে পরিণত হয়। তাই আমাদের চোখে তা ধরা পড়ে না এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয় তা অজানা থেকে যায়। জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ী মূলসূত্রটি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি হারিয়ে গেছে। সেই হারানো সূত্রটি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ কোনদিন হবে কিনা জানি না। তবে জড় ও জীবন যে একই

যান্ত্রিক নিয়মে চলে, প্রাণশক্তির প্রকাশ যে জড়েরই অভিব্যক্তি—এই তথ্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তাই ভাববাদী দর্শনের পাশে গড়ে উঠেছে নতুন জীবনদর্শন—যেখানে অতীন্দ্রিয়ের স্থান নেই। মার্ক্সীয় দর্শনের পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের সূত্রটি তাই বৈজ্ঞানিক দর্শনের মূলভিত্তি রচনা করেছে। বিজ্ঞানের গবেষণায় ক্রমশঃ জীববিজ্ঞানের নতুন তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, পরীক্ষাগারে কৃত্রিম জীন তৈরি করে তা জীবদেহে প্রোথিত করাও সম্ভব হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ জড়বিজ্ঞানের যান্ত্রিক নিয়মেই রচিত হবে জীবনদর্শন। হয়ত আগামী যুগের জড়বিজ্ঞানীরা হবেন সেই জীবনদর্শনের রচয়িতা।

জীবন ও পৃথিবী

পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব যে একটি দৈবঘটনা নয়, বিজ্ঞানীরা তা প্রমাণ করেছেন। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে জীবন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও দর্শন মানুষের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করে রেখেছে। উনিশ শতকের শেষভাগে শাশ্বত জীবনের মতবাদ (eternal life) বিশেষ চালু ছিল। আরহেনিয়াস্ 1907 খ্রীষ্টাব্দে সৃজনশীল বিশ্ব (Worlds in the Making) গ্রন্থে এই তত্ত্ব খাড়া করেন যে বিশ্বে জীবন শাশ্বত—মহাশূন্যে গতিবিধির ফলে নতুন নতুন গ্রহে জীবদেহ তার আস্তানা পাতে। গ্রহের আবহ মণ্ডলের ভেতর দিয়ে জীবকণা যদৃচ্ছ বেরিয়ে আসতে পারে এবং সূর্যের আলোর চাপে তাড়া খেয়ে দিগ্বিদিকে ঘুরে বেড়ায়। 1899 খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল আলোর চাপের কথা বলেছিলেন—তাই ব্যাপারটা অসম্ভবও নয়। তাহলে মহাশূন্যে যদৃচ্ছ ভ্রমণরত কয়েকটি জীবকণা আলোর ঠেলায় একদিন পৃথিবীতে এসে পড়েছিল? তা থেকেই কি পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব? কিন্তু এই তত্ত্ব বাতিল করতে হল, তার কারণ মহাশূন্যে তীব্র অতি-বেগুনি বিকিরণের সংস্পর্শে জীবকণা বাঁচতে পারে না। 1910 খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় ধরা পড়ল এইসব বিকিরণের তীব্রতা বেশ প্রখর। প্রোটিন ও নিউক্লিইক্ এসিডে গড়া জীবকোষ অন্ততঃ এই অবস্থায় দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে না। এরকম পরীক্ষার জন্য বেশ রোধশক্তিসম্পন্ন কিছু অণুজীবদেহ জেমিনী যানে রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা প্রায় 6 ঘণ্টা কাল সূর্যালোকের সংস্পর্শে থেকেও বেঁচেছিল—তবু এই পরীক্ষায় দীর্ঘদিন তারা যে বেঁচে থাকবে এ তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না।

তাহলে জীবনের আবির্ভাব পৃথিবীতে কখন বা কী ভাবে হল? হ্যারোল্ড ইউরের মতে পৃথিবীর আদিম আবহমণ্ডলে ছিল হাইড্রোজেনের প্রাধান্য; ফলে হাইড্রোজেন কার্বনের সঙ্গে মিলে মিথেন (CH_4), নাইট্রোজেনের সঙ্গে অ্যামোনিয়া (NH_3) ও অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে জল (H_2O) তৈরি করল। জল থেকে গড়ে উঠল মহাসাগর—আর আবহমণ্ডল জুড়ে রইল মিথেন ও অ্যামোনিয়া। আবহমণ্ডলে ঊর্ধ্বতর স্তরের জলীয় বাষ্প থেকে সূর্যালোকের অতিবেগুনি বিকিরণে আলোকীয় বিয়োজনে (photo-dissociation) অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিশ্লিষ্ট হল। হাল্কা হাইড্রোজেন সহজেই অপসারিত হলে অক্সিজেন মিথেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং জল তৈরি করল। এরা আবার অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়ায় তৈরি করল নাইট্রোজেন। অক্সিজেন-এর প্রাধান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবহমণ্ডলের উপরের স্তরে তৈরি হল ওজোনের (ozone) স্তর। ওজোন (O_3)

অতিবেগুনি বিকিরণ শোষণ করার ফলে আর জলের বিযোজনে অক্সিজেনের সৃষ্টি হল না। কার্বন ডাই-অক্সাইড তার ধর্ম অনুযায়ী লালউজানী বিকিরণ শোষণ করে ও পৃথিবীর তাপ বাইরে যেতে দেয় না।

কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিমাণে পাতলা হলে এই কাজ ঠিকমত হয় না—আর কোন গ্রহ সূর্য থেকে দূরে হলে—যেমন মঙ্গল—তাতে ঐ আবহমণ্ডলই অপরিবর্তিত থেকে যায়। ম্যারিনার IV, 1965 খ্রীষ্টাব্দের জুলাইতে মঙ্গলগ্রহের এই পাতলা আবহমণ্ডলের তথ্যটি আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। আবার কোন গ্রহ যদি সূর্যের কাছে হয়, তবে তার তাপমাত্রা বেড়েই চলবে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডও বাড়বে। শুক্রের অবস্থাও তাই। শুক্রেরও বেতার বিকিরণ আছে, 1962 খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে শুক্রগামী মহাকাশ যান এ তথ্যটি নিয়ে এসেছে। শুক্রের আবহমণ্ডল কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্তর পৃথিবীর প্রায় 100 গুণ বেশী ও তার তাপমাত্রা প্রায় 500°C। পৃথিবীর আবহমণ্ডলের পরিবর্তন কিন্তু মঙ্গল বা শুক্রের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক পথে এগিয়েছে। তার তখনকার তাপমাত্রায় ও অক্সিজেন নাইট্রোজেন-এর আবহমণ্ডলে ঘটেছে জীবনের বিকাশ। এমনকি অ্যামোনিয়া মিথেন-এর আবহমণ্ডলে এর শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। জীবন আবেশকারী বিক্রিয়া পৃথিবীর মহাসাগর থেকে নাইট্রোজেন যৌগকে নাইট্রোজেন অণুতে রূপান্তরিত করেছে। তাছাড়া সূর্যের দৃশ্য আলো ওজোনস্তরে অতিবেগুনির মত শোষিত হয় না—এই আলো জলের অণুকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট করে দেয়। হাইড্রোজেন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় জটিল জৈব অণু সৃষ্টি করে, গড়ে উঠে জীবকোষ। নাইট্রোজেন—কার্বন ডাই-অক্সাইডের আবহমণ্ডল জীবনের সাহায্যেই নাইট্রোজেন অক্সিজেন আবহমণ্ডলে রূপান্তরিত হয়—আবার অক্সিজেন সৃষ্টি করে জীবনের পরিবেশ। আমাদের অক্সিজেন আবহমণ্ডলের আয়ু প্রায় 6 কোটি বছরের মত ; তার সৃষ্টির সময় আজকের $\frac{1}{10}$ ভাগ অক্সিজেনও তখন বাতাসে ছিল কিনা সন্দেহ। ইউরের মতে মিথেন অ্যামোনিয়া আবহমণ্ডলের ভেতরই জীবনের আবির্ভাব শুরু হয়েছে। 1952 খ্রীষ্টাব্দে ইউরের ছাত্র মিলার মনে করেন অতিবেগুনি বিকিরণের উৎস হল বৈদ্যুতিক ক্ষরণ (electric discharge)। তিনি জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেন সংমিশ্রনের মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ চালিয়ে রেখে সপ্তাহান্তে দেখেন যে, ঐ সংমিশ্রণে গ্লাইসিন্ ও অ্যালানিন এই দুটি সাদাসিদে অ্যামিনো এসিড তৈরি হয়েছে। জীবদেহের এই উপাদান দুটির আবির্ভাব স্বভাবতঃই জড় থেকে জীবনের সম্ভাবনার আবিষ্কারের ভিত্তি রচনা করল। 1969 খ্রীষ্টাব্দে 28 সেপ্টেম্বর তারিখে অস্ট্রেলিয়ায় যে উল্কাটি পড়েছিল পোন্নামপেরুমা তা বিশ্লেষণ করে পেলেন পাঁচটি অ্যামিনো এসিড—গ্লাইসিন্, অ্যালানিন, গ্লুটামিক এসিড, ভ্যালিন

ও প্রোলিন। ফলে দেখা গেল বাইরের বিশ্ব থেকে পৃথিবীতে অ্যামিনো এসিড এভাবে আসার সম্ভাবনাও থাকতে পারে। পরবর্তীকালে জটিল থেকে জটিলতর জৈবপরমাণু গবেষণাগারে সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, রাসায়নিক বিবর্তন উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে পৃথিবীতে জীবজগতের সৃষ্টি করতে পারে।

একটি উর্বর জীবকোষ হাজার হাজার জটিলতর জীবনের সৃষ্টি করে। হয়ত পরিবেশ অনুযায়ী কোনও জীবকোষের ধ্বংসে পাশাপাশি অনুকূল কোষ গড়ে উঠেছে। কোন কোষসমষ্টি হয়ত সামান্য গরমে, কেউ বা সামান্য ঠাণ্ডায় নিজেদের খাপ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, গুণিত হয়েছে ও জৈববিবর্তনে জটিলতর জীবজগতের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান প্রাণিজগতে ভাইরাস ছাড়া সব জীবদেহেই কোষ আছে। এই কোষের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল।

1958 খ্রীষ্টাব্দে ফক্স পরীক্ষায় দেখান যে, অ্যামিনো এসিডের সংমিশ্রনে উত্তাপ দিলে প্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। গরম জলে এই প্রোটিন অণু রেখে জল ঠাণ্ডা হতে দিলে ব্যাক্টেরিয়ার মত জীবদেহের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এইসব জীবদেহে জীবন না থাকলেও তারা জীবকোষের মত বড় হতে পারে, নিজেদের ভাঙতেও পারে। তাই মনে হয় জীবসৃষ্টির প্রাক্কালে এরকম ঠিক জীবন্ত নয় অথচ জীবদেহ পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের ভেতর একটি শ্রেণী DNA (Di-ribonucleic acid) প্রধান। তারা অনুরূপ দেহ গড়তে পারে অথচ শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। আর একশ্রেণী প্রধানত মিটোকোণ্ডিয়া (mitochondria)—এরা অক্সিজেন সহযোগে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে কিন্তু অনুরূপ দেহসৃষ্টিতে প্রায় অপারগ। এই দুরকমের দেহ কোনক্রমে সংযুক্ত হয়ে একদা আধুনিক জীবকোষের সৃষ্টি করে থাকবে।

মিথেন-অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেন-অক্সিজেন এই দুই আবহমণ্ডলে আদিম জীবদেহ জটিল রাসায়নিক যৌগ ভেঙে তার শক্তি দিয়েই অস্তিত্ব রাখত। সূর্যের অতিবেগুনি বিকিরণে এইসব যৌগ আবার গড়ে উঠত।

কিন্তু ওজোন স্তরের বৃদ্ধিতে যখন বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে অতিবেগুনির পথ বন্ধ হতে চলল তখনকার অবস্থা কী? এতদিনে ক্লোরোফিল নিয়ে কিছু মিটোকণ্ডিয়া তৈরি হয়ে গেছে। এরাই দৃশ্য আলোর সাহায্যে ক্লোরোফিল জগৎকে সক্রিয় রাখতে পেরেছিল।

আধুনিক ক্লোরোপ্ল্যাস্ট থেকে সেদিনের ক্লোরোফিল ব্যবহারকারী জীব খুব বেশী জটিল ছিল না। সেই সব দেহের উত্তরাধিকারী বুঝি আজকের অ্যালগী (algae) আর যারা ক্লোরোপ্ল্যাস্ট অংশ হারিয়ে পরজীবী হল তারাই বর্তমানকালের ব্যাক্টেরিয়া (bacteria)।

জীবসৃষ্টির আদিম যুগে ক্লোরোপ্লাস্ট গুণিত হওয়ার সঙ্গে আবহমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড খরচ হচ্ছিল ও অক্সিজেন অণু বাড়ছিল—ফলে তৈরি হল আমাদের আজকের আবহমণ্ডল। উদ্ভিদ জগতের প্রত্যেক জীবকোষ অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট নিয়ে গড়ে উঠছিল—বেড়ে উঠছিল। মিটোকণ্ড্রিয়ার সমন্বয়ে জটিল যৌগ থেকে শক্তি আহরণ করার ক্ষমতা নিয়ে ক্লোরোফিল ছাড়াই যে সব কোষ উদ্ভিদ কোষ খেয়ে বাঁচল তারাই গড়ল প্রাণিজগৎ। ফসিল থেকে যে সব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জটিল থেকে জটিলতর গঠনের এই বিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে।

পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের সেই আদিম আবহমণ্ডল আজ বর্তমান নেই। সেদিনের সেই স্বতঃ জীবন (spontaneous life) জেগে উঠবার তাই কোন সম্ভাবনা আজ দেখা যাবে না।

তবু জীবন যদি পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের নিয়মে গড়ে উঠে থাকে, তবে তার পরিধি কি শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? বহির্জগতে জীবন কি দুর্লভ? এ প্রশ্ন অনেক দিনের—বর্তমান যুগে মহাকাশ অভিযানেও মানুষ আজ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে।

জীবন ও বহির্জগৎ

আমাদের ছায়াপথে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র আর তাদের গ্রহ-উপগ্রহ। সারা বিশ্বে আবার ছড়িয়ে আছে অনুরূপ অসংখ্য ছায়াপথ। এই বিশাল বিশ্বে শুধু পৃথিবীতেই জীবজগতের অনন্য অধিকার থাকবে, এই কল্পনা বাস্তব নয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, সারা বিশ্বে প্রায় 10^{17}টি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব আর আমাদের ছায়াপথে খুব কম ধরলেও অন্তত 40টি অথবা বেশী হলে সর্বোচ্চ 5 কোটি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা উচিত। আমাদের সৌরজগতে অন্ততঃ মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে জীবের বসবাস আছে এরকম সযত্নলালিত ধারণাটুকুও মহাকাশ গবেষণার এই প্রথম যুগেই প্রায় নস্যাৎ হয়ে গেছে। তবে এসব গ্রহে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে হয়ত কিছু জীবাণু টিকে থাকতে পারে। তবে অতীতের কোন জীবজগতের সাক্ষ্য নিয়ে এইসব গ্রহে যদি কোন ফসিল আবিষ্কৃত হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। বাইরের কোন সৌরজগতে আমাদের চেয়ে সভ্য বা অসভ্য জীব থাকতে পারে, এই সিদ্ধান্ত খুব দুঃসাহসের নয়।

গত বিশ বছর ধরে জীবন সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি আর অনুমানভিত্তিক নয়—রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামিল হয়ে গেছে। ফলে গ্রহ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি জীববিজ্ঞানের মৌলিক রহস্যও গবেষণার ফলে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মহাকাশ ও জীববিজ্ঞানের গবেষণার অগ্রগতিতে উল্লিখিত দুটি প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব হবে।

বর্তমান যে সামান্য ফলাফল পাওয়া গেছে, তার উপর নির্ভর করে পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পুরাণ, গাথা প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে দানিকেন বলছেন, গ্রহান্তরের সভ্যতর জীবগোষ্ঠীই পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার পত্তন করেছে। উড়ন্ত চাকী (flying saucer) বা ইয়েতি সম্পর্কে গবেষণাও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এমন কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও আমাদের হাতে আসেনি, যাতে বহির্জগতে জীবজগতের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট।

পৃথিবীর জীবজগতের সৃষ্টিতে আমরা দ্বি-আবহমণ্ডল সম্পর্কীয় তত্ত্ব আগেই আলোচনা করেছি। ফোটোকেমিস্ট্রি ও রেডিও কেমিস্ট্রির বিভিন্ন পরীক্ষা এই মতবাদ সমর্থন করেছে। কিন্তু বহির্বিশ্বে জীবনের সৃষ্টি নিয়ে কোন তত্ত্ব খাড়া করা যায়নি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলতে যা পাওয়া গেছে, তা হ'ল উল্কাপিণ্ডে জৈব পদার্থের অস্তিত্ব। 1834 থেকে 1866 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উল্কাপিণ্ডের সব পরীক্ষাতেই এই সত্যটুকু ধরা পড়েছে। জৈবপদার্থ বলতে হাইড্রোকার্বন—যা অন্য গ্রহের

জীবজগতের অবক্ষয়িত অবশেষ হওয়া বিচিত্র নয়। পাস্তুরের পরীক্ষায় দেখা গেছে উল্কায় ব্যাক্টেরিয়া জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায় না।

উল্কাপিণ্ড নিয়ে পরীক্ষার এখানেই ইতি নয়। পরবর্তীকালে নিউক্লিয় অনুনাদ, ক্রোমাটোগ্রাফী, ম্যাসস্পেকট্রোস্কোপি প্রভৃতি উন্নততর যান্ত্রিক কৌশলে উল্কাপিণ্ডে যেসব জৈবপদার্থ পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে প্যারাফিন, হাইড্রোকার্বন, এরোমেটিক হাইড্রোকার্বন, ফেনল, ফ্যাটিএসিড, শর্করা, অ্যামিনো-এসিড,—যা প্রোটিনের উপাদান বলে বিবেচিত হয়। আর আছে নিউক্লিয়িক এসিডের কিছু উপাদান, ক্লোরোফিল ঘটিত কিছু যৌগিক পদার্থ। উপচুম্বকীয় অনুনাদ পরীক্ষায় পদার্থের শুধু পৃষ্ঠদেশ নয় তার সারাদেহে কোন জৈব অণু বিন্যস্ত হয়ে আছে কিনা তা ধরা পড়ে। এরকম পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে উল্কাপিণ্ডে জৈব বস্তুর বিন্যাস তার সারাদেহে ছড়িয়ে আছে। ফলে পৃথিবীর জৈবপদার্থ যে তাতে সংক্রমিত হয়নি তা সুস্পষ্ট হয়েছে। জৈব কার্বনে ^{12}C ও ^{13}C স্থায়ী আইসোটোপ দুটির আপেক্ষিক অনুপাত অজৈব কার্বন থেকে ভিন্ন। উল্কাপিণ্ডের জৈব কার্বনে এই অনুপাত মাপবার চেষ্টা চলেছে।

মহাকাশ অভিযানে বহির্বিশ্বে জীবনের সন্ধানে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। এইসব নিয়ে গড়ে উঠেছে জ্যোতির্জীববিজ্ঞান (astrobiology)। এই বিজ্ঞানে সব তথ্য সাজিয়ে বহির্বিশ্বে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

চাঁদে যে জীবনের কোন লক্ষণই নেই, অ্যাপোলো অভিযানগুলির ফলাফল থেকে আমরা সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছি। 1962 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ম্যারিনার II মহাকাশযান শুক্রের কাছাকাছি গিয়ে তার পৃষ্ঠদেশের বেতার বিকিরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করেছে। ফলাফল থেকে জানা গেছে শুক্রে কোন সাগর নেই—তার উপরের বায়ুমণ্ডলে যে মেঘ আছে—তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে শুক্রে যে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। বুধগ্রহ আরো ছোট, সূর্যের কাছে বলে বেশী উত্তপ্ত, তার কোন আবহমণ্ডলও নেই। তাই বুধে জীবনের প্রশ্ন উঠে না।

মহাকাশে সাইনাইড, ফরম্যালডিহাইড প্রভৃতি জৈব রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। হরোইৎস্ মঙ্গলগ্রহের আবহমণ্ডলের অনুরূপ কৃত্রিম পরিবেশ গবেষণাগারে সৃষ্টি করে এইসব পদার্থ তৈরি করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল মঙ্গলগ্রহে জীবনের সম্ভাবনা বাস্তব হতে পারে। মঙ্গলের আবহমণ্ডলের চাপ 6 মিলিবার, উপাদান CO_2 ও N_2 ও জলীয় বাষ্পের পাতলা আবরণ। তার পৃষ্ঠদেশে মনে হয় রয়েছে বরফের চাঙড়—তাপমাত্রা পৃথিবী থেকে 50°C কম। পৃথিবীতে এরকম আবহমণ্ডলে জোঁক বা অনুরূপ ছোট জীব বাঁচতে পারে।

ম্যারিনার IV ও অন্য মহাকাশ অভিযানে মঙ্গলগ্রহের আবরণ যে অনুমান থেকে আরো পাতলা এবং তাপমাত্রা আরো কম তা ধরা পড়েছে। মঙ্গলের দক্ষিণমেরুর তাপমাত্রা তো 0°Cএরও কম। বরফের চাঙড়গুলি CO_2 এরও হতে পারে। বর্তমান ভাইকিং I মহাকাশযানের প্রাথমিক পরীক্ষায় জানা গেছে মঙ্গলের আবহমণ্ডলে তিন শতাংশ নাইট্রোজেন আছে। ভবিষ্যতে ভাইকিং II মহাকাশযান মঙ্গলের আরও অনেক তথ্য আমাদের জানাতে পারবে। বর্তমানে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে তার আবহমণ্ডলের চাপ 7·7 মিলিবার, তাপমাত্রা সূর্যোদয়ের সময় −85°C বেলা প্রায় দুটোর সময় −30°Cএ পৌঁছয়।

এইসব তথ্য থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে আমরা যে ধরনের জীবন বহির্বিশ্বে অনুসন্ধান করছি—মঙ্গলগ্রহে তার অস্তিত্ব নেই। তবে মঙ্গলে কোনদিন জীবন ছিল কিনা সে প্রশ্নের সমাধান হয়ত মহাকাশযানগুলির কল্যাণে সম্ভব হবে।

বৃহস্পতির উপর কি আমরা ভরসা করতে পারি? সাগানের মতে বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে প্রচুর মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও সম্ভবত জলীয় বাষ্প আছে। পোন্নামপেরুমা বৃহস্পতির কৃত্রিম আবহমণ্ডল সৃষ্টি করে রক্তিমাভ তরলপদার্থ পেয়েছেন, যার উপাদান হল নাইট্রাইল-এর মিশ্রণ। এই মিশ্রণ হাইড্রোলিসিস্ প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো এসিডের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু এইসব কল্পনায় বাদ সাধছে বৃহস্পতির তাপমাত্রা। বৃহস্পতি সূর্য থেকে যে শক্তি পায়, তার তিনগুণ বিকিরণ করে। মনে হয় মহাকর্ষীয় সংকোচন জনিত শক্তি বৃহস্পতিতে বর্তমান। ফলে তার তাপমাত্রা বেশী হওয়া সম্ভব। নতুন কোন মহাকাশযান এ সম্পর্কে তথ্য না নিয়ে এলে এ সম্পর্কে সব কল্পনাই বাতিল থাকবে।

তাহলে আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও জীবন নেই এই সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। জীবনের অস্তিত্ব খুঁজতে মহাকাশযানগুলির পরিকল্পনা আমাদের সৌরজগতেই সীমাবদ্ধ। দূর-বিশ্বে কোথাও জীবন আছে কিনা, তার ঠিকানা কি কখনও পাওয়া যাবে? কোটি কোটি আলোক-বছর দূরে কোনও গ্রহে যদি সত্যই জীব থাকে, আর তারা যদি কোন সংকেত পাঠায়, আমরা পৃথিবীর মানুষ কি কখনও তা ধরতে পারব আর আমাদের পাঠানো কোন সংকেত কি তারা কখনও পাবে?

ওজমা প্রকল্পে (ozma project) বিজ্ঞানীরা দুমাস চেষ্টা করে এরকম কোন সংকেত ধরতে পারেননি। জ্যোতিষ্কের নিজস্ব যদৃচ্ছ বেতার বিকিরণের পশ্চাৎপটে এরকম সংকেত ধরা খুবই কঠিন সমস্যা। তা সত্ত্বেও অন্ততঃ $4\frac{1}{2}$ আলোক-বছর দূরে যা অনুমান করা হয়েছিল অন্ততঃ এরকম একটি গ্রহে জীব-জগতের সম্ভাবনাটুকুও এই পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। তবে ভবিষ্যতে যে পড়বে না একথা নিশ্চিত বলা যায় না।

1964 খ্রীষ্টাব্দে ডোল্ (Dole) মানুষের বাসযোগ্য গ্রহ নামক গ্রন্থে কল্পিত এমন গ্রহের ছবি এঁকেছেন যা যুক্তিগ্রাহ্য। তাঁর মতে কোন নক্ষত্রের বাসযোগ্য গ্রহ থাকলে নক্ষত্রের একটি নির্দিষ্ট আয়তন হবে। ঐ আয়তনের বেশী হলে জটিল জীবন গঠনের রাসায়নিক ক্রিয়া চালিয়ে রাখার মত দীর্ঘ সময়ের আগেই তার মৃত্যু ঘটবে। খুব ছোট নক্ষত্রেরও এরকম গ্রহ থাকবে না, তার কারণ তখন উপযুক্ত তাপমাত্রা বজায় রাখতে গ্রহটিকে নক্ষত্রের কাছাকাছি থাকতে হবে ও তখন অতিরিক্ত জোয়ার-ভাটায় গ্রহটি জীবনের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ডোলের মতে F_2 ও K_1 শ্রেণীর নক্ষত্রই বাসযোগ্য গ্রহের জনক হতে পারে—এরকম প্রায় 170 কোটি নক্ষত্র আমাদের ছায়াপথেই আছে। এইসব নক্ষত্রের বাসযোগ্য গ্রহ থাকার সম্ভাবনা থাকলেও নিশ্চিতই আছে একথা বলা যাবে না। ঐ নক্ষত্রটির সুষ্ঠু পর্যায়কাল, নিয়মিত কক্ষপথ প্রভৃতিও থাকা প্রয়োজন। এসব বিবেচনা করে ডোল্ বলেছেন আমাদের ছায়াপথে 60 কোটি বাসযোগ্য গ্রহ থাকতে পারে। 80000 ঘন আলোক-বছরে এরকম একটি গ্রহের দেখা পাওয়া যেতে পারে—অর্থাৎ আমাদের নিকটতম বাসযোগ্য গ্রহের দূরত্ব হবে অন্তত 27 আলোক-বছর এবং 100 আলোক-বছরে 50টি এরকম গ্রহ থাকতে পারে। আল্ফা সেণ্টাউরি A ও B এই দুটি নক্ষত্রের বাসযোগ্য গ্রহ থাকার সম্ভাবনা আছে। আমাদের প্রতিবেশী 14টি নক্ষত্রের 6টির বাসযোগ্য গ্রহ থাকতে পারে।

বাসযোগ্য গ্রহ বলতে সেখানে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব যে অবশ্যই থাকবে এমন কথা নেই। তবে 2000টি বাসযোগ্য গ্রহের অন্ততঃ 1টিতেও যদি বুদ্ধিমান জীব থাকে তাহলেও ডোলের হিসাব অনুযায়ী অন্তত 3 লক্ষ 20 হাজার গ্রহে এরকম জীবের বাস অসম্ভব নয়।

এসবই হল সম্ভাবনার কথা—এ নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস লেখা যায় কিন্তু বাস্তবে এরকম গ্রহের দেখা পাওয়া যায় না। তবে সম্ভাবনাতত্ত্বও বিজ্ঞানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, যা থেকে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি আসা যায়।

বেতারসংকেত ধরার আধুনিক প্রচেষ্টায় সাফল্য আসেনি, তার কারণ বিভিন্ন কণিকা ও বিকিরণ ছড়ান রয়েছে সারা বিশ্বে—তার কোন্ অংশটুকু জীবের সৃষ্টি আর কোনটিই বা উত্তপ্ত নক্ষত্রের স্বাভাবিক বিকিরণ তা ধরা সম্ভব হচ্ছে না। আজ না হলেও ভবিষ্যতে আমরা যে মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ নই তার প্রমাণ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে ভয়েজার মহাকাশযান দুটিতে বহির্বিশ্বের অজানা জীবজগতের উদ্দেশে পাঠান হয়েছে পৃথিবীর মানুষের অভিনন্দনবাণী। যতদিন বহির্বিশ্বে কোন সভ্য জগতের সন্ধান না পাওয়া যায় পৃথিবীর মানুষ ততদিন তার অনন্য-জীবসত্তা ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিশ্চয়ই গৌরবান্বিত হয়ে থাকবে।

পরিশিষ্ট

ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যা ও টীকা

আধাপরিবাহী পদার্থ : কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী কঠিন পদার্থে যদি n সংখ্যক পরমাণু থাকে তবে পউলির বর্জন নীতি অনুযায়ী n পরমাণুর n সংখ্যক ইলেকট্রন n কোয়াণ্টাম অবস্থায় থাকবে। প্রতি ইলেকট্রনের দুটি স্পিন অবস্থায় দুটি কোয়াণ্টাম অবস্থা হতে পারে, তাই পদার্থটিরও $2n$ কোয়াণ্টাম অবস্থা থাকে। তার n কোয়াণ্টাম অবস্থা n সংখ্যক ইলেকট্রন অধিকার করে থাকবে ও অন্য n কোয়াণ্টাম অবস্থা থাকবে অনধিকৃত। অবশ্য দুই অবস্থার স্তরে সামান্য কিছু ইলেকট্রনের আনাগোনা পদার্থের অবস্থার উপর নির্ভর করবে। পদার্থের n ইলেকট্রন অধিকৃত নীচের স্তর (যোজ্যতাপটি) অনধিকৃত n কোয়াণ্টাম অবস্থার স্তরের (পরিবহনপটি) কাছে থাকে বলেই পরিবাহী পদার্থে সামান্য বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে এই স্তরে ইলেকট্রন পরিবাহিত হয় (চিত্র 1.28)। অপরিবাহী পদার্থে নীচের অধিকৃত স্তর থেকে অনধিকৃত স্তরের দূরত্ব বেশী বলেই ইলেকট্রন নীচের শক্তিস্তরেই বন্দী হয়ে থাকে (চিত্র 1.29)। আধাপরিবাহী পদার্থে এই দূরত্ব কম এবং পরমাণুগুলির তাপীয় আলোড়ন এত বেশী যে সেই তাপীয় শক্তিতে নীচের স্তরের কিছু ইলেকট্রন উপরের স্তরে উঠে যেতে পারে বলে তার পরিবহন ক্ষমতা দেখা যায়। এই পদার্থে উপরের স্তর থেকে ইলেকট্রনগুলি নীচের স্তরে এলে তাপীয়শক্তি পদার্থে ফিরে আসে। সাধারণ সাম্যাবস্থায় সমান সংখ্যক ইলেকট্রনের দুটি স্তরে ওঠানামা চলে।

ইলেকট্রনের বাঁধন কিছুটা শিথিল আছে এরকম পরমাণু আধাপরিবাহী পদার্থে ঢুকিয়ে দিলে শিথিল ইলেকট্রনগুলিই আধাপরিবাহী পদার্থের পরিবাহিতা বাড়িয়ে দেয়—এই আধা-পরিবাহী পদার্থ N বা n নেগেটিভ শ্রেণীর বলা হয়। P বা p পজিটিভ শ্রেণীর আধাপরিবাহী পদার্থে ঢোকানো থাকে এমন পরমাণু যা অধিকৃত স্তরের ইলেকট্রন টেনে নিয়ে নেগেটিভ আয়ন তৈরি করতে পারে। তখন অধিকৃত স্তরের পজিটিভ ছিদ্রগুলিই বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। শতকরা একভাগ উপযুক্ত পরমাণুর ভেজাল আধাপরিবাহীতে মুক্ত ইলেকট্রন বা ছিদ্রের গাঢ়তা দশলক্ষ গুণ বাড়ে—পরিবাহিতাও সেই পরিমাণে বেড়ে যায়। এখানে কয়েকটি আবিষ্কৃত অপরিবাহী পদার্থের উল্লেখ করা হল। B, C, Si, Ge, S, Se, Te, P, As প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ; Mg_3Sb_2, ZnSb, Mg_2Sn, CdSb, AlSb, InSb, GeSb, GaAs প্রভৃতি মিশ্র ধাতু; Al_2O_3, Cu_2O, ZnO TiO_2, Uo_2, Wo_3, MoO_3 প্রভৃতি অক্সাইড; Cu_2S, Ag_2S, ZnS, CdS, HgS প্রভৃতি সালফাইড্; সেলেনাইড্, টেলুরাইড্, প্রভৃতি বহু যৌগিক পদার্থ।

অ্যাম্পিয়ার : r দূরত্বে অবস্থিত দুটি সমান বিদ্যুৎ আধান q এর মধ্যবর্তী বল হল $F=q^2/Kr^2$, K পারমিটিভিটি বা বিদ্যুৎশীলতা। বায়ুর $K=1$ ধরে, যে আধান 1 সে মি দূরত্বে 1 ডাইন বলের বিকর্ষণ সৃষ্টি করে তাকে একক স্ট্যাট কুলম্ব বলা হয়। ব্যবহারিক একক কুলম্ব হল যে আধান এক সেকেণ্ডে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহে বাহিত হয়। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এককে এই আধানের একক দশগুণ বেশী। ঐ এককে এক অ্যাম্পিয়ার হল 1 সে মি পরিবাহী পদার্থে 1 সে মি ব্যাসার্ধের বৃত্তের চাপে, ঐ বৃত্তের

কেন্দ্রে একক চুম্বক মেরুর যে প্রবাহ এক ডাইন্ বল প্রয়োগ করবে। এই একক খুব বড় তাই $\frac{1}{10}$ ভাগ প্রবাহ অ্যাম্পিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কোয়াণ্টাম সংখ্যা : পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনের শক্তির কোয়াণ্টাম অবস্থা বোঝাতে চারটি কোয়াণ্টাম সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

	সম্ভাব্য মান	কী নির্দেশ করে
প্রধান কোয়াণ্টাম সংখ্যা n	1, 2, 3,...	ইলেক্‌ট্রনের শক্তি
কক্ষীয় কোয়াণ্টাম সংখ্যা l	0, 1, 2, ..	কৌণিক ভরবেগের পরিমাণ
চুম্বকীয় কোয়াণ্টাম সংখ্যা m_l	$-l, \cdots 0 + l \cdots$	কৌণিক ভরবেগের দিক্
স্পিন, চক্রন বা ঘূর্ণনের কোয়াণ্টাম সংখ্যা m_s	$-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}$	স্পিনের দিক্

ইলেকট্রনের শক্তি সাধারণত n দিয়ে নির্দেশ করা হয়, তাই n কে শক্তি স্তরের সংখ্যাও বলা যায়; কিছু অংশে l ও m_l এরও ভূমিকা থাকে। $l=0$ বলতে কক্ষপথ বৃত্তাকার। $l=1$ কক্ষ উপবৃত্তাকার, কিন্তু চুম্বকক্ষেত্রে তার তিনটি $(2l+1)$ অবস্থান $m_l = 1, 0, -1$ নির্দেশ করা হয়। [পৃঃ 36 দ্রষ্টব্য।]

কোয়াসার : দূরবীণে আলোর বিন্দুর মত দেখা গেলেও বেতার তরঙ্গের তীব্র উৎস। ডপলার এফেক্টের জন্য কোয়াসারে যে লাল সরণ দেখা যায় তার মাত্রা সাধারণ ছায়াপথের তুলনায় এত বেশী যে তা শুধু এদের দূরতম অবস্থান নির্দেশ করে না, এদের শক্তিও যে অবিশ্বাস্য পরিমাপের, সে ইঙ্গিতও বহন করে।

কোরোনা : সূর্যের বাইরে মিলিয়ন মাইলব্যাপী পুরু সাদা বায়বের ছটা, গ্রহণের সময় খালি চোখে দেখা যায়।

গাউস্ : এক বর্গ সেন্টিমিটার চুম্বকক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে একটি বলরেখা লম্বভাবে থাকলে চুম্বকক্ষেত্রের সেই তীব্রতা হল 1 গাউস্।

জুড়িতারা : দুটি নক্ষত্র যখন এক একটি নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে ঘোরে এবং কেন্দ্র দুটি একই রেখায় থাকে, তখন নক্ষত্র দুটি জুড়ি বাঁধে। একটি ডামবেলের দুটি প্রান্তের মত তখন তাদের আচরণ। তাদের দূরত্ব যথেষ্ট বেশী হলে দূরবীণে দেখা যায়, তাদের বলা হয় দৃশ্য জুড়ি, এরকম প্রায় ষাট হাজার নক্ষত্র আছে। নক্ষত্র দুটি খুব কাছাকাছি থাকলে তাদের বর্ণালী দিয়ে চিনতে হয়, এরা বর্ণালী দৃশ্য জুড়ি। তৃতীয় একশ্রেণীর আলোক-মিতিক জুড়ি হল গ্রহণ গ্রস্ত পরিবর্তনশীল দুটি নক্ষত্র, যারা একই মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের চারিদিকে একই সমতলে ঘুরতে গিয়ে একটি অন্যটির আড়ালে চাপা পড়ে যায়। জ্যোতির্মিতিক জুড়িরা পরস্পরের প্রভাবে তাদের গতিপথ মাঝে মাঝে পরিবর্তন করে।

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ : তরঙ্গের দিকের সঙ্গে বিদ্যুৎক্ষেত্র E ও চুম্বকক্ষেত্র B পরস্পর লম্ব অবস্থায় থাকে। তাই এই তরঙ্গ অনুপ্রস্থ এবং E ও B একই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বিদ্যুৎক্ষেত্র E কোন তরঙ্গে যখন এক সমতলে একই দিকে অবস্থান করে তখন বিকিরণের সমবর্তন বোঝায়। জলের তরঙ্গে যেমন এক অংশ ফুলে উপরে উঠে যায় অন্য

অংশটি চুপসে থাকে—তেমনি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ফুলে ওঠা অংশটি শীর্ষ ও চুপসে যাওয়া অংশটি পাদ। একটি শীর্ষ ও পাদ মিলে একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য। সেকেণ্ডে একটি তরঙ্গ যতবার কাঁপে সেই সংখ্যা হল কম্পাংক। একক হার্জ। দৃশ্য আলোর ব্যাপ্তি 3900—7600 অ্যাংস্ট্রম্, অণুতরঙ্গের ব্যাপ্তি 600 থেকে 0.6 মিমি, রেডিওতরঙ্গের ব্যাপ্তি 300 মি—0.6 মি। রঞ্জেনরশ্মির ব্যাপ্তি 100—0.01 অ্যাংস্ট্রম্। গামারশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরও ছোট।

নভোরশ্মি ঃ মহাকাশ থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউক্লিয়াস প্রধানত মূল নভোরশ্মি হিসেবে পৃথিবীতে আসে। পথে এই রশ্মি থেকে মাধ্যমিক যে নভোরশ্মি পাওয়া যায় তাতে নিউট্রন, প্রোটন, মেসন, ইলেকট্রন ও গামারশ্মি প্রভৃতি থাকে।

নীহারিকা ও ছায়াপথের শ্রেণী ঃ

ক্যাম্ব্রিজ প্রকাশিত তালিকা 1C, 2C, 3C

নিউ জেনারেল ক্যাটলগ্ NGC, 1890এ এল্, ই, ড্রায়ার প্রণীত।

মেসিয়ের শার্ল প্রণীত তালিকা, M ;

কুণ্ডলী S, বাধিত কুণ্ডলী SB, চিহ্নগুলির সঙ্গে *a*, *b*, *c* দিয়ে কেন্দ্রস্থলের প্রাধান্য কতটা হ্রাস পাচ্ছে তা বোঝানো হয়।

উপবৃত্তাকার E অনিয়তাকার I।

পরম মান ঃ দশ পার্শেক দূরে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের যে ক্রম পাওয়া যায় তাকে পরম মান বলা হয়। আপাত মান হল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র-প্রথম ক্রম, পরবর্তী ক্রমগুলিতে ক্রমশঃ 2·5 গুণ করে ঔজ্জ্বল্য কমে। আপাত ও পরমমান থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়।

পরমাণুর সাংকেতিক চিহ্ন ঃ X মৌলের সাংকেতিক চিহ্ন, A ভরসংখ্যা, Z পারমাণবিক সংখ্যা, N নিউট্রন সংখ্যা হলে পরমাণুর সাংকেতিক চিহ্ন হল $^{A}_{Z}X_{N}$। আয়ন হলে $^{A}_{Z}X^{+}_{N}$। + চিহ্নের বাঁয়ে আয়ননের সংখ্যা থাকে—যেমন আর্গনের 10টি ইলেকট্রন ছাড়া আয়নিত অবস্থায় $^{A}_{Z}X^{10+}_{N}$। নেগেটিভ আয়ন হলে $^{A}_{Z}X^{-}_{N}$। নেগেটিভ আয়নের একাধিক আয়নন হয় না ও সব পরমাণুর নেগেটিভ আয়ন নাই।

পারমিটিভিটি ঃ মাধ্যমের বিদ্যুৎশীলতা বা বিদ্যুৎবহন ক্ষমতা। যে কোন পদার্থের বিদ্যুৎশীলতা ও ভ্যাকুয়ামের বিদ্যুৎশীলতার অনুপাতকে ঐ মাধ্যম পদার্থের ডায়ইলেকট্রিক নিত্যসংখ্যা বলে। সাধারণ বায়ুর বিদ্যুৎশীলতা 1.00003। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বায়ুর বিদ্যুৎশীলতা 1 ধরা হয়।

ভ্যাকুয়াম ঃ নির্বাত অবস্থা। কোন কক্ষ প্রায় বায়ুশূন্য করতে ভ্যাকুয়াম পাম্প ব্যবহৃত হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপ কমিয়ে আধুনিক পাম্পের সাহায্যে আজকাল এমনকি 10^{-10} টরিসেলী চাপে প্রায় বায়ুশূন্য কক্ষে পরীক্ষাদি করা হয়। এতে বায়ুকণার সঙ্গে পরীক্ষণীয় কণার সংঘাতজনিত শক্তিক্ষয় ও লুপ্তি এড়ানো যায়।

মোল ঃ হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন 1.67×10^{-24} গ্র্যাম্, এক গ্র্যাম্ হাইড্রোজেন হল 6×10^{23} পরমাণু অর্থাৎ এভোগাড্রো সংখ্যা। কোন পদার্থের মোল হল এই সংখ্যা। অণুর আপেক্ষিক ওজন থেকে মোলের ওজন বলা যায়। হাইড্রোজেন অণুর মোল এর ওজন 2 গ্র্যাম্, অক্সিজেন অণুর 32 গ্র্যাম্ ইত্যাদি। এক মোল বায়বের 0°C তাপ ও এক বায়ুমণ্ডলের চাপে মোলার আয়তন 22·4 লিটার। বায়বের আয়তন V হলে V = বায়বের মোল × 22·4 লিটার/মোল।

লেনজের নিয়ম ঃ বিদ্যুৎ বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক এমন হয় যে, তা যেআবেশ-কারী প্রবাহের জন্য তার আবেশ সেই প্রবাহের বিপরীতমুখী হবে। আবেশকারী যদি চুম্বক হয় এবং তার উত্তর মেরু বর্তনীর দিকে এগিয়ে এসে আবেশ হলে, বর্তনীর ঐ দিকটি তখন উত্তর মেরুর মত আচরণ করবে অর্থাৎ তখন তার বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী হ'বে।

সাইক্লোট্রন ঃ 1931 খ্রীষ্টাব্দে কণাত্বরক সাইক্লোট্রনের প্রথম ব্যবহার হয়। পরবর্তী-কালে বৃত্তাকার কণাত্বরকের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তবু যে পুরাতন সাইক্লোট্রনগুলি বিভিন্ন গবেষণাগারে এখনও চালু আছে তাদের মেরুপৃষ্ঠের ব্যাস কোন্ কণা কত শক্তিতে ত্বরণ হয় তার পরিমাণ দেওয়া হল।

ব্যাস	Mev কণা	গবেষণাগার
37″	4 প্রোটন	সাহা ইনস্টিট্যুট
42·5″	15 ডয়েটরন	কিয়োটো, জাপান
61·5″	20 ডয়েটরন	বার্মিংহাম
83″	22 ডয়েটরন	ষ্টকহলম
86′	22 প্রোটন	ওকরিজ, আমেরিকা
90′	14 প্রোটন	লিভারমোর, আমেরিকা

সাইক্লোট্রনের শক্তিসীমা বাড়ানোর জন্য যখন সিন্‌ক্রোসাইক্লোট্রনের পরিকল্পনা হ'চ্ছে, তখন এল. এইচ্. টমাস্ তাত্ত্বিক সমীকরণের সমাধান করে প্রমাণ করেন যে দিগংশে পরিবর্তনশীল চুম্বকীয় মেরুপৃষ্ঠে ফোকাসন তীব্রতর হ'বে। তাঁর এই কাজ অনেকদিন অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। 1960 খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতির প্রথম ব্যবহার হয়। ব্যবহৃত এরকম সাইক্লোট্রনে বৃত্তাকার মেরুপৃষ্ঠের সমান বৃত্তকলা পর্যায়ক্রমে উঁচু হিল্ (hill) ও নীচু ভ্যালি (valley) তে বিভক্ত থাকে। এই বৃত্তকলাগুলি ব্যাসার্ধ বরাবর সোজা অথবা ব্যাসার্ধের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোণ করে কুণ্ডলিত আকারের হয়। বিধাননগরের সাইক্লোট্রন দ্বিতীয় প্রকারের। এতে তিনটি কুণ্ডলিত হিল ও তিনটি ঐরকম ভ্যালী আছে। সাধারণত এই ধরণের সাইক্লোট্রনকে দিগংশে পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রের (Azimuthally Varying Field সংক্ষেপে AVF) সাইক্লোট্রন বলা হয়। এখন পর্যন্ত 10-65 Mev প্রোটনের এরকম সাইক্লোট্রনে ত্বরণ সম্ভব হয়েছে। আসলে সাধারণ সাইক্লোট্রনে যেখানে 5-10 মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার কণাপ্রবাহ পাওয়া যায়, AVF সাইক্লোট্রনে 1 মিলিঅ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া এতে ত্বরণের শক্তি বাড়ানো কমানো যায়—যা সাধারণ সাইক্লোট্রনে সম্ভব হয় না। বিধান নগরের AVF সাইক্লোট্রনে 6-65 Mev প্রোটন, 1-60 Mev ডয়েটরন, 24-120 Mev আলফা কণা ত্বরণ করা যাবে। এর 224 সেঃমিঃ ব্যাসের বৃত্তাকার মেরুপৃষ্ঠ সহ চুম্বকের ওজন 260 টনের বেশী। চুম্বকনের জন্য বিদ্যুৎবাহী তামার তার আছে 9 টন।

নির্বাচিত নিত্যসংখ্যা

পরম শূন্য—0°A = OK → —273·15°C, A—Absolute,
K—Kelvin (ডিগ্রী চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না) C—Celsius
অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত পৃথিবী পৃষ্ঠে ত্বরণ g—9·81 মি/সে
অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যা N—$6{\cdot}023 \times 10^{23}$ (গ্র্যাম্ মোল)$^{-1}$
বোলটজম্যান নিত্যসংখ্যা k—$1{\cdot}38 \times 10^{-23}$ জুল/কেলভিন
প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা h—$6{\cdot}63 \times 10^{-27}$ আর্গ সেকেণ্ড
ফ্যারাডে নিত্যসংখ্যা F—$9{\cdot}65 \times 10^{4}$ কুলম্ব/মোল
মহাকর্ষীয় নিত্যসংখ্যা G—$6{\cdot}67 \times 10^{-11}$ নিউটন মি^{2}/(কিগ্রা)^2
শূন্যস্থানে আলোকের গতিবেগ C = $3{\cdot}00 \times 10^{8}$ মিঃ/সেকেণ্ড = $1{\cdot}86 \times 10^{5}$ মাইল/সেকেণ্ড
ভরশক্তির একক সংখ্যা
তুল্যমূল্যতা C^2—931·162 Mev
ইলেকট্রন ভরশক্তি তুল্যমূল্যতা mC^2—0·510984 Mev
ইলেকট্রন ব্যাসার্ধ e^2/mc^2—$2\ 81784 \times 10^{-13}$ সে
ইলেকট্রন চুম্বকীয় ভ্রামক μ_e—$0{\cdot}92?38 \times 10^{20}$ আর্গ/সে
ইলেকট্রন স্থিরভর m—$9{\cdot}1085 \times 10^{-28}$ গ্র্যাম্
ইলেকট্রন আধান e—$1{\cdot}60207 \times 10^{-20}$ ই ম্যা ই
প্রোটন ইলেকট্রন ভর অনুপাত m_p/m—1836·13
নিউট্রন স্থিরভর m_n—$1{\cdot}675 \times 10^{-27}$ কিগ্রা ।

একক—চিহ্ন মান রূপান্তর

সময় (Time)

1 দিন = $1{\cdot}44 \times 10^{3}$ মিনিট = $8{\cdot}64 \times 10^{4}$ সেকেণ্ড
1 বৎসর = $8{\cdot}76 \times 10^{3}$ ঘণ্টা = $5{\cdot}26 \times 10^{6}$ মিনিট = $3{\cdot}15 \times 10^{7}$ সেকেণ্ড

দৈর্ঘ্য (Length)

1 মিটার (মি, m) = 100 সেমি = 39·4 ই = 3·28 ফুট
1 কিলোমিটার (কিমি) = 10^3 মি = ·621 মাইল
1 ফুট (ফু, ft) = 12 ই (inch) = 0·305 মি = 30·5 সে মি
1 মাইল (মা m) = 5280 ফু = 1·61 কিমি
1 আলোক বৎসর (ly) = $9{\cdot}46 \times 10^{15}$ মিঃ = $5{\cdot}88 \times 10^{12}$ মা = 0·307 পার্সেক
1 পার্সেক (pc) = 3·26 আলোক বৎসর = $3{\cdot}086^{16}$ মি
1 অ্যাংস্ট্রম (Angstrom, Å) = 10^{-8}cm
1 মাইক্রন (micron) = 10^{-4} cm
1 অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিট (A.U.) = $1{\cdot}495985 \times 10^{13}$সেমি (পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব)

গতিবেগ (velocity)

1 মি/সে = 3·28 ফু/সে = 2·24 মা/সে = 3·60 কিমি/ঘণ্টা
1 ফু/সে = 0·305 মি/সে = 0·682 মা/ঘণ্টা = 1·10 কিমি/ঘণ্টা
1 কিমি/ঘণ্টা/ = 0·278 মি/সে = 0·913 ফু/সে = 0·621 মা/ঘণ্টা
1 মা/ঘণ্টা = 1·47 ফু/সে = 0·447 মি/সে = 1·61 কিমি/ঘণ্টা

ভর (Mass)

1 কিলোগ্রাম (kg কিগ্রা) = 10^{3} গ্র্যাম্ (g) = 2·21 পাউণ্ড (lb) (পৃথিবী পৃষ্ঠে)
1 একক ভরসংখ্যা (amu) = $1·66 \times 10^{-27}$ কিগ্রা
অথবা (atomic mass unit) = $1·49 \times 10^{-10}$ জুল্ (J) = 931·162 মি ই ভো (Mev)

1 সৌরভর $\simeq 2 \times 10^{33}$ গ্রা

বল (Force)

1 নিউটন (নি, N) = 0·225 পা (lb) = 3·60 আউন্স (oz)
1 পাউণ্ড = 16 আউন্স = 4·45 নি

চাপ (Pressure)

1 নি/মি^{2} = $2·09 \times 10^{-2}$ পাঃ/ফুঃ^{2} = $1·45 \times 10^{-4}$ পা/ই^2
1 বায়ুমণ্ডল চাপ (atm) = $1·013 \times 10^{-5}$ নি/মি^{2} = 14·7 পা/ই^2
1 টরিসেলী = বায়ুমাপক যন্ত্রে 1 মিঃমিঃ পারদের চাপ।
760 মিমি পারদ চাপ = এক বার (bar) বা অ্যাটমসফিয়ার (atmosphere)

শক্তি (Energy)

1 জুল (J) = 0·738 ফুট পাউণ্ড = $2·39 \times 10^{-4}$ কি ক্যালরি
= $6·24 \times 10^{18}$ ইঃ ভোঃ
1 ফু পা (ft lb) = 1·36 জুল (Joule) = $1·29 \times 10^{-3}$ BTU (British Thermal unit)
= $3·25 \times 10^{-5}$ কি ক্যালরি
1 ইলেকট্রন ভোল্ট (electron volt, ev) = $1·60 \times 10^{19}$ জুল
= $1·60 \times 10^{-12}$ আর্গ (erg) = 10^{-6} Mev.
1 আর্গ = 10^{-7} জুল ; সেকেণ্ডে 1 সেমি গতিবেগ হলে ½ আর্গ হল এক গ্র্যাম পদার্থের গতীয় শক্তির তুল্য।

ক্ষমতা (Power)

1 ওয়াট (watt, w) = 1 জুল/সে = 0·738 ফু পা/সে
1 কিলোওয়াট (kw) = 1·34 অশ্বশক্তি (HP)
1 অশ্বশক্তি = 550 ফু পা/সে = 746 ওয়াট্।

চুম্বক ক্ষেত্র (Magnetic Field)

1 টেস্‌লা (Tesla, T) = 1 নিউটন/এ্যাম্পি মি

1 গাউস্ (Gauss) = 10^{-4} T

তাপমাত্রা (Temperature)

C—Celsius, F—Ferenheit

$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32°)$, $T_F = \frac{9}{5}(T_C + 32°)$

এককের গুণিতক ও ভগ্নাংশ

পিকো (Pico) 10^{-12}	ডেকা (Deca) 10^{1}
ন্যানো (Nano) 10^{9}	হেক্টো (Hecto) 10^{2}
মাইক্রো (Micro) 10^{-6}	কিলো (Kilo) 10^{3}
মিলি (Milli) 10^{-3}	মিলিয়ন (Million)/মেগা (Mega) 10^{6}
সেন্টি (Centi) 10^{-2}	গিগা (Giga) 10^{9} (বিলিয়ন billion ও ব্যবহৃত হয়) ।
ডেসি (Deci) 10^{-1}	

গ্রীক বর্ণমালা

(বড় ও ছোট হরফ)

আলফা	(alpha)	A	α	নিউ	(nu)	N	ν
বীটা	(beta)	B	β	এক্সাই	(xi)	Ξ	ξ
গামা	(gamma)	Γ	γ	ওমিক্রন	(omicron)	O	o
ডেল্টা	(delta)	Δ	δ	পাই	(pi)	Π	π
এপসাইলন	(epsilen)	E	ϵ	রো	(rho)	P	ρ
জিটা	(zeta)	Z	ζ	সিগমা	(sigma)	Σ	σ
ইটা	(eta)	H	η	টাউ	(tau)	T	τ
থিটা	(theta)	Θ	θ	আপসাইলন	(upsilon)	Υ	υ
আইওটা	(Iota)	I	i	ফাই	(phi)	Φ	ϕ
কাপ্পা	(kappa)	K	κ	কাই	(chi)	X	χ
ল্যামডা	(lambda)	Λ	λ	সাই	(psi)	Ψ	ψ
মিউ	(mu)	M	μ	ওমেগা	(omega)	Ω	ω

ব্যবহৃত বাছাই পরিভাষা

অতিআধান hypercharge
অতিনবতারা supernovae
অতিপরিবাহী superconductor
অতিবহমানতা superfludity
অতিবহুমূর্তি super multiplet
অতিবেগুনি ultraviolet
অর্ধজীবনকাল halflife
অনিশ্চয়তাবাদ uncertainty principle
অনুঘটক catalyst
অনুনাদ বেধ resonance width
অনুনাদী resonant
অন্ধকূপ, কৃষ্ণবিবর blackhole
অপচুম্বকত্ব, ডায়াচুম্বকত্ব diamagnetism
অপরিচয়ের সংখ্যা strangeness number
অপরিচিত কণা strange particle
অবদ্রব emulsion
অববর্তন diffraction
অবলোপ, অবলুপ্তি annihilation
অবস্থান position
অবিরাম continuous
অবাহ্যত virtually
অভিকর্ষ, মাধ্যাকর্ষণ gravity
অভিসারী convergent
অয়শ্চুম্বকত্ব ferromagnetism
অসম অণু heteronuclear molecule
অসম প্যারিটি odd parity
অষ্টতলীয় octotedra
অষ্টমূর্তি octet
অষ্টাঙ্গিক মার্গ eightfold way
আইসোটোপ isotope
আইসোটোপিক ঘূর্ণন isotopic spin
আজব নিউক্লিয়াস exotic nucleus
আধা পরিবাহী semiconductor
আধান charge
আধান সংখ্যা charge number
আধান সংযুগ্মতা charge conjugation
আন্দোলক oscillator
আপাত মান apparent magnitude
আপতিত incident
আবর্তন rotation
আবিষ্ট বিকিরণ induced emission
আবেশ induction
আয়ন ion
আয়ন কক্ষ ionisation chamber
আয়ন স্তর ionosphere
আয়ন শক্তি ionisation potential
আলফা কণা alpha particle
আলোক বিদ্যুৎ, আলোক তড়িৎ photoelectricity
আলোকীয় বিযোজন photodissociation
আলোকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান optical astronomy
আহিত charged
এ্যান্টিপ্রোটনীয় পরমাণু antiprotonic atom
অ্যামিনো এসিড amino acid
অ্যালগী, শেওলা algae
ইলেকট্রন বিন্যাস electronic configuration
ইলেকট্রোমোটিভ বল electromotive force
উচ্চশক্তি পদার্থবিজ্ঞান high energy physics
উৎক্ষেপিত বস্তু projectile

উত্তেজনা excitation
উত্তেজিত বিকিরণ stimulated emission
উদাসীন, নিরপেক্ষ neutral
উদ্ভাসী incident
উপচুম্বকত্ব, প্যারাচুম্বকত্ব para-magnetism
উপচুম্বকীয় অনুনাদ paramagnetic resonance
উপস্বন overtone
উবন evaporation
উভপ্লাজমা ambiplasma
উল্কা meteor
একক unit
একমেরু চুম্বক magnetic monopole
একমুখী direct
একমূর্তি singlet
একযোজী monovalent
একীকরণতত্ত্ব unfication theory
একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব unified field theory
এক্স বা রঞ্জেনরশ্মি X rays
এনট্রপি entropy
এমালসন, অবদ্রব emulsion
ঔজ্জ্বল্য brightness
কণাতম, কোয়াণ্টাম quantum
কণাত্বরক particle accelerator
কণাসন্ধানী particle detector
কণিকাবাদ corpuscular theory
কম্পন oscillation, vibration
কম্পাঙ্ক, কাঁপন সংখ্যা frequency
কক্ষ orbit
——, বৃত্তাকার——, circular
——, উপবৃত্তাকার——, elliptic
কুণ্ডলিত spiral
কুণ্ডলী solenoid, coil
কোয়াণ্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব quantum field theory
কোয়াণ্টাম সংখ্যা quantum number
কৃষ্ণদেহ blackbody
কেন্দ্রাতিগ centrifugal
কেন্দ্রানুগ centripetal
কৌণিক ভরবেগ angular momentum
ক্যুআর্ক quark
ক্রোমোস্ফিয়ার chromosphere
ক্লোরোপ্লাস্ট chloroplast
ক্লোরোফিল chlorophyl
ক্ষয় decay
ক্ষরণ discharge
ক্ষীণজীবি short lived
ক্ষীণ বল weak force
ক্ষীণ বিক্রিয়া weak interaction
গঠন বিন্যাস structure
গড় আয়ু meanlife
গড় জীবনকাল mean lifetime
গণক যন্ত্র computer
গতি motion
গতিবেগ velocity
গলনাঙ্ক melting point
গাইগারগণক geiger counter
গাঢ়তা concentration
গুণমান quality factor
গেজক্ষেত্র তত্ত্ব gauge field theory
গ্রহনীহারিকা planetary nebulae
গ্রানা grana
গ্রাহকযন্ত্র receiver
গ্রাহী acceptor
গ্রেটিং, ঝাঁঝরি grating
ঘনত্ব density
ঘনীভবন condensation
ঘর্ষণ friction
ঘূর্ণন, চক্রণ বা স্পিন spin
চতুর্যোজী tetravalent
চলন precession

চুম্বক ঝটিকা magnetic storm
চুম্বকত্ব magnetism
চুম্বকন magnetisation
চুম্বকীয় বিপর্যয় magnetic crochet
চুম্বকীয় ভ্রামক magnetic moment
ছায়াপথ galaxy
ছিদ্র, বিবর hole
জীন gene
জীবকণা protoplasm
জীবকোষ cell
জুড়িতারা binary star
জ্যোতির্জীববিজ্ঞান astrobiology
জ্যোতির্গতিবিদ্যা astrodynamics
জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান astrophysics
ঝলক pulse
ট্রানজিস্টর transistor
ট্রান্সফর্মার transformer
ট্রায়োড triode
ডায়ইলেক্‌ট্রীক নিত্যসংখ্যা dielectric constant
ডায়োড diode
ঢুকানো, ডোপ dope
তড়িৎক্ষেত্র বিচ্ছুরণ field emission
তড়িৎ দ্বার electrode
তড়িৎপ্রভ electroluminiscence
তরঙ্গ বলবিদ্যা wave mechanics
তরঙ্গবাদ wave theory
তাপকেন্দ্রীন thermonuclear
তাপীয় বিচ্ছুরণ thermal emission
তাপীয় সাম্যাবস্থা thermal equilibrium
তীব্রতা intensity
তীব্র বল strong force
তীব্র বিক্রিয়া strong interaction
তুল্যমূল্য ওজন equivalent weight
তেজস্ক্রিয়া, তেজস্ক্রিয়তা radioactivity
ত্রিমাত্রিক আলোকচিত্রণ holography
ত্রিমূর্তি triplet
ত্রিযোজী trivalent
দর্পণ সমতা mirror symmetry
দশমূর্তি decuplet
দশা phase
দহন combustion
দানী donor
দিক direction
দেহকেন্দ্রিক body centred
দোলায়িত modulated
দ্বিতীয়ক secondary
দ্বিত্বরূপ doublet
দ্বিমেরু ভ্রামক dipole moment
দ্বীপ জগৎ Island universe
দ্রব solute
দ্রবণ solution
নবতারা novae
নভোবায়ু cosmic gas
নভোরশ্মি, মহাজাগতিকরশ্মি cosmic rays
নিউক্লিইক এসিড nucleic acid
নিউক্লিয়ন nucleon
নিউক্লীয় nuclear
নিউক্লীয় অনুনাদ nuclear resonance
নিউক্লীয়াস nucleus
নিত্যতাবাদ conservation law
নিত্যসংখ্যা constant
নির্বাচনী নিয়ম selectiom rule
নীলদানব blue giant
নীহারিকা nebulae
পঞ্চযোজী pentavalent
পটি band
পরমতাপমাত্রা absolute temperature
পরমমান absolute magnitude
পরমাণুচুল্লী, রিয়্যাক্টর nuclear reactor
পরমাণু সংখ্যা, পারমাণবিক সংখ্যা atomic number

পরমাণু সমষ্টি উল্টানো population inversion
পরিন্যাস deposit
পরিবর্তনশীল নক্ষত্র variable star
— গ্রহণগ্রস্ত— eclipsing —
পরিবর্তী alternating
পরিবহন পটি conduction band
পরিবাহী conductor
পর্যায়কাল period
পর্যায় সারণী periodic table
পাইওনীয় পরমাণু pionic atom
পাদ trough
পারমিটিভিটি, বিদ্যুৎশীলতা permittivity
পুনর্নিবেশ feedback
পুনর্মিলন recombination
পৃষ্ঠকেন্দ্রিক face centered
প্যারিটি parity
প্রতিঘাত recoil
প্রতিরূপ model
প্রস্থচ্ছেদ cross section
প্রাকৃতিকবল forces of nature
প্রাচুর্য abundance
প্রেরকযন্ত্র transmitter
প্লাজমা plasma
ফোকাসন focussing
— , তীব্র — , strong
ফোটোমাল্টিপ্লায়ার photomultiplier
ফোটোস্ফিয়ার photosphere
বক্রদর্পণ curved mirror
বন্ধন শক্তি binding energy
বর্জন নীতি exclusion principle
বর্তনী circuit
বর্ণালী spectrum
—বীক্ষণযন্ত্র spectrograph
বলরেখা lines of force
বহুগুণতা multiplicity
বিকিরণ radiation, emission
বিকিরণ বলয় radiation belt
বিক্রিয়া reaction
বিক্ষিপ্ত scattered
বিক্ষেপী deflecting
বিচ্ছিন্ন pulsed
বিচ্ছুরণ emission
বিদ্যুৎ, তড়িৎ electricity
বিদ্যুৎ চুম্বকীয়, তড়িৎ চুম্বকীয় electromagnetic
বিদ্যুৎধারক condenser
বিপরীত কণা antiparticle
বিপরীত প্লাজমা antiplasma
বিবর্ধণ amplification
বিভব potential
বিভাজন fission
বিরল বায়ু rare gas
বিরল মৃত্তিকা rare earth
বিলয়, বিলুপ্তি annihilation
বিষমাপতন anticoincidence
বিস্তার amplitude
বীটা কণা beta particle
বুদ্বুদ কক্ষ bubble chamber
বৃত্তকলা sector
বৃত্তাকার ত্বরক cyclic accelerator
বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান radio astronomy
বেধ width
বোর কক্ষ bohr orbit
ব্যাপন মেঘকক্ষ diffusion cloud chamber
ব্যাপ্তি, পাল্লা range
ব্যাহত কুণ্ডলী barred spiral
ভর mass
—নেগেটিভ negative mass
ভর ক্ষয় mass defect
ভর বর্ণালী mass spectrum

ভরবেগ momentam
ভর্তি কোষ closed shell
ভূমিস্তর groundstate
ভ্যালি valley
ভ্রামক moment
ভেজাল impurity
ভ্যাকুয়াম, নির্বাত vacuum
মসুরী আকার lenticular
মস্তিষ্ককোষ neuron
মহাকর্ষ gravitation
মহাজাগতিক cosmic
মাধ্যমিক বিচ্ছুরণ secondary emission
মাধ্যাকর্ষণ gravity
মাপকাঠি gauge
মিউওনীয় পরমাণু muonic atom
মিশ্রধাতু alloy
মেঘকক্ষ cloud chamber
মেরুপৃষ্ঠ, মেরুতল pale face
মেসিক পরমাণু mesic atom
মৌল, মৌলিক পদার্থ element
যাদুসংখ্যা magic number
যোজ্যতা valency
যোজ্যতা পটি valence band
যৌগ, যৌগিক পদার্থ compound
রঞ্জক dye
রেখাকার linear
রেখাকার ত্বরক linear accelerator
রেখাবর্ণালী line spectrum
রৈখিক বেগ linear velocity
লক্ষ্যবস্তু target
লম্বন parallax
লাল উজানী, অবলোহিত infrared
লাল দানব red giant
লাল বামন red dwarf
শক্তি energy
শক্তিস্তর energy level

শিখা নক্ষত্র flare star
শীর্ষ crest
শোষণ absorption
শ্বেত বামন white dwarf
ষটকোণ চক্র hexagonal array
সক্রিয় active
সক্রিয়ক activator
সঞ্চয় ক্ষমতা storage capacity
সন্ধিভর critical mass
সংপৃক্ত saturation
সংবাদ আদানপ্রদান communication
সংযোজন fusion
সম অণু homonuclear molecule
সমকেন্দ্রিক concentric
সমতা তত্ত্ব symmetry principle
সম প্যারিটি even parity
সময় বৈপরীত্য সমতা time reversal symmetry
সমানুপাতিক গণকযন্ত্র proportional counter
সমাপতন coincidence
সমাবেশ ভগ্নাংশ packing fraction
সমাহারী converging
সাধারণ পর্যায় main sequence
সাম্যধর্মী symmetric
সাম্যবিরোধী antisymmetric
সালোক সংশ্লেষ, ফোটোসিন্থেসিস photosynthesis
সিগমীয় পরমাণু sigmic atom
সুরাসার alcohol
সুসঙ্গত coherent
সেমিকণ্ডাক্টর কণাসন্ধানী semi-conductor detector
সৌর কলঙ্ক sun spot
সৌর শিখা solar flare
স্পন্দক oscillator
...রী বর্তনী transmitter

স্পন্দমান নক্ষত্র pulsar
স্পিন, চক্রন বা ঘূর্ণন spin
স্ফীতি, প্রসারণ expansion
স্ফুরন কাউণ্টার scintillation counter
স্ফুলিঙ্গ কক্ষ spark chamber
স্ফুটনাঙ্ক boiling point
স্থিতিশীল steady state
স্থির ভর rest mass
স্থৈতিক শক্তি potential energy
স্বতঃ বিকিরণ spontaneous emission
স্বাভাবিক বেধ natural width

নির্ঘণ্ট